হিন্দী একাঙ্ক নাটক

সম্পাদক

চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার

অনুবাদ

দিলীপ কুমার ঘোষ
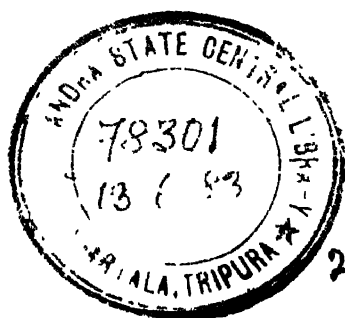
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী

মূল্য —12.75

Original : HINDI EKANKI *(Hindi)*
Bengali Translation : HINDI EKANKA NATAK

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক, নয়া দিল্লী 110016 দ্বারা প্রকাশিত এবং নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা 700 004 দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

এটি এক একাঙ্কী নাটিকা সঞ্চয়ন। কিন্তু একাঙ্কী নাটিকাও নাটকেরই এক ধারা বিশেষ। তাই একাঙ্কী নাটিকা কি তা বলার আগে নাটক সম্বন্ধে বলা দরকার।

প্রতিভার সহজ ও মুক্ত প্রকাশ থেকেই সাহিত্যের জন্ম। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গল্প ইত্যাদি সব রকমের সাহিত্য রচনাই হচ্ছে সুন্দর ও শক্তিশালী হৃদয়াবেগের পরিণাম বিশেষ। কিন্তু এগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব টেক্‌নিক আছে। যার মধ্যে দিয়ে লেখক-মন নিজস্ব রুচি ও শক্তি অনুযায়ী তার নিজস্বতা খুঁজে বেড়ায়। একটি পুরাতন সংস্কৃত প্রবচন আছে— 'কাব্যেষু নাটকং রম্যম্'। (কাব্য— অর্থাৎ সৃজনাত্মক সাহিত্যের মধ্যে নাটকই সবচেয়ে রমণীয়)।

ভারতীয় সাহিত্যে নাটকের শক্তিশালী ঐতিহ্য বর্তমান। কালিদাস, ভবভূতি, দিগনাগ, ভাস, বিশাখদত্ত ইত্যাদি নাট্যকার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য হয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবেন। সে যুগেও ছোট নাটক লেখা হত। কিন্তু তার কোন পৃথক নামকরণ করা হয়নি। সেগুলি ছোট হলেও একাঙ্কী ছিল না।

'নট্' ধাতু থেকে 'নাটক' শব্দের উৎপত্তি। আবার 'নট্' ধাতু থেকে 'নৃত্য' শব্দেরও জন্ম। আমার মতে, কলার এই সম্পূর্ণ দুই পৃথক মাধ্যমের নামকরণ একই শব্দ থেকে হওয়ার ব্যাপারটি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'নৃত্য' লেখা হয় না, করা হয়। আর নাটক লিখিত হয় এবং অভিনীত হয়। এই দুইয়ের মিলন ঘটে মঞ্চে। অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চে। তাই নাটক একদিকে যেমন সাহিত্যের এক অঙ্গ তেমনি অপরদিকে তা হল এক প্রদর্শনযোগ্য কলা বিশেষ। ভারতীয় নৃত্য যথা

কথাকলি, ওড়িশী, মণিপুরী ইত্যাদি এবং বিদেশী নৃত্য যেমন ব্যালে, পেন্টোমাইম ইত্যাদি নাটককে অবলম্বন করেই অনুষ্ঠিত হয় এবং এগুলির লিপিও লিখিত হয়ে থাকে। তাই নৃত্য ও নাটক কলা দুটি ভিন্ন মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ খুবই নিবিড়।

সম্বন্ধের এই নৈকট্যের মধ্যেই নিহিত আছে নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্যের পার্থক্য। এই পার্থক্যের সংকেত মেলে 'নট্' ধাতু থেকে 'নাটক' শব্দের ব্যুৎপত্তির মধ্যে। দর্শন ও শ্রবণ নাটকের এই দুই পৃথক ভূমিকা সুদূর অতীত কাল থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে।

ভারতে নাটকের দৃঢ় ও শক্তিশালী ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী অবধি সাহিত্য ও কলার এই অন্যতম মাধ্যমটি অধিকাংশ ভারতীয় ভাষা ও রাজ্যেই উপেক্ষিত থেকে গেছে। এর কারণ, সে সময়কার রাজনৈতিক চাপ ও সামাজিক উচ্চ-নীচ বিভেদচিন্তা ভারতের জনজীবনকে তথা জনমানসকে সংকুচিত করে রেখেছিল। বিশেষতঃ উত্তর-ভারতে নাটক তখন ভাঁড়ামি ও কৌতুকাভিনয়ের স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংগীত ও নৃত্যও সেযুগে গণিকালয়ের গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তারপর স্বাধীনতোত্তর ভারতে নবজাগরণের জোয়ার আসার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ঘটল নব চেতনা নব উন্মেষ। ভারতীয় ভাষায় অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নতুন সাহিত্য রচনা শুরু হল।

কিন্তু নাটক তো শুধু লেখার জিনিস নয়। এর জন্য 'টীম ওয়ার্কে'র প্রয়োজন। তাই কবিতা, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদির বিকাশ যে গতিতে ঘটতে লাগল, সেই গতিতে ভারতীয় নাটকের বিকাশ সম্ভব হয়নি। নাটক হচ্ছে রঙ্গমঞ্চের জন্য। এবং প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে রঙ্গমঞ্চের বিকাশ তেমন ঘটেনি। সে এক অদ্ভুত অবস্থা : রঙ্গমঞ্চই নেই। আর দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন নাটকই নেই তো রঙ্গমঞ্চের বিকাশই বা কি করে হবে ? স্বাধীনতার পর অবস্থার শুভপরিবর্তন দেখা দিল।

শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্তরে রঙ্গমঞ্চ বিকাশের নব উদ্যোগ। এই পরিবর্তনের সুফল এখনই স্পষ্টভাবে দেখা যেতে শুরু করেছে। ভারতের অন্যান্য ভাষার মতো হিন্দীতেও নাটক খ্যাতিমান লেখককুলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

একাঙ্কী নাটিকা নাটকেরই এক অঙ্গ বিশেষ। এবং নাটকে যেমন স্থান, কাল ও ক্রিয়া এই তিন-এর সমন্বয় প্রয়োজন, ঠিক তেমনি একাঙ্কীতেও এই ত্রয়ীর সমন্বয় ঘটা দরকার। এখন রঙ্গ-মঞ্চে ও চলচ্চিত্রের সহায়তায় দূর এবং পুরাতন ঘটনার পটভূমিকা রচনা সম্ভব। সেই পদ্ধতির প্রয়োগ একাঙ্কীতেও সম্ভব। রঙ্গমঞ্চে এমন বহু নতুন প্রয়োগ ঘটেছে যার দ্বারা পুরানো টেকনিককে বদলে দেওয়া হয়েছে বা তাকে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে এ সব কিছুই একাঙ্কী অভিনয়ের বেলাতেও সম্ভব এবং তা করা হচ্ছেও।

বড় নাটক অভিনয়ের মধ্যেকার বিরতির সময়গুলি কিভাবে কাটানো যায় তার থেকেই বিদেশে একাঙ্কীর উদ্ভব। বড় নাটকে এক অঙ্কের অভিনয় শেষ হবার পর দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য মঞ্চসজ্জা করতে অনেক সময়, প্রায় আধ ঘণ্টাও, লেগে যায়। টিকিট কেটে নাটক দেখতে এসেছেন যেসব দর্শক মিনিট দশেকের কয়েকটা বিরতি তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে কাটিয়ে দিতে পারেন। একটা খাওয়াদাওয়ায় বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু দু'অঙ্কের লম্বা নাটকে এরকম বার বার বিরতিতে দর্শকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবেই। তার বড় নাটক অভিনয়ে এই বিরতিই-গুলিতে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য একাঙ্কী নাটিকা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েক মিনিটের এই নাটিকা পর্দার বাইরে অভিনীত হয়। এর বিষয়বস্তু প্রায় সময়ই, প্রচলিত ধাঁধা আর হাসি-কৌতুক। এমনি সময় 1903 সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ ওয়েস্টএণ্ড থিয়েটারে লুই. এন. পার্কারের 'দি মাঙ্কিজ পাম' (বাঁদরের পাঞ্জা) নামে এক একাঙ্কীর অভিনয় আকস্মিকভাবে অনুষ্ঠিত হল। নাটিকাটি দর্শকের এতই ভালো লাগল যে তাঁরা মূল

নাটককে ফেলে এর দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। ডবল্যু. ডবল্যু. জ্যাকবের এক কাহিনীর অবলম্বনে পার্কার এই একাঙ্কীটি তৈরি করেছিলেন। এইভাবে একে একে বিশিষ্ট লেখক ও সমজদার, দর্শক এবং সমালোচকদের মনোযোগ একাঙ্কীর এই নতুন শৈলীর দিকে আকৃষ্ট হল। তারপর বেশ দ্রুতগতিতে শুরু হল ভালো ভালো একাঙ্কী রচনা। ফলে এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে যত ভালো রঙ্গমঞ্চই হোক সেখানে একটা পূর্ণ নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দুই বা তিনটি একাঙ্কীর অভিনয় হয়েই থাকে এবং দর্শকও তা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই দেখে থাকেন।

আমি এক বিশেষ উদ্দেশ্যে 'দি মাঙ্কিজ পাম'-এর উল্লেখ করেছি। এই একাঙ্কীটি ছিল কাহিনী-আশ্রিত। আমার মতে এমন অনেক ভালো ভালো কাহিনী আছে, যেগুলিকে ভালো একাঙ্কীর রূপ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় কথা হল এই যে উপন্যাস ও কাহিনী যে সম্পূর্ণ পৃথকধর্মী— এই ব্যাপারটি আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই ; যদিও দুটিই কথাসাহিত্য (ফিকশন) -এর অন্তর্গত বলে গণ্য হয়। কিন্তু নাটক ও একাঙ্কী মূলত একই যদিও তাদের রূপ বিভিন্ন। দুইয়ের টেকনিকও এক, শ্রেণীও এক।

নাটক ও একাঙ্কীর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। আগে ছ'সাত অঙ্কের কম নাটক লেখা হত না। সংস্কৃত সাহিত্যেও এর নজির নেই। এখন সাধারণতঃ তিন অঙ্কের বেশী নাটক লেখা হয় না। একাঙ্কীতে একটাই অঙ্ক থাকে। আমার মতে একাঙ্কীকে দৃশ্য-পরিবর্তনের ঝামেলা থেকে মুক্ত রাখা উচিত। সাজসজ্জার কোন পরিবর্তন না করে, এক দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যকে পৃথক করে দেখানোর উদ্দেশ্যে যদি প্রয়োজন হয় তবে দু'তিন বার কিছুক্ষণের জন্য মঞ্চকে পুরোপুরি বা আধা অন্ধকার করা চলতে পারে। অথবা প্রয়োজনের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য পর্দাও নামিয়ে রাখা চলতে পারে। একাঙ্কীতে অভিনেতার সংখ্যা খুবই কম হওয়া উচিত যদিও তা আবশ্যিক নয় কেননা, ভীড়ের দৃশ্যও একাঙ্কীর বিষয় হতে পারে।

কিন্তু নাটকের চরিত্রের ওপর দর্শকের পুরো আকর্ষণ ও মনোযোগ তখনই পড়া সম্ভব যখন সে অভিনেতার কথা শোনার বা তাকে ভালোভাবে দেখার ও বোঝার অবকাশ পেতে পারে। একাঙ্কী নাটকের কাহিনীতে একত্বের ভাব থাকা খুবই দরকার অর্থাৎ নাটকের কাহিনীর গঠন যেন বেশ দৃঢ় হয়।

এদেশে শৌখীন রঙ্গমঞ্চের বিকাশ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। পুরানো নাটকের দিন আর নেই। এখন থেকে কুড়ি বছর আগে মারাঠী নাটক এত বড় হত যে প্রায় সারারাত ধরে তার অভিনয় চলত। আমার মনে পড়ে একটি নাটকে ষাটটিরও বেশী গান ছিল। ইংলণ্ডে বা বোম্বাই-এ দু-এক যুগ আগে ঠিক যে কারণে একাঙ্কীর প্রয়োজন দেখা গিয়েছিল আজকের ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কীর প্রয়োজন ঠিক সেজন্য দেখা দেয়নি। আজ একাঙ্কী লেখার বা অভিনয়ের দরকার এইজন্য যে এর মাধ্যমে, এর টেকনিক এবং স্টাইলের মধ্যে দিয়ে লেখক এমন কিছু বক্তব্য রাখতে চান যাতে দর্শকের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগে।

মুখ্যতঃ কলেজের নাট্যচক্রে অভিনয়ের জন্যই এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে হিন্দীতে একাঙ্কী রচনা শুরু হয়। তারপর রেডিওতে অভিনয়ের জন্যও একাঙ্কী নাটকের চাহিদা দেখা যায়। শুধু রেডিওর জন্যই কত একাঙ্কী লেখা হয়েছে এবং কত কাহিনীকে ধ্বনিরূপ দেওয়া হয়েছে। রেডিওর লোকেরা একে রেডিও-রূপক বলে থাকেন। যশপাল এবং ধর্মপ্রকাশ আনন্দ প্রমুখেরা কিছু কিছু কাহিনীকে এমনভাবে সংলাপে পরিবর্তিত করেছিলেন যে সেগুলিকে একাঙ্কী হিসাবে রেডিওতে এবং মঞ্চে উভয় জায়গাতেই অভিনয় করা চলত। কিন্তু তবুও মূলতঃ সেগুলি কাহিনীই ; একাঙ্কী নয়।

হিন্দীতে রেডিও-এর প্রেরণা ও প্রযত্নে যে একাঙ্কীগুলি রচিত হয় সেগুলি মোটামুটিভাবে 'শ্রাব্য' শ্রেণীর এবং এগুলি থেকে রঙ্গমঞ্চ বিশেষ লাভবান হয়নি। আমার মতে, একাঙ্কীর উৎকর্ষের বিচার রঙ্গমঞ্চেই হওয়া সম্ভব। এইভাবে সাহিত্যের সমস্ত শাখা-প্রশাখায়

যত বিভিন্নতা থাকবে ততই ভালো। সমস্ত বিদ্যাতেই নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো ভালো। কিন্তু এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল সব সময় উপলব্ধ হয় না। গত একশো বছর ধরে নাট্যকলার যে রূপ বিশেষ করে গ্রাম-ভারতে বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে আগামী দিনের একাঙ্কীর ওপরও তার প্রভাব পড়া অসম্ভব নয়।

হিন্দীতে রঙ্গমঞ্চের বিকাশ ঘটছে। এই রঙ্গমঞ্চে উনবিংশ শতাব্দীর রঙ্গমঞ্চ বা পারসী ফ্যাসানের রঙ্গমঞ্চের প্রভাবের তিলমাত্রই নেই। এর পেছনে মুখ্য প্রেরণা হল, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্য যা প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম সাহিত্য। আমার সম্পর্ক নাটকের প্রাণের সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত প্রেরণার' সঙ্গে। বিশ্বসংস্কৃতিতে আজ যে মহান ঐক্য-ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার প্রভাব বিশ্বের সমস্ত ভাষার ওপরেই এসে পড়ছে। মানবিকতা ও সুকুমার চিন্তা থেকেই প্রধানতঃ সৃষ্টির প্রেরণা আসে। তাই আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিশ্বের 137টি দেশের জনগণের জীবনযাত্রা, ব্যবহার, রীতিনীতি, ভাবনা-চিন্তার ব্যবধান ক্রমশই কমে যাচ্ছে, এবং তার প্রভাবে বিশ্বের প্রায় সাড়ে তিনশোটি ভাষায় রচিত সাহিত্যে প্রায় একই ধরনের ভাবনা-চিন্তা ও স্টাইলের উদ্ভব ঘটছে।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে পাশ্চাত্যে একাঙ্কীর উদ্ভব ঘটে 1903 সালে। তাহলে বলতে হবে হিন্দীতে একাঙ্কী রচনার প্রয়াস তার অনেক আগেই শুরু .হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ভারতেন্দুর কৌতুক একাঙ্কী 'অন্ধের নগরী' (অন্ধকার নগরী)। রাধাচরণ গোস্বামী, বালকৃষ্ণ ভট্ট, প্রতাপনারায়ণ মিশ্র এবং জয়শঙ্কর প্রসাদও একাঙ্কী লিখেছিলেন। যদিও ভারতেন্দু ও প্রসাদ ছাড়া অন্য লেখকদের রচনা একদিক থেকে বলতে গেলে কথোপকথন ছাড়া আর কিছু নয়।

'কর্টন রেজর' যে উদ্দেশ্যে একাঙ্কী লিখেছিলেন হিন্দীতে মোটেই সে উদ্দেশ্যে একাঙ্কী লেখা হয়নি। উনি হিন্দী নাটককে এক নতুন, সহজ ও ব্যবহারিক রীতির মধ্যে দিয়ে দেখেছিলেন। বাহ্যতঃ ভারতীয় হলেও এর মধ্যে সার্বভৌম ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

এই সঞ্চয়নের অধিকাংশ লেখকই হিন্দী সাহিত্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে শুধু উদয়শংকর ভট্টই গত শতাব্দীতে (1897) জন্মেছিলেন— বাকী নয়জন লেখকই জন্মেছেন বিংশ শতাব্দীতে। শ্রী ভট্ট ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কলাকার। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁর উৎসাহে কোন ভাটা পড়েনি বা নতুন শব্দ ও স্টাইল আয়ত্ত করতে আগ্রহের অভাব দেখা যায়নি। ধারাবাহিক-ভাবে ওঁর রচনা পাঠ করলে বোঝা যায় যে বিদেশের সমৃদ্ধ ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেও একজন লেখকের পক্ষে শুধু ঐকান্তিকতার জোরে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমকে সম্বল করে কতখানি সফল হওয়া সম্ভব। কবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, একাঙ্কী, উপন্যাস ইত্যাদি সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর রচনাগুলি শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়ে থাকে।

হিন্দী একাঙ্কীর সমৃদ্ধির ইতিহাসে রামকুমার বর্মা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। উনি প্রথম একাঙ্কী লেখেন 193) সালে। এবং সেটি লেখা হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে। শ্রী বর্মার কথায় "জীবনের কোন প্রাণবন্ত পরিস্থিতিকে ঘনীভূত করে পাত্রপাত্রী ও ঘটনার মাধ্যমে কৌতূহলো-দ্দীপক করে উপস্থিত করাই হল একাঙ্কীর লক্ষ্য"। শ্রী বর্মা নিজে কবি এবং ওঁর একাঙ্কীর মধ্যে ওঁর অন্তরের কবিমানসই পরিস্ফুট হয়েছে। গীতিকার কবির শক্তি ও সামর্থ্যের স্বাক্ষর তাঁর একাঙ্কীর মধ্যে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে।

হিন্দীতে শ্রী সেঠই প্রথম একক চরিত্র-সম্বলিত নাটক রচনার সূত্রপাত করেন। হিন্দী সাহিত্যে এই বস্তুটি এঁরই দান। ইনি যে ধরনের একক চরিত্র-সম্বলিত নাটক লিখেছেন, এরকম নাটক এর আগে আর কোন হিন্দী নাট্যকারই লেখেননি। ওঁর যত্নলালিত একক চরিত্র-সম্বলিত নাটকের ভিত্তির ওপরই পরে অন্য নাট্যকারেরা আরও কিছু ধরনের নাটক লিখেছেন। স্ট্রাণ্ডবার্গ এবং ওনীলের স্টাইলের অনুসরণে উনি 'প্রলয় ঔর সৃষ্টি' (প্রলয় ও সৃষ্টি) ; 'শাপ ঔর বর' (অভিশাপ ও বর) ; 'সত্যিকারের জীবন' ইত্যাদি সুন্দর

সুন্দর 'মোনো ড্রামা' রচনা করেন। নাটকের চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সুন্দরভাবে বিশ্লেষণের নিদর্শন এঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া শ্রী সেঠ নিজস্ব ক্ষমতায় 'উপক্রম' ও 'উপসংহার'-এ অভিনব রচনাশৈলীর প্রয়োগ করেছেন।

শ্রী অশক্ হলেন সম্পূর্ণ অন্য জগতের লেখক। লেখক হওয়ার জন্য উনি অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করেছেন— উপন্যাস, গল্প, নাটক, একাঙ্কী, স্মৃতিকথা— সব ক্ষেত্রেই উনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। এক-একটি রচনাকে উনি এক-একবার এক-এক রূপে লিখেছেন। ওঁর রচনায় ভাবের গভীরতা কম, কিন্তু স্বচ্ছতা আছে। 'তোয়ালে' রঙ্গমঞ্চে বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে। অবশ্য ঊর্দ রীতির দোষগুণ ওঁর রচনায় দেখা যায়।

শ্রী ভুবনেশ্বর ছিলেন মুখ্যতঃ একজন একাঙ্কী-রচয়িতা। পাশ্চাত্যের নাট্যকলা ও রীতির যথোপযুক্ত অনুশীলন উনি করেছেন। তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র 45 বছর। জীবনের শেষ দিনগুলি ওঁর কেটেছে অত্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে। ওঁর রচনাসম্ভার আকৃতিতে বিরাট না হলেও একাঙ্কী রচনার ক্ষেত্রে উনি ছিলেন পথপ্রদর্শক এবং সেইভাবেই উনি স্বীকৃত।

সাহিত্যে শ্রী বিষ্ণু প্রভাকরের প্রবেশ গল্প-লেখক হিসাবে। পরে উনি উপন্যাসও লেখেন। আকাশবাণীতে কাজ করতে করতে উনি রেডিও-রূপক লিখতে শুরু করেন এবং তা থেকেই ওঁর নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ। উনি নাটক ও একাঙ্কী দুইই লিখেছেন। ওঁর রচনা মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা উজ্জীবিত। তাই পাঠক ওঁর রচনা পাঠের দ্বারা যাতে মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন সেদিকে উনি আগাগোড়া লক্ষ্য রেখেছেন।

নাটক ও নাট্যকলার অনুশীলনে জগদীশচন্দ্র মাথুর সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। এই ব্যাপারে ওঁর অনুশীলন ও ভাবনাচিন্তা যথেষ্ট মূল্যবান। নাটক রচনার শক্তিও ওঁর ছিল। কিন্তু সময়াভাবে ওঁর যে পরিমাণ সামর্থ্য ছিল, সে পরিমাণ নাটক সৃষ্টি উনি করতে

পারেননি। ওঁর নাটক ও একাঙ্কী দুইই রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে লেখা। ব্যবহারিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও উনি ছিলেন চিন্তাশীল। 'ভোরের তারা' নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর রচনা। কিন্তু এটি পড়ে বা রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় দেখে দর্শকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে শেখর তার মহাকাব্যকে আগুনে আহুতি দিল কেন? একাধিক বছরের পরিশ্রমের কীর্তিকে আগুনে জলাঞ্জলি না দিয়ে কি সে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধে যেতে পারত না? যেমনভাবে সম্প্রতি আঁদ্রে মার্লো বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য যুদ্ধোদ্যত হয়ে উঠেছিলেন।

হিন্দী সাহিত্যে লক্ষ্মীনারায়ণ লাল নাটক সম্বন্ধে জ্ঞান ও চিন্তা ও মননশীলতার অধিকারী হিসাবে সুবিদিত। নাটকই ওঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে উনি যা অন্বেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, তা ওঁর ভবিষ্যৎ রচনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে। হিন্দীতে সম্ভবতঃ নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারে এঁর মতো নিষ্ঠাবান ও আগ্রহী মানুষ আর কেউ নেই!

ধর্মবীর ভারতীর মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে। উনি একই সঙ্গে সুকবি, সুলেখক ও সুনাট্যকার। নতুন কিছু দেবার ক্ষমতা ওঁর মধ্যে আছে। 'সৃষ্টির শেষ মানুষ' ওঁর একটি অন্যতম গীতি-একাঙ্কী।

এবং সবশেষে আমি আমার একটি ধ্বনি-একাঙ্কী এতে সংযোজন করেছি।

নয়াদিল্লী। **চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালংকার**

অনুক্রমণিকা

দশ হাজার

—উদয়শঙ্কর ভট্ট

চরিত্র ঃ

বিশাখারাম
সুন্দরলাল
রাজো
রাজোর মা
সরকার (খাজাঞ্চী)

(সময় : **বিকাল ৫টা**)

শহরের একপ্রান্তে একটা বাড়ী। বাড়ীতে বেশ বড় গোছের একটা ঘর। তাতে দুটো দরজা— একটা সিঁড়ির পাশেই আর একটা বাড়ীর ভিতরে যাওয়ার জন্য। গলির দিকে দুটো জানলা। ঘরের মধ্যে একটা বেশ বড় গোছের খাটের ওপর ময়লা বিছানা বিছানো। পূর্ব দিকের কোণে একটা চৌকী। তার সামনে কুলুঙ্গীতে একটি ঠাকুরের সিংহাসন, তাতে কয়েকটি পেতলের মূর্তি। মূর্তিগুলোর ওপর গাঁদা ফুলের মালা চড়ানো। কুলুঙ্গীর পেরেকে একটা রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে। হাতে-লেখা দুটো ছোট ছোট বই— কয়েকটা ছবি টাঙানো, তার মধ্যে একটা হচ্ছে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের যাতে রামের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে— হনুমান মালা ছিঁড়ছে। আর একটা ছবি কালী ঠাকুরের। ঘরের মধ্যে একটা মোড়া, একটা ভাঙা চেয়ার যার বেত ছিঁড়ে গেছে। এক কোণে একটা ছোট টেবিল, তার ওপর একটা ঘটি— তার মুখে একটা গেলাস রাখা। দুটো খুঁটি পোঁতা আছে, যার একটার মাথায় একটা পাগড়ী আর অন্যটার থেকে একটা ময়লা কোট ও একটা ওড়না ঝুলছে। খাটের ওপর লালা বিশাখারাম একটু গুঁড়িসুঁড়ি হয়ে শুয়ে—চোখে অস্থির ভাব। শুকনো শুকনো চেহারা, ফর্সা রং, চুলগুলো উস্কোখুস্কো। দেখে মনে হচ্ছে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। হাতে একটা চিঠি, সেটাকে বার বার চোখের কাছে নিয়ে এসে পড়ছে আবার হেড্ রেস্টের ওপর রেখে দিচ্ছে। আবার তুলছে, পড়ছে, আবার রেখে দিচ্ছে। উঠে বসে ছাতের কড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে আবার শুয়ে পড়ছে।

বিশাখারাম : দূর ছাই, এখন আবার যেতে হবে— তিথি দেখতে হবে। ভগবান এ যাত্রায় বাঁচাও আমায়। এ ঘোর বিপদে যে কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না। এ যাত্রায় পার করে দাও প্রভু।

(চোখ বন্ধ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে নমস্কার করল। আবার চোখ খুলেই চিঠিটা পড়তে লাগল।) কি করা যায় ? রাজো…ও রাজো…রাজোরে !…

(ভেতরের দরজা থেকে বছর-চোদ্দ বয়সের একটা মেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আসে ।)

রাজো : কি হল বাবু ! কি বলছ ?

বিশাখারাম : হ্যাঁরে সরকার মশাই এখনও আসেননি নাকি ? নাঃ আর বাঁচব না । কি বিপদ !

রাজো : দাদা কখন আসবে বাবু ? **(একেবারে পাশে এসে)** দাদাকে আনতে যাও না ? সামান্য কিছু টাকার ব্যাপার তো মাত্র । **(চোখ ভরা জল নিয়ে)** হায় ভগবান ! আচ্ছা লোক তো এরা ! কি দেখ্‌ছো কি ফ্যাল ফ্যাল করে, পাঠিয়ে দাও-না টাকাটা ?

বিশাখারাম : কি আর দেখব ! নিজের পোড়া কপাল দেখছি । টাকা আর আছেটা কৈ ? এখন আবার আনাজ কিনতে হবে । কাল মহম্মদ বলল টাকায় আনা সুদে হাজার দুই টাকা কর্জ করতে এসেছিল । তাকেও তো দিতে হবে । হাজার দশেকের সরকারী বণ্ড কিনতে হবে— এ সুযোগও তো হাতছাড়া করা যায় না । এ সুদ কি আর কোথাও পাওয়া যাবে রে বেটি ? উঃ !একেবারে দশ-দশটা হাজার টাকা দিতে হবে !

(খাটের ওপর ধড়াম্‌ করে শুয়ে পড়ল)

রাজো : (দৌড়ে) আচ্ছা বাবু, তোমার কি হয়েছে বল তো ? মা, ওমা, দেখতো বাবুর কি হল ?

(ভেতর থেকে 'আসছি' বলে রাজোর মা ঘরে ঢুকল।)

রাজোর মা : হ্যাঁগো এত হৈ-হৈ করার কি হয়েছে বল তো ? দিয়ে দাও-না দশ হাজার টাকা । টাকা তো আবার আসবে । কিন্তু ছেলে গেলে…হে ভগবান, এ কি বলছি আমি ? ক্ষমা কর প্রভু !

(হাত জোড় করে কুলুঙ্গীতে রাখা সিংহাসনের দিকে তাকায়) দয়া কর প্রভু !

বিশাখারাম : সরকার মশাই আসেন নি ! **(চোখ বন্ধ করল)**

রাজো : আসবেন নিশ্চয়ই। তাহলে কি ঠিক করলে বাবু ?

রাজোর মা : কেন মিছামিছি ঝামেলা করছ ! হে ঈশ্বর, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। আমার সব নাও— আমার কিচ্ছু চাই না। হে ভগবান আমার খোকাকে আমার কাছে এনে দাও। **(কাঁদতে থাকে)**

রাজো : (মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে) কাঁদছ কেন মা ? দাদাকে আনতে বল-না বাবুকে।

রাজোর মা : (চোখের জল মুছতে মুছতে) কি আর বলব মা, তোর বাবু তো শুধু টাকা চিনেছে ; টাকা আর টাকা ! ভগবান তো আমায় একটাই মাত্র ছেলে দিয়েছেন !

বিশাখারাম : (চোখ খুলে) রাজো, সরকার মশাই আসেন নি···দেখ্-না মা !

রাজো : এখনো তো আসেননি দেখ্ছি।

বিশাখারাম : চিনি কিনতে বলেছিলুম কে জানে কিনলেন কিনা ! এখন না কিনলে আবার দাম চড়ে যাবে। উঃ মহা ঝামেলা। ইব্রাহিমকে টাকার তাগাদা দিতে বলেছিলুম। কে জানে কি করল ! চার বছর হতে চলল, বদ্মাসটা এক পয়সাও সুদ দেয়নি। নাঃ, মোকদ্দমা না করলেই নয়। না হলে বেইমানটার কাছ থেকে একটা পয়সাও আদায় হবে না।

(চিঠিটা হাতে নিয়ে) হুঁ, এখন এটা নিয়ে কি করি ?

(রাজো রাজো বলে ডাকতে ডাকতে সরকার মশাই খটং খটং শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসে।)

বিশাখারাম : এই যে সরকার মশাই **(একদম উঠে বসে)** আরে আসুন আসুন সরকার মশাই। আজ বড় দেরী করলেন যে !

(**সরকার মশাইকে আসতে দেখে রাজো আর ওর মা অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল।**)

সরকার মশাই ঃ ভগবান মঙ্গল করুন ! হ্যাঁ আজ একটু দেরী হয়ে গেল। সারাদিনের হিসেবপত্র সব বাকী ছিল। তের আনা দরে একশো বস্তা চিনি কিনে নিয়েছি ! মহম্মদ বক্স-এর লোক এসেছিল। আমি বলে দিয়েছি শেঠজী এসে কথাবার্তা বলবেন। শুনলুম, ইব্রাহিম ফেরার হয়ে গেছে। ক্যাশ মিলোতে মিলোতেই এত দেরী হয়ে গেল। হ্যাঁ, পাঠানের কাছ থেকে কোন চিঠি এল নাকি ?

বিশাখারাম ঃ চিনির দাম তো বার আনা চার পাই ছিল, তো তের আনা করে কিনলেন কেন ? ইব্রাহিম পালিয়েছে ! বড় দুঃ-সংবাদ। চার-চারটে হাজার টাকা...আদায় কি করে হবে ! চৌধুরীকে বলেছেন ? ও তো জামিন ছিল, না ? গভর্নমেণ্ট বণ্ডের কোন খবর হল ? টাকা রেডি রাখুন বুঝলেন ? বণ্ডগুলো কিনতেই হবে।

সরকার মশাই ঃ শেঠজী, পাঠানের কাছ থেকে কোন চিঠি এল ?

বিশাখারাম ঃ হ্যাঁ, ক্যাশে বাকী কত ? চৌধুরীর কাছে এখনই লোক পাঠিয়ে টাকার তাগাদা দিন। (**শুয়ে পড়ে**) চারদিকে ঝামেলা ! উঃ টাকা নিয়ে কেউ দেওয়ার নামটি করে না। (**চোখ বুজল**) ভগবান ! কী দিনই পড়েছে ! (**উঠে পড়ে**) এখন আবার যেতে হবে, শরীর দেখব না টাকার ভাবনা ভাবব ! কি যে করি ! (**বসে পড়ে**)

সরকার মশাই ঃ (**শেঠজীর মুখের দিকে তাকিয়ে** নাঃ শেঠজী, অসুখ-বিসুখ করে গেলে মহা মুশকিল হবে। পাঠান কিছুই লেখে নি ? সুন্দরলালের খোঁজ করতেই হবে ! কে জানে বেচারাকে কত কষ্টই না দিচ্ছে !

বিশাখারাম ঃ নিন, এটা পড়ে দেখুন। দেখুন ছেলের কীর্তি দেখুন। বদের একশেষ। একটুও লড়াই না করে একেবারে নতুন

বউটির মত পাল্কি চড়ে বাবু চলে গেলেন—আমার বুকে জাঁতা পেষবার জন্য। কোথা থেকে দশ হাজার টাকা পাই আমি? দশ হাজার...এক-আধ টাকা নয় (**চিঠি সরকার মশাইয়ের হাতে দিয়ে**) নিন পড়ুন, সব বরবাদ করে দিল। বাইরে গেলি কেন বাপু?

সরকার মশাই : শেঠজী সুন্দরলালের আর কি দোষ! ওকে তো···আপনিই পাঠিয়েছেন।

(**চিঠি পড়তে থাকে**)

বিশাখারাম : সব বরবাদ করে দিল। হ্যাঁ জোরে জোরে পড়ুন।

সরকার মশাই : (সচকিতভাবে) এ তো সুন্দরলালেরই হাতের লেখা দেখছি। লিখেছে, "বাবা, যদি আমায় জ্যান্ত ফিরে পেতে চান তো, কোন লোকের হাত দিয়ে কাবুলি ফটকের বাইরে আজ ঠিক সন্ধ্যে আটটায় দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেবেন। পুলিশ বা এ' ধরনের অন্য কোন সাহায্য নিলে, খান্ বলেছে, ছেলেকে জ্যান্ত ফিরে পাবেন না। ওরা আমার ওপর বড় অত্যাচার চালাচ্ছে! বোধ হয় নরক-যন্ত্রণাও এর চেয়ে ভাল। আশা করি, আপনি আমায় রক্ষা করবেন।

—আপনার পুত্র,
সুন্দরলাল

নীচে খান্ নিজে পস্তুতে লিখেছে—

"আমি তোমাকে এই শেষবারের মত বলে দিচ্ছি আজ সন্ধ্যে আটটার সময় কাবুলি ফটকের বাইরে দশ হাজার টাকা পৌঁছে না দিলে তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব।

—আমীর আলী খাঁ।"

(সরকার মশাই চিঠি রেখে বিশাখারামের দিকে দেখতে থাকেন)

সরকার মশাই : শেঠজী, দশ হাজার টাকা জোগাড় করা

আর মুস্কিল কি ? আজই তো বুধবার, মহম্মদ বক্সকে না দিলে দশ হাজার টাকা ঠিক যোগাড় হয়ে যাবে। টাকা তো আছে।

বিশাখারাম : (উঠে পড়ে) টাকায় এক আনা সুদ সরকার মশাই ! **(ধমকে উঠে)** নিজের ঘর থেকে বার করতে হলে বুঝতেন ? না খেয়ে না দেয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা পয়সা, বুঝলেন ? একেবারে দশ হাজার টাকা !...হায় ভগবান ! একেবারে পথের ভিখিরি করে দিলে।

(রাজো আর তার মা একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়ে।)

রাজোর মা : শুনলেন সরকার মশাই ? বুদ্ধিশুদ্ধির মাথা তো একেবারে খেয়ে বসেছে। খালি টাকা আর টাকা ! সরকার মশাই দয়া করুন ভাই, আমার ছেলেকে এনে দিন। ওরে আমার সুন্দর রে ! আমার প্রাণের বাছা রে !

(ঘোমটা দিয়ে মাটিতে বসে পড়েন। রাজো দৌড়ে গিয়ে বরফের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বাবার দিকে দেখতে থাকে।)

বিশাখারাম : দেখুন তো সরকার মশাই ! আমি কি বলব যে ছেলে না ফিরুক ? আমিও তো চাই যে ছেলে যে-কোন ক্রমেই হোক ফিরে আসুক ! আমি কি সুন্দরের বাপ নই ? আপনিই বলুন, সুন্দর না থাকায় ঘর কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ! কিন্তু তাই বলে একেবারে দশ হাজার !

সরকার মশাই : (মাথা নেড়ে) তা তো বুঝলুম। কিন্তু এ তো করতেই হবে।

রাজোর মা : আজ চার দিন হল বাছাকে আমার দেখিনি গো। ওগো, টাকা টাকা করে ছেলেকে হারিয়ো না গো। দশ হাজার চুলোয় যাক্। কে জানে বাছা আমার এতক্ষণে কেমন আছে ! টাকা আর সুদেই তো এঁর বুদ্ধিশুদ্ধি সব খেয়েছে। সরকার মশাই আপনার পায়ে পড়ি, আমার সুন্দরকে এনে দিন।

সরকার মশাই : ধৈর্য ধরুন মা, একটু ধৈর্য ধরুন, ধরুন ছেলে আপনার ঘরেই আছে।

রাজোর মা : কি করে ধরব, বাছা আমার ঘরে আছে? সরকার মশাই, ধৈর্য ধরতে বলেন আমাকে। **(স্বামীর প্রতি কটাক্ষ করে)** এঁর ভাবগতিক দেখে তো মনে হচ্ছে, আর বুঝি ছেলেকে ফিরে পাব না। বলে কি, যা হবার হয়ে গেছে। হে ভগবান!

রাজো : সরকার মশাই, দাদাকে শীগ্‌গির এনে দিন। দেখুন। ক'দিন ধরে মা'র চোখে ঘুম নেই। সারা রাত ধরে শুধু কাঁদছে। চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে ফুলে গেছে। শীগ্‌গির এনে দিন সরকার মশাই **(কাঁদতে থাকে)**

রাজোর মা : ওগো আমি কি করি গো! আমার গয়না বিক্রী করে আমার ছেলেকে এনে দাও গো।

সরকার মশাই : অধৈর্য হচ্ছেন কেন মা, শেঠজীও তো আপনার চেয়ে কম উৎকণ্ঠিত নন।

বিশাখারাম : দেখুন তো সরকার মশাই। আমিই কি রাত্রে ঘুমুতে পারছি। দিবারাত্র চিন্তা আর চিন্তা। সুন্দর আমার চোখের সামনে ঘুরছে ফিরছে। ওর সেই ছোট্ট বেলাকার কথা মনে পড়ছে। এদিকে ইব্রাহিম টাকা দিতে এল না। আচ্ছা ওর সুদ কত হয়েছে, হিসাব করেছেন? চিনি রাখবেন কোথায়? গুদামে না? দেখবেন চাবিটা কিন্তু নিজের কাছে রাখবেন। না পারেন তো আমাকে দিয়ে যাবেন।

সরকার মশাই : শেঠজী, সুন্দরলালের ব্যাপারে কি ঠিক করলেন? টাকার ব্যবস্থা করব? সময় যে আর বেশী নেই। **(শেঠের দিকে তাকিয়ে)** পনের হাজার টাকা এখনই ট্রেজারীতে রেখে এলুম।

বিশাখারাম : দশ হাজার! দু'চার টাকার ব্যাপার নয়। আচ্ছা সরকার মশাই, আর-কোন বন্দোবস্ত হয় না। পুলিশকে খবর দিন না?

সরকার মশাই : পুলিশই বা কি করতে পারবে, শেঠজী ! পুলিশেরও ভয় আছে। আর পুলিশ জানেটা কি, কিন্তু কিছু করলে তো ! শেঠজী আমার মতে আর অন্য চেষ্টা করে লাভ নেই। নয়তো ছেলেকে আর ফিরে পাবেন না। ভগবান করুন, এমনটা না হয়।

রাজোর মা : সরকার মশাই, আপনি হাঁ করে কি দেখছেন ? এই নিন আমার গয়না নিয়ে যান। (**খুলে সামনে রেখে**) নিন, আমার ছেলেকে এনে দিন, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

বিশাখারাম : তোমরা সবাই মিলে কি আমায় মেরে ফেলতে চাও ? গয়নাও কি ঘরের জিনিষ নয় ?

সরকারমশাই : শেঠজী ! দেরী হয়ে যাচ্ছে। যা করবার তাড়াতাড়ি করুন।

রাজোর মা : বলছি তো যান নিয়ে আসুন। পাঠানকে এসব দিয়ে দিন।

বিশাখারাম : কি আর করা যায় ? সরকার মশাই ! আলী-বক্স তার গহনা ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে ?

সরকারমশাই : শেঠজী, অনর্থক দেরী হয়ে যাচ্ছে ! কাবুলী ফটক যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করুন।

(বিশাখারাম দশ হাজারের কথা মনে পড়তেই আবার ধড়ফড়িয়ে শুয়ে পড়ে।)

সরকারমশাই : কি শেঠজী, কি ঠিক করলেন ? তাড়াতাড়ি করছি এই জন্যে যে দোকান থেকে সঙ্গে করে কিছু লোক নিয়ে যাব।

রাজোর মা : আরে বল তো ছাই। বল, বল, সরকার মশাই (**কর্তৃত্বের সুরে**) এই নিন টাকা। আচ্ছা, আমি কি এ বাড়ীর কেউ নই ? যান যান আর একটুও দেরী করবেন না। হে ভগবান, রক্ষা কর।

সরকার মশাই : যে আজ্ঞে। (**চলে যায়**)

রাজো : (**মাকে**) এবার দাদা ফিরে আসবে, তাই না মা ?

রাজোর মা : হ্যাঁ মা, সরকার মশাই আনতে গেছেন। ভগবানকে ডাক যেন সুন্দর আমার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফেরে।

বিশাখারাম : (**হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে**) সরকার মশাই চলে গেছেন ?

রাজো : হ্যাঁ বাবা, গেছে।

বিশাখারাম : আমায় একেবারে পথে বসিয়ে দিল রে। কি থেকে কি হয়ে গেল। কুলাংগার কোথাকার! কত কষ্টে আমি দু'পয়সা কামাই আর একেবারে দশ দশ হাজার হায় ভগবান! (**ফিরে শুয়ে পড়ে**) ওগো, রাজোর মা গো, আমি আর বাঁচব না গো।

রাজোর মা : টাকাই কি বড়! ঘরের ছেলে ঘরে এলে টাকা আবার হবে। ঈশ্বর আমাদের সব কিছুই দিয়েছেন। হে ঠাকুর, দয়া করো। আচ্ছা তুমি এত ভাবছ কি বলত ?

বিশাখারাম : ভাবব না ? (**উঠে বসে**) মুখের রক্ত তোলা পয়সা, মুখের রক্ত তোলা পয়সা বুঝলে ! আজ চল্লিশ বছর ধরে একটি একটি টাকা রোজগার করতেহয়েছে সেই টাকা (**ফের শুয়ে পড়ে**)।

রাজোর মা : অমন রোজগারে লাভ কি ? না তীর্থ-ধর্ম, না জপ-তপ। একবারের জন্য হরিদ্বারেও নিয়ে গেলে না। তোমার পয়সা আছে, এ তো আমি জানতেই পারলুম না। চার-চারটে বাড়ী তোমার, আর আমি এই অন্ধ গলিতে পড়ে পড়ে পচছি। আজ তিন-চার লাখ টাকার মালিক তুমি— একটা পয়সাও কখনো কাউকে হাত তুলে দাওনি। এসব সম্পত্তি হবে কি ?

বিশাখারাম : (**উঠে পড়ে**) আগুন লাগিয়ে দাও সব। সরকার মশাই আজকের বিক্রীর এক পয়সার হিসাব দেন নি। বেইমান... সব বেইমান। জয় ভগবান (**শুয়ে পড়ে**) দশ হাজার টাকা এই হতচ্ছাড়ার জন্যে... সরকার মশাই কোথায় গেল রে রাজো ?

রাজোর মা : টাকা কিসের জন্যে শুনি? এতে সুন্দরের কি দোষ?

বিশাখারাম : সরকারমশাই কোথায়? তাগাদায় গিয়েছেন বোধ হয়? প্রভু হে, দয়া কর।

(সুন্দরলাল ও সরকারমশাই-এর প্রবেশ। রাজোর মা সুন্দরলালকে দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। রাজো দাদাকে জড়িয়ে ধরল। ছেলে এগিয়ে এসে প্রথমে বাবার ও পরে মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।)

বিশাখারাম : (**ছেলেকে দেখে**) এসে গেছিস! বড় খুশী হলুম।

রাজোর মা : আজ বাছাকে দেখে আমার বুক জুড়োল। (**ছেলেকে জড়িয়ে ধরে**) এস, চোখের মণি আমার।

রাজো : দাদা এসেছে। দাদা এসেছে (**দাদার গলা জড়িয়ে ধরে**)

রাজোর মা : কত রোগা হয়ে গেছিস এ ক'দিনে!

সুন্দরলাল : হ্যাঁ মা, ভগবান করুন, আর যেন এই রাক্ষসের খাঁচায় পড়তে না হয়। মেরে আমার সারা শরীর ফুলিয়ে দিয়েছে। (**দেখাতে দেখাতে**) উঃ হাড়ে এখনো ব্যথা আছে।

বিশাখারাম : বেশ হয়েছে, বাবা আমার, তুই বাড়ী এসেছিস। কি করে এলি? ওরা কি এমনিই ছেড়ে দিল? সরকারমশাই আজ সুদের কত কি আদায় হল?

সুন্দরলাল : (**সরকারমশাইকে দেখে**) দশ হাজার টাকা দিয়েছেন না?

সরকারমশাই : (**ঘাবড়ে গিয়ে**) হ্যাঁ, মা হুকুম দিয়েছেন।

বিশাখারাম : কী, পুরো দশ হাজার!

(একেবারে ধড়াস করে বালিশের ওপর শুয়ে পড়ল। সুন্দরলাল, সরকারমশাই, রাজো বিশাখারামের দিকে দেখতে থাকে।)

রাজোর মা : (**সুন্দরলালের পিঠ আদর করে চাপড় দিয়ে**) ওঁর ঘুম পেয়েছে। চল্‌ বাছা চল্‌ ভেতরে চল্‌।

(পর্দা নেমে আসে।)

কৌমুদী মহোৎসব

—রাম কুমার বর্মা

চরিত্র :

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত	—কুসুমপুরের মৌর্য সম্রাট
চাণক্য	—সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্র
বসুগুপ্ত	—কুসুমপুরের সমাহর্তা
যশোবর্মন	—কুসুমপুরের অন্তঃপাল
পুষ্পদন্ত	—কুসুমপুরের কার্যান্তিক
অলকা	—রাজনর্তকী
	সৈনিক ও দৌবারিক

(সময় ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ শতাব্দ)

(বাইরের চারদিকে কোলাহল। মধ্যে মধ্যে বিউগল-এর আওয়াজ। শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে আওয়াজ হাওয়ায় ক্ষীণ হয়ে আসছে।)

(রাজকক্ষে সমাহর্তা বসুগুপ্ত ও অন্তঃপাল যশোবর্মন কথাবার্তায় মগ্ন।)

বসুগুপ্ত ঃ কুসুমপুরবাসীর কোলাহলে নগর আজ যেন একেবারে গমগম করছে। ঢাল যেন উঁচিয়ে আছে যে-কোন তলোয়ারের সঙ্গে তাল ঠুকবার জন্য। কুসুমপুরের উদ্দীপনা হল একটা ঢাল যার কাছে বিদ্রোহের তলোয়ারও হার মানতে বাধ্য। এবার নিশ্চয়ই অন্তঃপাল যশোবর্মনের সন্দেহ দূর হয়েছে।

যশোবর্মন ঃ বসুগুপ্ত! সন্দেহ জলের বুদ্‌বুদ নয় যে মুহূর্তেই উবে যাবে। সন্দেহ হল ধূমকেতুর গতিপথ যা আকাশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর জান তো, ধূমকেতু কিসের প্রতীক? ভয়ের, আশঙ্কার, অমঙ্গলের।

বসুগুপ্ত ঃ কিন্তু ভয়, আশঙ্কা বা অমঙ্গল তো আর নেই। নন্দ-বংশ ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো তার জয়ঢাক তিন টুকরো হয়ে গেছে।

যশোবর্মন ঃ টুকরো টুকরো হয়ে গেলেই তো মঙ্গল, কিন্তু হলে তো!

বসুগুপ্ত ঃ হলে তো মানে? এখন আর আছে কোথায়! শক, যবন, পারসীক আর বাহ্লীক রাজাদের সঙ্গে করে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে প্রবেশ করেছেন এবং প্রজামণ্ডলী তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে। এই কোলাহলে কি তুমি প্রজাদের ফুর্তির সেই ফোয়ারা দেখতে পাচ্ছ না?

যশোবর্মন : দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই কোলাহলের মধ্যে এমন কণ্ঠস্বর থাকতে পারে যা থেকে পরিহাস ও ব্যঙ্গের ধ্বনি উঠছে। নন্দর প্রতি রাজভক্তি আজও নির্লোপ হয়নি। সবুজ ঘাসের মধ্যে কুশ আর কাঁটাও তো থাকতে পারে।

বসুগুপ্ত : থাকলে তা নির্মূল করে দেওয়া যাবে।

যশোবর্মন : কিন্তু মহাশয় কি জানেন না যে নন্দের মন্ত্রী রাক্ষসের কূটকৌশল গোপনে কাজ করে চলেছে। নন্দ নেই, কিন্তু নন্দের মন্ত্রী তো জীবিত, সে ছদ্মবেশে কুসুমপুর থেকে বেড়িয়ে গেছে।

বসুগুপ্ত : তাতে কি? আমাদের কাছেও ছদ্মবেশ ধরে ফেলবার মত চোখ আছে। (**কোলাহল আরো বেড়ে চলেছে**) দেখেছ! কোলাহল ক্রমশই বেড়ে চলেছে! জানলা বন্ধ করে দাও।

যশোবর্মন : হ্যাঁ, কথাবার্তা শোনাই যাচ্ছে না। (**জানলা বন্ধ করে দেয়**)

বসুগুপ্ত : সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে প্রবেশ করার পর তার প্রথম কাজই হচ্ছে এখানকার শাসন ব্যবস্থা ঠিক করা।

যশোবর্মন : আচার্য চাণক্যের মাথায় রাজনীতির কত প্যাঁচই না প্রতিদিন খেলছে। ওঁর চেয়ে বেশী ব্যবস্থা করা আর কার পক্ষে সম্ভব?

বসুগুপ্ত : তার মানে তুমি কি বলতে চাও যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধিসুদ্ধি কেবল তাঁর বাহুবলেই?

যশোবর্মন : হ্যাঁ, চাণক্যের বুদ্ধি আর চন্দ্রগুপ্তের বাহুবল মিলেই নন্দবংশের পতন ঘটিয়েছে। চাণক্যের বুদ্ধির জোরেই নন্দবংশের বিলাস-সন্ধ্যা চন্দ্রগুপ্তের যশ-চন্দ্রিমার উদয়কে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি।

(**নেপথ্যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জয়ধ্বনি**)

বসুগুপ্ত : (**উৎসুকভাবে**) সম্রাট কি এসে গেছেন? তাহলে

জনতার এত কোলাহল হল ওঁরই সম্বর্ধনার জন্য? জানালা খুলে দেখো তো, যশোবর্মন।

যশোবর্মন : দেখছি। (**জানলা খুলতেই কোলাহলের শব্দ আরো জোরে আসতে শুরু করে।**) হ্যাঁ, জনতা আনন্দে ফুলের মালা হাতে নিয়ে লাফাচ্ছে। মহারাজ অন্দরমহলের সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করছেন। ওঁকে চমৎকার দেখাচ্ছে— প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, আয়ত অরুণ নেত্র। সম্রাট জনতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছেন। বলবার সময় ওঁর কথায় বীরত্ব প্রকাশ পাচ্ছে যেন চার দিকের দিগন্ত থেকে ভেসে আসা প্রতিধ্বনি পুঞ্জীভূত হয়ে একটা গুরুগম্ভীর নাদ তুলে যাচ্ছে। ওঁর ভ্রূ যুগলে ক্ষমতার দীপ্তি। চোখ থেকে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপনাগুলো যেন বাঁকাপথে ঠিক্‌রে বেরিয়ে যাচ্ছে। আলুথালু চুলের ওপর মুকুট, মাথা থেকে মুকুটের চূড়োটা যেন মাথা হেলানো মাত্র লজ্জাশীলা মেয়ের চাহনির মত আনম্র হয়ে পড়বে। মুখাবয়বে শক্তির জ্যোতি দেখে মনে হচ্ছে ঐটাই যেন রাষ্ট্রশক্তির মেরুদণ্ড। সৈনিকের মত সাজ-গোজ, গলায় মুক্তোর মালা, কোমরে মখমলের খাপের মধ্যে খড়্গ, বড় বীরত্বব্যাঞ্জকপোশাক-আশাক ওঁর।

বসুগুপ্ত : সত্যি সম্রাট যেন বীর রসের প্রতীক। এই যে দৌবারিক যে! (**দৌবারিকের প্রবেশ**)

দৌবারিক : জয়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জয়! সম্রাট আসছেন।

বসুগুপ্ত : আমরাও ওঁর সম্বর্ধনার জন্য তৈরী। তুমি এস, বাহির মহলের দরজা থেকে ওঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি হবে।

দৌবারিক : যে আজ্ঞে। (**প্রস্থান**)

যশোবর্মন ; সম্রাট তক্ষশীলায় গ্রীকদের সৈন্য সঞ্চালনের যে পদ্ধতি দেখে এসেছেন, সেই কৌশলের সাহায্যে উনি সারা ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। বৈদেশিক কূটনৈতিক কৌশলের উপর ভিত্তি করে উনি ভবিষ্যতের জন্য একটা প্ল্যান করে রেখেছেন। এ খবর বেশী লোকের জানা নেই।

বসুগুপ্ত : রাজনীতির সঙ্গে নারী ! তুমি তাই বলতে চাও তো ?

(চাপা হাসির শব্দ । সম্রাটের জয়ধ্বনি এবং কার্যান্তিক পুষ্পদন্তের সঙ্গে সম্রাটের প্রবেশ ।)

বসুগুপ্ত ও যশোবর্মন : (**সম্মিলিতভাবে**) সম্রাটের জয় হোক !

সমাহর্তা বসুগুপ্ত ! কুসুমপুরীর ঐশ্বর্য আজ আমি নিজের চোখে দেখলাম । যেন মনে হচ্ছে যুদ্ধের ভৈরবী গেরুয়া ধারণ করেছে আর সমগ্র কুসুমপুর সন্ন্যাসিনী হয়ে গেছে । নগরীর সৌন্দর্য যেন নির্বাসিত । এখানে তলোয়ারের ঝনঝনাও বাতাসে বিলীন হয়ে যাচ্ছে । জনগণের এই উল্লাস যেন শৃগালের চিৎকারের মত মনে হচ্ছে এখানে আনতে হবে জীবনের স্পন্দন । সবাইকে এবার চলে যেতে বলো ।

বসুগুপ্ত : যে আজ্ঞে সম্রাট । (**প্রস্থান**)

(ধীরে ধীরে কোলাহল থেমে আসে ।)

চন্দ্রগুপ্ত : অন্তঃপাল যশোবর্মন ! যে শৌর্য, যে তেজ আমি গ্রীক সৈন্যদের চাকরদের মধ্যেও দেখেছি তা কুসুমপুরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের মধ্যে দেখি না । এখানকার লোকের স্পষ্ট কথা বলার সাহস নেই । একটা ছলনা, একটা জড়তা যেন সমস্ত কুসুমপুরকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে আছে । এ থেকে একে মুক্ত কর, যশোবর্মন ।

যশোবর্মন : আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি আচার্য চাণক্যের সুশাসনে কুসুমপুর ফুলের মত সুন্দর এবং আপনার কীর্তির মত নির্মল হয়ে উঠবে, সম্রাট !

(বসুগুপ্তের প্রবেশ)

চন্দ্রগুপ্ত : যথার্থ বলেছ ! আচার্য চাণক্য সুকৌশলে কুসুমপুরের রাজনীতিতে এমন চক্রব্যূহ রচনা করেছেন যাতে অরাজকতা বিশৃঙ্খলার পথ মৃত্যুর অতল তলে তলিয়ে যাবে, যে অতলের নীচে নন্দবংশ চিরনিদ্রায় শয়ান ।
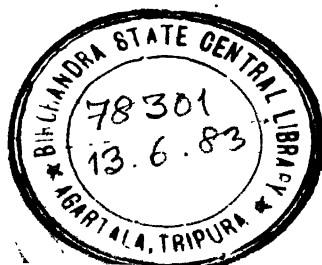
বসুগুপ্ত : আর সেই নন্দবংশের চোখে বিলাসিতার মোহমদ শেষ পলক অবধি জড়িয়ে আছে।

চন্দ্রগুপ্ত : আমি দুঃখিত, কিন্তু অন্য কোন উপায় নেই। তরবারির রাস্তাই রাজ্যশাসনের একমাত্র রাস্তা। যে লোক বিলাসিতার বোঝা মাথায় করে চলে সে তার দেহকে খড়্গাঘাতে দু টুকরো করে দেবার জন্য তরবারির আহ্বান জানায়। আমি আচার্য চাণক্যের চক্রব্যূহের মৃত্যুতোরণকে মহাজীবনের জয়তোরণে পরিণত করব।

বসুগুপ্ত : সম্রাটের বাহুবলে এবং আচার্য চাণক্যের সুকৌশলে তা সম্পূর্ণ সম্ভব।

চন্দ্রগুপ্ত : আচার্য চাণক্যের সহায়তায় এখনও পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তাতে প্রজাদের অসন্তুষ্ট হবার কিছু নেই। তক্ষশীলায় যেমন করেছি ঠিক সেইভাবেই কুসুমপুরের সমস্ত বাধাবিপত্তি আমি দূর করে দেব। প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই হল সু-শাসনের মানদণ্ড।

যশোবর্মন : যথার্থ বলেছেন সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : এই কারণে আমি মহোৎসবের আয়োজন করতে চাই— কৌমুদী মহোৎসব। আজ শারদীয়া পূর্ণিমা। সমাহর্তা বসুগুপ্তের প্রস্তাব অনুযায়ী আজ মধ্যাহ্নেই আমি এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলাম। প্রকৃতির এই নির্মল চন্দ্রিমা জনতার মনের সব পাপ-বাসনা ধুয়ে মুছে দেবে। তাই কৌমুদী মহোৎসব হল কুসুমপুরের এক পবিত্র রাজনৈতিক উৎসব।

বসুগুপ্ত : সম্রাট! এ পর্যন্ত কুসুমপুরের সিংহদ্বার শুধু শৃগালকেই অভ্যর্থনা জানিয়েছে। আজ আপনার প্রবেশের পর এর সিংহদ্বার নাম সার্থক হল।

চন্দ্রগুপ্ত : বসুগুপ্ত! তোমার বাক্য মধুর। সেইজন্যেই কুসুম-পুরের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে আমি জনগণের হাতে হাত মিলাবার দায়িত্ব দিয়ে নবীন সমাহর্তার পদে ভূষিত করলাম। তুমি মহামিলনের গান গেয়ে মানুষে মানুষে হৃদয়ের সম্পর্ক সংস্থাপন কর।

বসুগুপ্ত : সম্রাটের মহানুভবতা !

চন্দ্রগুপ্ত : প্রজার কল্যাণই আমার যাত্রাপথের পাথেয় হোক। (**কার্যান্তিক পুষ্পদন্তের প্রতি**) কার্যান্তিক পুষ্পদন্ত ! কৌমুদী মহোৎসবের জন্যে কুসুমপুরের জনগণের মধ্যে এক দারুণ ঔৎসুক্য লক্ষ্য করেছ কি ?

পুষ্পদন্ত : সম্রাট ! কৌমুদী মহোৎসবের খবর জনগণের কাছে পৌঁছোন মাত্রই রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি মানুষ আপনার জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছে, শূদ্র মহাপদ্মনন্দের অত্যাচারের অমানিশার অবসান হল। এলো আপনার অনুপম উদার শাসনের মঙ্গলময় প্রভাত, সম্রাট ও আচার্য চাণক্য যৌথভাবে শাস্ত্র ও ধরিত্রীকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আপনার কুসুমপুরে প্রবেশ শাস্ত্র ও ধরিত্রীর মঙ্গলবার্তা বয়ে এনেছে।

যশোবর্মন : প্রজাগণের মধ্যে নন্দবংশের সমর্থক কিছু লোক আছেন যাঁরা নন্দবংশ বিনাশে ক্ষুব্ধ। সম্রাটের কৌমুদী মহোৎসব সম্বন্ধীয় ঘোষণা তাঁদের এই অসন্তোষকে দূর করে দেবে এবং তাঁদেরকে রাজভক্তিতে অনুপ্রাণিত করে তুলবে। কৌমুদী মহোৎসবের অনুষ্ঠানে কুসুমপুরবাসী নগরীর অপরূপ শোভা দর্শনে আপন পর ভুলে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবে। নগরীর শোভা দর্শনে তাদের ভাবনাচিন্তার মোড় ঘুরে যাবে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই উৎসব সম্বন্ধে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

বসুগুপ্ত : সাবধানতার প্রয়োজন কি ? ঐশ্বর্যময়ী নগরী তো সালংকারা জননী। জননীর ঐশ্বর্য দেখে কোন্ সন্তান খুশী না হয় ? সাধারণ অনাত্মীয় অপরিচিত ব্যক্তির কল্যাণ কামনাও সুখকর সুতরাং মহিমাময় সম্রাটের কল্যাণ কামনাও জনগণের হৃদয়ে সম্রাটের প্রতি ভক্তিরসের মন্দাকিনী না বহিয়ে দিয়ে থাকতে পারে !

চন্দ্রগুপ্ত : ঈশ্বর করুন, তাই যেন হয়। (**কার্যান্তিক পুষ্পদন্তের প্রতি**) তা পুষ্পদন্ত ! কৌমুদী মহোৎসবের আয়োজন কতদূর ?

পুষ্পদন্ত : সম্রাট ! কৌমুদী মহোৎসবের জন্য কুসুমপুরকে সাজানোর কাজে শিল্পীবর তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমে একশত নৌকাকে সম্রাটের শুভ নামের আকারে সাজিয়ে তার চল্লিশ হাত ওপরে আকাশদীপ সজ্জার আয়োজন করা হয়েছে যাতে শারদ-জ্যোৎস্নার স্মিতহাস্যের সঙ্গে দীপের আলোক-মণ্ডলে শোভিত হয়ে সম্রাটের নামও প্রজাগণের হৃদয়ে প্রবেশ করে।

চন্দ্রগুপ্ত : উত্তম, তোমার এই মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল প্রশংসনীয়। আর ?

পুষ্পদন্ত : তাছাড়া সম্রাট, নগরীর কাষ্ঠপ্রাচীরের চৌষট্টিটি দ্বার মঙ্গল-কলসের সারিতে শোভিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দূর থেকে মনে হবে যেন কুসুমপুর এক জ্যোতি-সরোবর যাতে চতুর্দিকে দীপালোকের চৌষট্টিটি তরঙ্গ প্রবহমান।

চন্দ্রগুপ্ত : এই সৌন্দর্য পরিকল্পনা সত্যিই প্রশংসা করবার মত।

পুষ্পদন্ত : সম্রাট ! প্রাচীরে যে পাঁচশো সত্তরটি অলিন্দ আছে, সেগুলিতে নগরবাসীগণ মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে দীপালোকে নৃত্য করবেন। নৃত্যরতা রমণীদের অঙ্গাভরণের মণি-মুক্তাগুলি যখন দীপালোকের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করে উঠবে তখন মনে হবে যেন জ্যোতি-পদ্মের ওপর আলোক-ভ্রমর মহানন্দে ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রগুপ্ত : সুন্দর ! অতি সুন্দর !

পুষ্পদন্ত : আরও সম্রাট ! শোণ নদী বরাবর নগর-প্রাচীরকে সহস্র দীপদানে শোভিত করা হবে। মনে হবে যেন নগরীর চারদিক দিয়ে দীপালোকের আকাশগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে।

বসুগুপ্ত : সম্রাট ! শিল্পীশেখর পুরস্কারের দাবি রাখেন।

চন্দ্রগুপ্ত : অবশ্যই। আর কার্যান্তিক পুষ্পদন্ত ! তুমি এও ঘোষণা করে দাও যে এই মহোৎসবে যত অর্থ ব্যয় হবে তা রাজ–

কোষ থেকে ব্যয় না হয়ে আমার 'চন্দ্র-কোষ' থেকে ব্যয় হবে। প্রজাকুলের মনোরঞ্জনের জন্যই যখন এই উৎসব তখন সমস্ত ব্যয়ভার আমিই বহন করব।

বসুগুপ্ত : সম্রাট মহানুভব! শূদ্র রাজা মহাপদ্ম প্রজাবর্গের কাছ থেকে সহস্র সহস্র রাজস্ব আদায় করে নিজের বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করতেন আর প্রজাকুলের ভাগ্যে জুটত প্রাণদণ্ড। নিজেকে জাহির করবার হাজার চেষ্টা করেও মহাপদ্ম প্রজাগণের হৃদয়ে এতটুকু স্থানও পাননি। ওঁর ছেলে ধননন্দের সময়েও ঐ একই ব্যাপার ঘটত।

চন্দ্রগুপ্ত : বসুগুপ্ত! এই নোংরা আলোচনায় আজকের সভাকে কলুষিত কোরো না।

বসুগুপ্ত : আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট। আমার অন্যায় হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত : আর কার্যান্তিক পুষ্পদন্ত! প্রজাগণের বাসগৃহের সাজসজ্জা কেমন হবে?

পুষ্পদন্ত : সম্রাট! বাসগৃহগুলিতে তাদের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন রঙ এর আলোক-তোরণ নির্মাণের ব্যবস্থা হয়েছে। দেখে মনে হবে যেন রাত্রিকালেও সম্রাটের রাজধানী রামধনুর সপ্তরঙে নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রায় সেজে আছে।

বসুগুপ্ত : আর সেইসঙ্গে সম্রাট সমক্ষে নন্দবংশের রাজনর্তকীর নৃত্যেরও আয়োজন তো করতে হবে।

যশোবর্মন : নগরীর শোভায় যখন সকলে বিভোর তখন আর নর্তকীর শোভা দেখবে কে?

বসুগুপ্ত : নগরীর শোভা দেখার পর সম্রাটের বিশ্রামেরও তো প্রয়োজন। বিশ্রামের মুহূর্তটুকুতে নিদ্রার আমেজ আনবার জন্যই রাজনর্তকীর নৃত্যের প্রয়োজন।

চন্দ্রগুপ্ত : কার্যান্তিক পুষ্পদন্ত! যাও, শিল্পীবরকে কৌমুদী মহোৎসবের আয়োজন আরো শীঘ্র সম্পন্ন করতে বল। আর আমার 'চন্দ্র-কোষ' থেকে তাঁর জন্য পাঁচ সহস্র পণের পুরস্কারও ঘোষণা করে

দিও। আর শোন, আমি যেন তূর্য-নাদে কৌমুদী মহোৎসবের প্রারম্ভ সংকেত পাই।

পুষ্পদন্ত : যথা আজ্ঞা সম্রাট! (**প্রস্থান**)

চন্দ্রগুপ্ত : শিল্পীবর সত্যিই পুরস্কারের যোগ্য। কুসুমপুরের এমন সৌন্দর্য সজ্জা এই বোধ হয় প্রথম হচ্ছে। তাই না, বসুগুপ্ত?

বসুগুপ্ত : হ্যাঁ সম্রাট! আপনি ঠিকই বলেছেন। কুসুমপুরে আমি এতটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু মহারাজ নন্দ বিলাসিতার চূড়ান্ত করেও কখনো এমন নগরসজ্জা করেছেন বলে মনে পড়ে না। এ শুধু আপনার সুশাসনেরই ফল, কুসুমপুর আজ সত্যি সত্যিই ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রগুপ্ত : বসুগুপ্ত! তোমার প্রশংসা অতিশয়োক্তিতে ভরে উঠছে। এত প্রশংসা শুনে আমার যেন মাঝে মাঝে সন্দেহ ঠেকছে।

বসুগুপ্ত : কি সম্বন্ধে সম্রাট?

চন্দ্রগুপ্ত : তুমি যা বলছ তার যথার্থতা সম্বন্ধে।

বসুগুপ্ত : সম্রাট যাচাই করে দেখতে পারেন। সত্যিকে সত্যি বলা কি অতিশয়োক্তি সম্রাট? সম্রাট নিজে স্পষ্টবক্তা। সুতরাং বুঝতেই পারছেন।

চন্দ্রগুপ্ত : রণনীতি ভিন্ন আর কিছুই আমি বুঝতে চাই না। মহামন্ত্রী চাণক্যের যুক্তিতেই তোমাকে সমাহর্তার নতুন পদ দেওয়া হয়েছে। তোমার সম্পর্কে ওঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করার মত ফুরসত আমার হয়নি।

যশোবর্মন : আচার্য চাণক্যকে জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল সম্রাট!

বসুগুপ্ত : যশোবর্মন! আমাকে অপমান করার অধিকার তোমাকে কেউ দেয়নি। মনে রেখ, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করছ।

যশোবর্মণ : সম্রাটের সেবক ও আচার্য মহামন্ত্রী চাণক্যের এই

শিষ্য তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে পেছ-পা হয় না। বসুগুপ্ত! সম্রাট! আমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের অনুমতি দিন।

চন্দ্রগুপ্ত : যশোবর্মন! এটা রাজসভা, যুদ্ধক্ষেত্র নয়! কৌমুদী মহোৎসবে রক্তের অভিষেকের প্রয়োজন নেই। তোমারও এত শীঘ্র ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নেই।

বসুগুপ্ত : আমায় ক্ষমা করবেন সম্রাট! কিন্তু সত্য যেন রক্ষা হয়।

চন্দ্রগুপ্ত : সত্য অবশ্যই রক্ষা হবে। আর আজ কৌমুদী মহোৎসবে তো সৌন্দর্যের রক্ষা হতেই হবে। হ্যাঁ তুমি রাজনর্তকীর সম্বন্ধে কি বলছিলে যেন?

বসুগুপ্ত : সম্রাট! সেবকের নিবেদন এই যে, বিশ্রামের মুহূর্তটুকুতে নিদ্রার আমেজ আনবার জন্য রাজনর্তকীর নৃত্যের প্রয়োজন।

চন্দ্রগুপ্ত : হ্যাঁ, তা তো বটেই।

বসুগুপ্ত : তাই, সম্রাট! আমি তার অঙ্গসজ্জার বিশেষ ব্যবস্থা করেছি। রাজনর্তকী বেশভূষায় সুসজ্জিতা হয়ে রাজপ্রাসাদের উত্তরকক্ষে অপেক্ষরতা।

চন্দ্রগুপ্ত : উত্তম! আমার অভিলাষ উদ্রেকের পূর্বেই তুমি কার্যের আয়োজন করেছ। বসুগুপ্ত! আমি খুশী হয়েছি। কৌমুদী মহোৎসব.কালে তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে থাকবে।

বসুগুপ্ত : এ আমার পরম সৌভাগ্য, সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : এই সময় আমার তক্ষশিলার কথা মনে পড়ছে। ওখানে অষ্টাদশ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হত— এক সহস্র শিক্ষার্থী ছিল। সেখানে আমার এক বন্ধু ছিল। তোমরা হয়তো তার নাম শুনে থাকবে— বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কাত্যায়ন।

বসুগুপ্ত : উনি তো ব্যাকরণ-রচয়িতা পাণিনির অনুশীলনসিদ্ধ শিষ্য সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : হ্যাঁ, আমি আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ ও শল্যবিদ্যা শিক্ষা

করতাম। আর সে বেদ ও ব্যাকরণ পড়ত। পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রাবলী ভাষা-সাহিত্যের প্রচলনের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। সেইরকম তোমার কাজ আমার ইচ্ছার পূর্বগামী।

বসুগুপ্ত : প্রভু! আপনার স্নেহে আমি ধন্য!

চন্দ্রগুপ্ত : ওখানেই আমার আচার্য চাণক্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। নীতিবিদ আচার্য চাণক্যের সমান বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সমস্ত আর্যাবর্তে আজ বিরল। আমার পরম সৌভাগ্য যে আচার্য আমার মহামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছেন।

যশোবর্মন : সম্রাট! আচার্য চাণক্যের জ্ঞান অমরত্ব লাভের দাবি রাখে। শুধু রাজনীতিতে নয় আয়ুর্বেদেও আচার্য চাণক্য অত্যন্ত নিপুণ। চীনদেশের এক রাজকুমার নিজের চক্ষু চিকিৎসার জন্য তক্ষশীলায় এসেছিলেন। আচার্য মাত্র সাত দিনের চিকিৎসাতেই তাঁর পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

চন্দ্রগুপ্ত : হ্যাঁ, তা আমি জানি। ওঁর রাজনীতিতে মুগ্ধ হয়ে তক্ষশীলার রাজা অম্ভীক ওঁকে তক্ষশীলাতে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উনি ওখানে থাকতে চাননি। উনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আমরা দুজনে একটা আলাদা রাজ্য স্থাপন করব।

যশোবর্মন : আর সম্রাট! ওঁর ভবিষ্যৎ বাণী কেমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে দেখুন।

বসুগুপ্ত : তা তো স্বাভাবিক। প্রখর অন্তর্দৃষ্টি বলে এক নিমেষেই উনি অপরের মনের গতিবিধি বুঝে ফেলেন। তাছাড়া কি করে কি করতে হয় তা উনি ভালোভাবে জানেন। ওঁর মধ্যে অপূর্ব শক্তি, অপূর্ব সাহস এবং অপূর্ব বুদ্ধির এক বিচিত্র সমন্বয়

যশোবর্মন : উনি একজন নবরত্ন সম্রাট! আপনার সহযোগিতায় উনি রাজ্যকে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করে দেবেন।

চন্দ্রগুপ্ত : আমারও তাই বিশ্বাস, কিন্তু কৌমুদী মহোৎসবের ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে কোনো পরামর্শই করা হয়নি। এই যুদ্ধ যুদ্ধ করে

ওঁর সঙ্গে পরামর্শের ফুরসতই পেয়ে উঠিনি। কিন্তু এর আরম্ভ সংবাদ উনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

বসুগুপ্ত: আপনার অভিপ্রায় উনি অবশ্যই সমর্থন করবেন। কৌমুদী মহোৎসবের উপযোগিতা এবং এর এই শুভ যোগ অন্তর্দৃষ্টি বলে অবশ্যই দেখে থাকবেন। নাঃ সময় অনেক হল। সম্রাট! রাজনর্তকীর নৃত্যের ব্যাপারে কি ঠিক করলেন?

চন্দ্রগুপ্ত: ওর নাম কি বললে যেন?

বসুগুপ্ত: অলকা, সম্রাট! যেমন অপরূপ রূপ নৃত্যকলায়ও ওর তেমনি দখল।

চন্দ্রগুপ্ত: বেশ, ওকে এখানে হাজির করো।

বসুগুপ্ত: অবশ্যই সম্রাট! রাজপ্রাসাদের উত্তরকক্ষে ও বেশ-ভূষা করে অপেক্ষা করছে। এখুনি ওকে সম্রাটের সেবায় হাজির করছি। (**সানন্দে প্রস্থান**)

চন্দ্রগুপ্ত: আজ রাজনর্তকী অলকার নাচ দেখে কুসুমপুরের নৃত্যকলার মানের পরিচয় পাওয়া যাবে। বুঝলে যশোবর্মন।

যশোবর্মন: সম্রাটের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে।

চন্দ্রগুপ্ত: নিবেদন! বেশ, বলো।

যশোবর্মন: বিলাসপ্রিয় নন্দরাজাদের রাজনীতিচক্রের একটা অঙ্গস্বরূপ এই রাজনর্তকী অলকা।

চন্দ্রগুপ্ত: এ কি সেই রাজনর্তকী অলকা?

যশোবর্মন: হ্যাঁ সম্রাট! রাজনর্তকীর জীবনের একটা বড় অভিশাপ হল এই যে এ ছিল নন্দবংশের ধ্বংসের কারণস্বরূপ এবং সেই কারণে একেও নির্দোষ বলা যায় না।

চন্দ্রগুপ্ত: নির্দোষ? বরং সব দিক থেকেই দোষী। জান গৌতমমুনি অহল্যাকে কেন অভিশাপ দিয়েছিলেন? অহল্যা নিজের রূপ সামলাতে পারেনি বলে, সে ইন্দ্রকে চিনেও চিনতে পারেনি বলে। নিজের লালসা তৃপ্তির জন্য যে ইন্দ্র শচীর একান্ত অধিকারকে অপ্সরাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয় তার চরিত্রের কথা অহল্যা জানত না

নয়। সেইরকম অলকাও মহারাজ নন্দের চরিত্রের কথা সব জানত। ওর রূপের ঝংকার কি মহারাজ নন্দের চোখে বিদ্যুতের মত খেলে যায়নি? যশোবর্মন! উল্কা আকাশের আলোর সঙ্গে মিশে থাকে কিন্তু যখন তা দেখতে পাওয়া যায় তখনই সারা সংসার তাকে অমঙ্গলের লক্ষণ হিসাবে গণ্য করে।

যশোবর্মন : সম্রাট যখন সবই জানেন তবে ওর নৃত্যের অনুমতি কেন দিচ্ছেন?

চন্দ্রগুপ্ত : শুধু কৌমুদী মহোৎসবকে সুন্দর করে তোলার জন্যে। কুসুমপুরের জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্যই শুধু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ নন্দের আশ্রিতের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন। যশোবর্মন! মহারাজ নন্দের কাছে যা ছিল বিষ তাকেই আমি অমৃত করে তুলতে চাই।

যশোবর্মন : সম্রাট তক্ষশীলার স্নাতক। সুতরাং রাজনীতিতে রাজনর্তকীর স্থান কি তা সম্রাটের অজানা নয়।

চন্দ্রগুপ্ত : তরবারির ধারকে ঢেকে রাখার জন্য খাপের প্রয়োজন, রাজনীতিতে রাজনর্তকীর প্রয়োজনও ঠিক তাই। রাজনীতির কঠোর খড়্গের বিভীষিকা লুকোবার জন্যই রাজনর্তকীরূপী আবরণের প্রয়োজন, কিন্তু এই আবরণ কৃপাণের ধার যেন না নষ্ট করে। রাজনীতির কদর্যতা প্রজাদের চোখের আড়ালেই রাখা উচিত।

যশোবর্মন : অবশ্যই সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : কিন্তু রাজনর্তকী মহারাজ নন্দের রাজনীতির ধার নষ্ট করে দিয়েছিল। সে সময় সে নিজেই তরবারিকে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল আর আমি ওকে এখন তরবারির খাপ বানিয়ে রাখব। (**একটু হেসে**) আচ্ছা, কি ব্যাপার বল তো? তূর্যনাদে কৌমুদী মহোৎসবের প্রারম্ভ সংকেত তো শুনতে পেলাম না?

(**বসুগুপ্তের প্রবেশ**)

বসুগুপ্ত : সম্রাট! রাজনর্তকী সম্রাটের সেবায় উপস্থিত।

চন্দ্রগুপ্ত : বেশ, হাজির করো। ঘরের আবহাওয়াকে নৃত্য আর সঙ্গীতের তালে মুখরিত করে তুলুক তোমার নর্তকী।

বসুগুপ্ত : যথা আজ্ঞা, সম্রাট ! (**প্রস্থান**)

চন্দ্রগুপ্ত : অন্তঃপাল যশোবর্মন ! নৃত্য আর গীত দিয়েই হোক কৌমুদী মহোৎসবের প্রস্তাবনা যাতে আনন্দের রূপরেখা মঙ্গলাকারে সুসজ্জিত হয়। নৃত্য জিনিসটা হল মনোরম স্বপ্নের মত, এতে সুখের আমেজ উপলব্ধি হয়।

(**বসুগুপ্তের সঙ্গে অলকার প্রবেশ**)

অলকা : সম্রাট ! দাসী অলকার প্রণাম গ্রহণ করুন। (**শিল্পী-জনোচিত প্রণাম জানায়**)

চন্দ্রগুপ্ত : (**হাত উঠিয়ে**) কুসুমপুরের সৌন্দর্য ও সুষমা তোমার মধ্যে সুপ্রকাশ হয়ে উঠুক। (**যশোবর্মনের প্রতি**) তুমি এখন আসতে পারো।

যশোবর্মন : যে আজ্ঞে সম্রাট ! আমার নিবেদন এই যে এই নৃত্যসভায় আচার্য চাণক্যকেও আহ্বান জানানো হোক।

চন্দ্রগুপ্ত : (**সহাস্যে**) আচার্য চাণক্য ? তুমি রাজনীতির সঙ্গে কাব্যকে মিশোতে চাও ? বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো ওঁকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারো। রাজনীতির জাল বুনতে বুনতে উনিও তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সুতরাং ওঁরও বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। রাজনীতির মস্তিষ্ক আজ নৃত্যরসে সুসিক্ত হয়ে উঠুক।

যশোবর্মন : যে আঁজ্ঞে সম্রাট ! (**প্রস্থান**)

চন্দ্রগুপ্ত : রাজনীতি আর কাব্য ! (**রাজনর্তকীর প্রতি**) রাজনর্তকী ! তুমি রাজনীতির তালে তালে নাচতে পারো ?

অলকা : সম্রাট ! এ যাবৎ তো রাজনীতিই আমার নৃত্যের তাল ছিল। কিন্তু এদিকে আমি কখনও মন দিতে পারিনি। রাজনর্তকীর রাজনীতির সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? সম্রাট! রাজনীতি তো রাজ্যেরই অনুচরী মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত : (**সহাস্যে**) ঐ রহস্যময় কথাটির গুণে অনুচরীই স্ত্রী হয়ে যায়, রাজনর্তকী ! যাক সে কথা। মহারাজ নন্দ তোমার

প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন না তুমি মহারাজ নন্দের প্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলে, বলো তো ?

অলকা : সম্রাট আমায় মাফ করবেন। কোনো সচ্চরিত্রা মেয়ে কখনও কাউকে মুগ্ধ করতে চায় না, সে আত্মসমর্পণ করতে চায়। যে নারী মোহিত করে সে তার নিজের রূপের ব্যবসা করে মাত্র, হৃদয় দেয় না।

চন্দ্রগুপ্ত : তা, তুমি রূপের ব্যবসা কর না হৃদয়ের ব্যবসা কর ?

অলকা : হৃদয় নিয়ে বেচাকেনা চলে না সম্রাট !

চন্দ্রগুপ্ত : আচ্ছা বেশ, বেচাকেনা নয়, তা না-হয় হৃদয় সমর্পণই হল !

অলকা : হৃদয় সমর্পণকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না সম্রাট ! মন দেওয়ার ব্যাপারটা যখন ভাষার ওপর ভর করে তখনই তা ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায়। আর হৃদয় নিয়ে কখনও ব্যবসা চলে না।

চন্দ্রগুপ্ত : কিন্তু মহারাজ নন্দ তো হৃদয় নিয়েই ব্যবসা করতেন, আর সেই ব্যবসাতেই তো তিনি তাঁর সাম্রাজ্য খুইয়েছেন। তাই নয় কি ?

অলকা : তা ঠিক, সম্রাট ! কিন্তু ব্যবসা পুরুষই করে আর সেই ব্যবসায় সে সব-কিছু খোয়াতেও পারে আবার জিততেও পারে।

চন্দ্রগুপ্ত : পুরুষ সম্বন্ধে তোমার ধারণা অত্যন্ত খারাপ দেখছি।

অলকা : হ্যাঁ ঠিক, যেমনি পুরুষের ধারণা নারী সম্বন্ধে খারাপ। পুরুষের কাছে নারী বিলাসের সামগ্রী মাত্র।

চন্দ্রগুপ্ত : কিন্তু কোনো নারীকেই জোর করে বিলাসিতার সামগ্রী করে তোলা যায় না। নারী পুরুষকে জয় করবার উদ্দেশ্যেই নিজেকে বিলাসিতার সামগ্রী সাজায় আর পরে সে পুরুষের দোষ দেয়।

অলকা : সম্রাট, আপনি রাজনীতিতে বিশারদ আর এই দাসী আপনার পায়ের ধুলো মাত্র। আদেশ করুন কি নিবেদন করি ?

চন্দ্রগুপ্ত : কিন্তু রাজনর্তকী! ধুলোও তো কখনও কখনও মাথায় উঠে পড়ে।

অলকা : হ্যাঁ সম্রাট, মাথা যখন পায়ে ঠেকে তখন। কিন্তু দাসীর তাতে অধিকার নেই।

চন্দ্রগুপ্ত : অধিকার নেই! ঐ তো তার স্বাভাবিক গতিপথ আর গতির ব্যাপারে তো অধিকারের আড়ম্বর নেই, ওতে আছে বিদ্যুতের ঝলক। আর তোমার মধ্যে সেই বিদ্যুতের ঝলক আছে যা আকাশের বুক চিরে হঠাৎ নেমে এসে নন্দের মত বিশাল শাল-বৃক্ষকে ধরাশায়ী করেছে।

অলকা : তাহলে তো আমায় বিদ্যুতের মত ভূমণ্ডলে বিলীন হয়ে যেতে হয় সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : কিন্তু তাই বলে রাজনর্তকী মহাসতী সীতা তো হয়ে যেতে পারে না যে সে মাটিতে বিলীন হয়ে যাবে। রাজনর্তকীর কাজই তো হল রাজ্যকে শৃঙ্গার রসসিক্ত করা।

অলকা : এ আমার জীবনের অভিশাপ, সম্রাট! মৃতদেহের ওপর যে ফুল চাপানো হয় সে ফুলের সৌন্দর্য কোথায়? তাই আজ সম্রাটের চরণে পড়ে আমি জীবনের সব গ্লানি থেকে মুক্ত হতে চাই।

চন্দ্রগুপ্ত : আজকের দিনে হতাশার কথা বোলো না, রাজনর্তকী! আজ কৌমুদী মহোৎসব! শুভ দিন। কুসুমপুরের জনগণ আজ আমার সঙ্গে আনন্দে বিভোর হয়ে যেতে চায়। মধুকণ্ঠী! তোমার গানে তুমি এই পরিবেশকে মধুময় করে তোলো।

অলকা : সম্রাটের যেমন ইচ্ছা! কিন্তু আজ থেকে আমি রাজনর্তকীর পদ ত্যাগ করে আপনার পদযুগলের ধুলোয় শয়ন করব। আর তাতেই আমি অমর হয়ে যাব।

চন্দ্রগুপ্ত : রাজনর্তকী! মনে রেখো, তুমি চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কথা বলছ, মহারাজ নন্দের সঙ্গে নয়। আমার পায়ের ধুলো বীরপুরুষের সঞ্জীবনের জন্য, রাজনর্তকীর জন্য নয়। যাই হোক তোমার ব্যবহারে আমি খুশী হয়েছি। কুসুমপুরের জনগণকে তুমি নৃত্যশিক্ষা দিও

এবং আজকের কৌমুদী মহোৎসবে তাদের মঙ্গলাচরণ তোমার নৃত্য দিয়েই শুরু হোক। নৃত্য আরম্ভ করো, কুসুমপুরের বায়ুমণ্ডল তোমার নূপুরের ঝংকারে নেচে উঠে দিকে দিকে কৌমুদী মহোৎসবের নিমন্ত্রণ বার্তা পৌঁছে দিক।

বসুগুপ্ত : অলকা! কুসুমপুরের অতুলনীয় নৃত্যশিল্পের পরিচয় তোমাকে দিতে হবে। এখন এমন নৃত্য চাই যা সম্রাটকে মোহিত রে তোলে এবং তাঁকে জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেয়।

চন্দ্রগুপ্ত : আমার তো কোনো দুঃখ নেই, বসুগুপ্ত।

বসুগুপ্ত : না, মানে সম্রাটের আবার দুঃখ কি! সম্রাট সৈনিক পুরুষ, সৈনিকের তো দুঃখের প্রশ্নই ওঠে না। আমি বলছিলাম কি যে মানে কুসুমপুরবাসীর মঙ্গল চিন্তা করতে করতে সম্রাটের মন নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই···

চন্দ্রগুপ্ত : ঠিক আছে, নৃত্য অরাম্ভ করো।

অলকা : যে আজ্ঞে, সম্রাট! **(প্রণাম করে নৃত্য শুরু করে। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর গান শুরু)**

গান

(কিছুক্ষণ নৃত্যের পর সম্রাট কর্তৃক নৃত্যের প্রশংসা)

চন্দ্রগুপ্ত : সুন্দর···চমৎকার! রাজনর্তকী অলকা! তুমি যেমন সুন্দর তেমনই সুন্দর তোমার নৃত্য! এই নাও তোমার পুরস্কার!

(চন্দ্রগুপ্ত নিজের গলার মুক্তাহার খুলছেন সহসা চাণক্যের প্রবেশ)

চাণক্য : পুরস্কার দেওয়া হবে না, সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : (আচার্যের প্রতি) মহামন্ত্রী চাণক্য!

চাণক্য : সম্রাট! আগুন নিভে যাওয়ার পরও তার ছাই গরম থাকে, তাকে হাত দিয়ে ওঠানো যায় না। এত অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি কি করে ধরে নিলে যে কুসুমপুরের আগুন নিভে গেছে এবং ছাই এতই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে তাতে করে কুসুমপুরে ফুলের বাগান সাজানো চলবে।

চন্দ্রগুপ্ত : মহামন্ত্রী, চন্দ্রগুপ্তের ভবিষ্যৎ ফুলের বাগানে নয়, চন্দ্রগুপ্তের ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রে— এ কথা সে ভালোভাবেই জানে। নূপুরের ঝংকারে নয়, তরবারির ঝন্‌ঝনার মধ্যেই সে তার জীবন-সঙ্গীত গেয়েছে। আপনি কি করে বুঝলেন যে ক্ষণিকের প্রমোদ-বিনোদনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত তার সমরাঙ্গনকে ফুলবাগানে পরিণত করেছে? আপনার বোঝা উচিত ছিল যে ক্ষণিকের এই আমোদ ভবিষ্যৎ যুদ্ধেরই ভূমিকা মাত্র।

চাণক্য : আর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত! যদি এই ক্ষণিকের বিশ্রামের মধ্যেই তোমার জীবনসন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে তাহলে? তোমার ভবিষ্যতের সমরাঙ্গনই যদি তোমার শবের শ্মশানে পরিণত হয় তো ঐ বিশ্রাম মুহূর্তটুকুকে তুমি কি বলবে?

চন্দ্রগুপ্ত : আর্য, বিশ্রাম মুহূর্তের সীমা কোথায় এবং কতখানি তা বোঝবার মত বুদ্ধি চন্দ্রগুপ্তের...

চাণক্য : (**চন্দ্রগুপ্তের কথার মধ্যপথে**) না, তা নেই। এবং তাই বুঝেই আমি নিজের সঙ্গে সৈনিক নিয়ে এসেছি। (**উচ্চৈঃস্বরে**) সৈনিকগণ! রাজনর্তকী এবং সমাহর্তাকে বন্দী করো!

(**নেপথ্য থেকে সৈনিকের আগমন**)

বসুগুপ্ত : সম্রাট, রাজমর্যাদা বিপন্ন, রক্ষা করুন!

চন্দ্রগুপ্ত : মহামন্ত্রী, বসুগুপ্ত আমার নতুন সমাহর্তা!

চাণক্য : কিন্তু সে এখন বন্দী। সৈনিকগণ, এদের দু'জনকে বন্দী করো। যদি কেউ বাধা দেয় তো বল প্রয়োগ করো।

বসুগুপ্ত : (**করুণ স্বরে**) আমি নির্দোষ, আমি নির্দোষ, সম্রাট! মহামন্ত্রী! আমি নির্দোষ।

অলকা : (**অত্যন্ত করুণ স্বরে**) আমাকে স্পর্শ কোরো না। আমি নারী। সম্রাট! আমি তো বন্দীই থাকি। হায়রে, নারীর জীবন! জীবনভোরই তার বন্দী দশা! (**বিহ্বল হয়ে ওঠে**)

চন্দ্রগুপ্ত : (**এগিয়ে এসে**) আর্য চাণক্য !...

চাণক্য : স্তব্ধ হও, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ! চাণক্য জানে তার কর্তব্য কি ? সৈনিকগণ ! এদের দু'জনকে বন্দী করে কক্ষান্তরে নিয়ে যাও ।

সৈনিক : যে আজ্ঞে ।

(**দুজনকে বন্দী করে সৈনিকদের প্রস্থান**)

চন্দ্রগুপ্ত : মহামন্ত্রী ! রাজমর্যাদার এ চরম অপমান ! যে রাজমর্যাদাকে আমি নিজের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছি, আজ তুচ্ছ সৈনিকে সেই রাজমর্যাদাকে পায়ে ধুলোয় লুটিয়ে দিল ? এ কি ধরনের রাজনীতি ! আজ কৌমুদী মহোৎসবের দিনে···

চাণক্য : কৌমুদী মহোৎসব ?

চন্দ্রগুপ্ত : হ্যাঁ, আপনি কি আমার ঘোষণা শোনেন নি ?

চাণক্য : তা শোনার অযোগ্য ।

চন্দ্রগুপ্ত : রাজমর্যাদার এতদূর অপমান আপনি কোন্ সাহসে করেন ? কৌমুদী মহোৎসবের ঘোষণাই কুসুমপুরে আমার প্রথম রাজ-ঘোষণা ।

চাণক্য : এ রাজঘোষণা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেছে ।

চন্দ্রগুপ্ত : (**আশ্চর্যজনক ভাবে**) শেষ হয়ে গেছে ! কার এতদূর স্পর্ধা ?

চাণক্য : আমার, আর্য চাণক্যের ।

চন্দ্রগুপ্ত : আচ্ছা, এই জন্যেই তাহলে ঘোষণার তূর্যনাদ আমার কানে আসেনি ! আপনিই তাহলে কৌমুদী মহোৎসবের ঘোষণা বন্ধ করেছেন ?

চাণক্য : হ্যাঁ, আমিই ঘোষণা বন্ধ করে দিয়েছি ।

চন্দ্রগুপ্ত : কি কারণে, জানতে পারি কি ?

চাণক্য : না, কারণ আমি বলতে চাই না ।

চন্দ্রগুপ্ত : সম্রাট কে ? চন্দ্রগুপ্ত না চাণক্য ?

চাণক্য : চন্দ্রগুপ্ত ।

চন্দ্রগুপ্ত : তাহলে সম্রাটের আদেশের এই অবহেলা কিসের জন্য?

চাণক্য : এইজন্যে যে এই আদেশ নেহাতই শিশুর চপলতা।

চন্দ্রগুপ্ত : তা সত্ত্বেও তা মেনে নিতে হবে।

চাণক্য : না, ছোটছেলে আগুন নিয়ে খেলতে চায়, কিন্তু তাকে আগুন নিয়ে খেলতে দেওয়া যায় না।

চন্দ্রগুপ্ত : মহামন্ত্রী! এ তোমার অহংকার মাত্র।

চাণক্য : এ তোমারই নেহাত নির্বুদ্ধিতা, সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : (**ক্ষুব্ধভাবে**) মহামন্ত্রী! কুসুমপুর বিজয়ে তোমার হাত ছিল, আর সেইজন্যেই কি এই সামান্য বিজয় অহংকারের স্ফুলিঙ্গ তোমার সর্বঅঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে? এ কি তোমার সেই চিতার আগুনের জ্বালা, যাতে তোমার সমস্ত রাজনীতি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতে পারে।

চাণক্য : তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না, সম্রাট! অহংকারে আমার স্বভাবজাত অধিকার। তা রাজার শাসনের অধীন নয়। কিন্তু আমি এটুকু পরিষ্কার করে দিতে চাই যে স্বর্গের রাজ্য প্রাপ্ত হলেও চাণক্যের অহংকার স্ফুলিঙ্গ জ্বালাময়ী হয়ে ওঠে না। কিন্তু হ্যাঁ, সামান্য অপমানেই সেই অহংকারের স্ফুলিঙ্গ দাবাগ্নি হয়ে তোমার ঐশ্বর্যের নন্দন কাননকে মুহূর্তমধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। তুমি নন্দবংশ ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি দেখতে চাও।

চন্দ্রগুপ্ত : আর্য চাণক্য! চন্দ্রগুপ্ত সৈনিক, সে বিলাসী নন্দ-রাজ নয় যে রাজনীতির সামান্য চালের আঘাতেই তার চোখের সামনের খাদে সে ঢলে পড়বে। জেনে রেখো, মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত হিমাদ্রির মত দৃঢ়, তাকে চাণক্যের কুটিল রাজনীতির আঁধি ঝড়ের ধাক্কা এক বিন্দুও টলাতে পারবে না।

চাণক্য : মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত! ক্ষত্রধর্ম এতই হীন হয়ে পড়েছে যে সে ব্রাহ্মণত্বের ওপরও পদাঘাত করার সাহস করে? তুমি কি জান না, মৌর্য রাজশক্তি হিমাদ্রির মত দৃঢ় কি করে হল? ওর দৃঢ়তাকে যা ধরে রেখেছে, তা হল এই ব্রাহ্মণের রাজনীতি। তা যদি মুহূর্তের

জন্যও সরে যায় তৎক্ষণাৎ এই হিমাদ্রি এমন সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হবে যে সে তার আশেপাশের গাছপালা সমেত সবশুদ্ধ সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে আর তখন সেই সমুদ্র এই ব্রাহ্মণের চরণে আছড়ে পড়বে কিন্তু ব্রাহ্মণ সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করবে না।

চন্দ্রগুপ্ত : আর্য চাণক্য ! তুমি কি বলতে চাও যে পৃথিবীতে এ যাবৎ যত শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবই চাণক্যের রাজনীতির ফল ? নাকি যেখানে মহামন্ত্রী নেই সেখানে কোনো রাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় ? নাকি সমস্ত রাজ্য শুধু মহামন্ত্রী চাণক্যের কাছে শক্তি ভিক্ষা করেই টিকে আছে। নাকি চন্দ্রগুপ্ত নিজে এতই হীনবল যে সে চাণক্যের শক্তির ওপর ভরসা না করে রাজ্য জয় করতে পারে না ? তবে ধিক সেই শক্তিকে ! অমন শক্তির আমার প্রয়োজন নেই। মহামন্ত্রী চাণক্য, তোমাকে আজ মহামন্ত্রীর পদ থেকে অব্যাহতি দিলাম।

চাণক্য : মৌর্য ! এই নাও তোমার তরবারি ! (**ঘৃণাভরে নিক্ষেপ**) এই কলঙ্ক এখনই দূর করছি। তবে মনে রেখো চন্দ্রগুপ্ত, তুমি রাজমন্ত্রী রাক্ষসের ফাঁদে পা দিতে চলেছ ! আবার কি শিখা উন্মোচন করে তোমার ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমায় ? যে ব্রাহ্মণের সর্পসম শিক্ষা নন্দবংশকে এক দংশনে শেষ করেছে, মৌর্য সম্রাটও কি সাপকে ঘাঁটাতে চায় ? যে চন্দ্রগুপ্তকে আপন আত্মীয় জেনে কুসুম-পুরের সিংহাসনে বসিয়েছি সেই চন্দ্রগুপ্তকে বিনাশ করে আবার কি সব শ্মশান করে তুলব ? হায় রে ব্রাহ্মণ ! ব্রহ্মজ্ঞানী আজ রাষ্ট্রের কুটিল আবর্তে পড়ে লাঞ্ছিত হচ্ছে ? আজ আমাকেই নিজের সৃষ্টিসাগরের বিষপান করতে হচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত ! তুমি জান না, কালকূট বিষ-পান করেও জীবিত থাকবার মত নীলকণ্ঠের ক্ষমতা আমার আছে।

চন্দ্রগুপ্ত : হ্যাঁ হ্যাঁ জানি। (**তরবারি ওঠাতে ওঠাতে**) আজ থেকে এই তরবারি আমার নিজ অধিকারে। আজ থেকে সমস্ত রাজনীতি আমি নিজ বাহুবলে কেন্দ্রীভূত করে কুসুমপুর শাসন করব আর বিদ্রোহ-সর্প বিনাশের মহাযজ্ঞ আমি নিজেই করব।

চাণক্য : হ্যাঁ তাই করো, এখনই করো এবং সেই যজ্ঞানলে নিজেও বিনষ্ট হও। আজই কৌমুদী মহোৎসব করো এবং নতুন সমাহর্তা ও রাজনর্তকীর রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজের মৃত্যুকে নিজেই আমন্ত্রণ জানাও।

চন্দ্রগুপ্ত : আমার আনন্দোৎসব দেখে তোমার হিংসা হচ্ছে ! তা তো হবেই। এই ঐশ্বর্য দেখে ব্রাহ্মণের হিংসা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

চাণক্য : হে ক্ষত্রিয়, আত্মজিজ্ঞাসাই হল আসল সম্পদ ! আর তা এই চটকদার কাজকর্মে এতটুকুও নেই— এ সবকিছু শুধুমাত্র মৃত্যুরই সহচর ! শত্রুর গুপ্তচর আর বিষকন্যার ওপর বিশ্বাস করে যে সম্রাট, সে আগুনে লাফিয়ে পড়ে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া পতঙ্গের মত প্রথম পদক্ষেপেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে বসে। তুমিও ভস্ম হও আর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া ঐশ্বর্যের কালো ধোঁয়া তোমার পেছনে ছেড়ে যেও।

চন্দ্রগুপ্ত : নিজের কূটনীতিতে তোমার নিজেরই আস্থা নেই, চাণক্য ! প্রত্যেকটি লোকই তোমার চোখে গুপ্তচর আর প্রত্যেক নারীই বিষকন্যা ! তুমি শুধু নিরীহ জীবকেই হিংসা করতে পার। মহামন্ত্রীর বিশিষ্টতা এই নাকি !

চাণক্য : মহামন্ত্রী শব্দ উচ্চারণ কোরো না, মৌর্য ! আমি আর তোমার মহামন্ত্রী নই। আমিও তোমাকে সম্রাট বলেও সম্বোধন করছি না। আমি একজন ব্রাহ্মণ মাত্র। সেই ব্রাহ্মণ যার শিখা বহুদিন ধরে মুক্ত থাকার পর যখন প্রতিজ্ঞামত নন্দবংশ ধ্বংস করতে পেরেছে তখনই শুধুমাত্র পুনরায় শিখা বেঁধেছে। এখন তার সামনে মাত্র দুটো রাস্তা খোলা। হয় সে পুনর্বার নিজ শিখা মুক্ত করে মৌর্য-বংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করবে আর না-হয়, বৃক্ষসম আপন বাহুদ্বয় সম্প্রসারিত করে নক্ষত্রের দৃষ্টিপাতে শান্তি ও করুণা ভরে সর্বংসহা পৃথিবীর ধ্যানে মগ্ন হবে। তখন সমগ্র বিশ্বচরাচরই হবে তার রাজ্য, পশুপক্ষী হবে তার সহচর আর মত্ত বায়ু হিন্দোল তার মুখনিঃসৃত

বেদমন্ত্রকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে— এবং সে তোমায় ক্ষমা করবে।

চন্দ্রগুপ্ত : আর্য, এটা তপোবন নয়। আর চন্দ্রগুপ্ত ক্ষমার পাত্র নয় বা সে ক্ষমা চাইছেও না। এখন তপোবনের হোমকুণ্ডে গিয়ে হিংসার সাধনা করো কিংবা তৃণজীবী নিরীহ হরিণদের ক্ষমা করো। কিন্তু যাবার আগে আমার নতুন সমাহর্তা বসুগুপ্ত এবং রাজনর্তকী অলকার ওপর যে অপবাদ দিয়েছ তা থেকে তাদের তোমাকে মুক্ত করে যেতে হবে! আর জেনে রাখো, যদি এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে রাষ্ট্রের আইন তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না। এই আমার শেষ আদেশ।

চাণক্য : আদেশ তোমার নতুন মহামন্ত্রীকে দিও। আমি তোমার সামনে সত্য উদ্ঘাটন করতে বাধ্য নই, জেনো।

চন্দ্রগুপ্ত : যে ব্রাহ্মণ সত্য উদ্ঘাটনকে নিজের ধর্ম বলে মানে না, তাকে কি বলে সম্বোধন করব?

চাণক্য : আমি নিজ ইচ্ছায় সত্যকে উদ্ঘাটন করতে প্রস্তুত। কিন্তু জেনে রাখো, সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর এক মুহূর্তও আমি এখানে কালহরণ করব না। এখানকার পরিবেশ ভয়ংকর হয়ে উঠে আমার প্রতি রোমকূপে যেন প্রতিহিংসার জ্বালা উৎপন্ন করছে।

চন্দ্রগুপ্ত : আগে তুমি প্রমাণ উপস্থিত করো।

চাণক্য : (**জোরে**) সৈনিক! (**সৈনিকের প্রবেশ**)

সৈনিক : মহারাজ!

চাণক্য : সমাহর্তা বসুগুপ্ত এবং রাজনর্তকী অলকাকে হাজির করো!

সৈনিক : যে আজ্ঞে। (**প্রস্থান**)

চাণক্য : চন্দ্রগুপ্ত, প্রজাদের সংস্কার এত দ্রুত দূর হয় না চন্দ্রগুপ্ত! এখনও মহারাজ নন্দের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকজন রাজের মধ্যে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজমন্ত্রী রাক্ষস কুসুমপুরের বাইরে থেকেও প্রজাদের অবিশ্বাসের বীজের ওপর

নিজ কূটনীতির জল সিঞ্চন করে চলেছে। কুসুমপুরের সর্বত্র ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো আর তুমি কৌমুদী মহোৎসবে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বিষকন্যাকে স্পর্শ করতে চাইছ! চন্দ্রগুপ্ত, আমার এই নিস্পৃহ চোখ মেলে আমি সব দেখতে পাচ্ছি আর তুমি সব দেখেও কৌমুদী মহোৎসবের মোহে মত্ত হয়ে বিষ পান করতে চলেছ! আমি শুধু তোমায় এই কথাটুকুই মনে করিয়ে দিতে চাই...

(সৈনিকের সাথে বসুগুপ্ত ও অলকার প্রবেশ)

চন্দ্রগুপ্ত : সৈনিক! তুমি দুয়ারে গিয়ে নিজের স্থান গ্রহণ করো।

(অভিবাদন করে সৈনিকের প্রস্থান)

(বসুগুপ্তের প্রতি) সমাহর্তা বসুগুপ্ত! তোমাকে সৈনিকের হাতে হেনস্থা করার জন্য আমি দুঃখিত। আমি জানি তুমি সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের বিশ্বাসভাজন নতুন সমাহর্তা।

বসুগুপ্ত : সম্রাট! আমি সমাহর্তা নই, মহামন্ত্রী! যদি সমাহর্তা হতাম তো সম্রাট সমাহর্তার অপমান এমনভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন না।

অলকা : **(করুণ স্বরে)** নারীর অপমানও কুসুমপুরের রাজকক্ষে এই প্রথম। আমি লাঞ্ছিতা, সম্রাট!

চন্দ্রগুপ্ত : **(দৃঢ়ভাবে)** নিঃসন্দেহে! আমি তোমাদের অপমানের প্রতিকার করবই।

চাণক্য : **(বসুগুপ্তের প্রতি)** সমাহর্তা, তুমি এখন সম্রাটের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছ! আর **(রাজনর্তকীর প্রতি)** রাজনর্তকী, তুমিও সম্রাটের অভয় হস্তের ছায়ার আড়ালে। **(বসু-গুপ্তের প্রতি)** আচ্ছা সমাহর্তা, রাজনর্তকীর সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

বসুগুপ্ত : আমি তো রাজনর্তকীর নাম পর্যন্ত জানতাম না। কৌমুদী মহোৎসবের ঘোষণার মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমি ওর পরিচয় পেয়েছি।

চাণক্য : সমাহর্তা, তুমি কুসুমপুরের বাসিন্দা, তাই না !

বসুগুপ্ত : আমার বাস কুসুমপুরের অমরাবতী গ্রামে। আমি ওখানকার অন্তঃপাল ছিলাম।

চাণক্য : আচ্ছা তুমি কুসুমপুরে কতদিন আছ ?

বসুগুপ্ত : আমি তো আগেই বলেছি, মহামন্ত্রী ! আমি অমরাবতীর বাসিন্দা, কুসুমপুরের নয়।

চাণক্য : সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তোমাকে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, কুসুমপুরে না অমরাবতীতে ? তুমি কুসুমপুরের তা জেনেই তো সম্রাট তোমাকে সমাহর্তার পদ দিয়েছেন, তাই না ?

বসুগুপ্ত : মহামন্ত্রী, আমি কুসুমপুরে থাকি না, কিন্তু অমরাবতী থেকে কুসুমপুরে যাতায়াত অবশ্যই করে থাকি।

চাণক্য : বছরে কতবার কুসুমপুরে আস ?

বসুগুপ্ত : তা বলতে পারি না।

চাণক্য : (**ধমকের সুরে**) যা জিজ্ঞেস করছি, তার ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

বসুগুপ্ত : মহারাজ নন্দের বড় বড় পালাপার্বণে আমি আসতাম।

চাণক্য : ওহে অমরাবতীর অন্তঃপাল, গত বছর বসন্তোৎসবে এসেছিলে তো ?

বসুগুপ্ত : হ্যাঁ মহামন্ত্রী।

চাণক্য : বসন্তোৎসবে রাজনর্তকী অলকার নাচ হয়েছিল। তুমি সেই নাচ দেখেছিলে ?

বসুগুপ্ত : হ্যাঁ মহামন্ত্রী।

চাণক্য : তাহলে তুমি অলকার নাম আগেই জানতে ?

বসুগুপ্ত : হ্যাঁ মহামন্ত্রী।

চাণক্য : কিন্তু তুমি এইমাত্র বললে যে তুমি আগে অলকার নামও শোন নি এবং কৌমুদী মহোৎসবের মাত্র অল্পক্ষণ আগে তুমি রাজনর্তকীর পরিচয় পেয়েছ।

বসুগুপ্ত : মাফ করবেন। কূটনৈতিক কথাবার্তা ফাঁস করা আমার কাজ নয়।

চাণক্য : (**হেসে উঠে**) ওঃ বড় কূটনীতজ্ঞ এসে গেছে রে। আচ্ছা বেশ, কূটনীতির কথাবার্তা ছাড়ো। সত্যি করে বলো তো তুমি রাজমন্ত্রী রাক্ষসের গুপ্তচর কবে থেকে হয়েছ ?

বসুগুপ্ত : মহামন্ত্রী মাফ করবেন। আমি ঐ পাপিষ্ঠ রাক্ষসকে চিনিই না।

চাণক্য : হুঁ্যা, ঠিক যেমন তুমি রাজনর্তকী অলকাকে চিনতে না ?

বসুগুপ্ত : (**চন্দ্রগুপ্তের প্রতি**) সম্রাট ! আমার আত্মসম্মান রক্ষা করুন।

চন্দ্রগুপ্ত : অবশ্যই তা করব। কিন্তু আগে তুমি মহামন্ত্রী চাণক্যের কথার উত্তর দাও।

বসুগুপ্ত : আমি উত্তর দিতে অসমর্থ, সম্রাট ! কৌমুদী মহোৎসব উপলক্ষে আমি একটু বেশী সোমরস পান করে ফেলেছি। সেইজন্যে আমি একটু আবোল-তাবোল বকছি।

চাণক্য : না না, তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি, সমাহর্তা ! আমি তোমাকে আরো সোমরস দেব, যাতে করে কৌমুদী মহোৎসব তোমার পক্ষে আরো মঙ্গলময় হয়ে ওঠে।

বসুগুপ্ত : মহামন্ত্রী, অত্যধিক সোমরস পান করাকে আমি রাজধর্মের প্রতিকূল বলে মনে করি।

চাণক্য : এইমাত্র তুমি বললে যে অত্যধিক সোমরস পানের জন্য তুমি আবোল-তাবোল বকছ। আবার বলছ যে অত্যধিক সোমরস পান করাকে তুমি রাজধর্মের প্রতিকূল বলে মনে করো !

বসুগুপ্ত : আমি, আপনার কাছে কূটনৈতিক রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ, মহামন্ত্রী !

চাণক্য : বার বার শুধু কূটনীতি আর কূটনীতি ! প্রত্যেক কথাতেই কূটনীতি! রাজ্যের সমাহর্তা রাজ্যের মহামন্ত্রীর সঙ্গে কূটনৈতিক

কথাবার্তা বলতে চায় না। আবার সোমরস পান করার মধ্যেও তুমি কূটনীতিকে টেনে আনছ। বেশ, তোমার যখন এতই অনিচ্ছা তাহলে তোমার সঙ্গে আর আমি কূটনৈতিক রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব না। কবিতার কথা বলব। কবিতার কথা বলতে পারবে তো? আচ্ছা বলো তো সোমরস বুনোফুলের সুগন্ধের জন্য, কিন্তু তার মাদকতা এত উগ্র কেন?

বসুগুপ্ত : জানি না, মহামন্ত্রী!

চাণক্য : তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। যে সোমরস বুনো ফুলকে এত সুগন্ধি করে তোলে তাতে মাদকতা থাকে এইজন্য যে যেসব সুন্দরীদের চোখে মাদকতা থাকে, তারাই হাতে করে ঐ সোমরস পান করায়। তোমার সোমরস পাত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে তাতে নিজের চোখের সোমরস ঢেলে দেয় আর ঐ সোমরসকে আরো মাদক করে তোলে।

বসুগুপ্ত : আপনি তো কূটনীতি ও কবিতা উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী মহামন্ত্রী!

চাণক্য : আরে দূর! এই শুকনো কাঠের মধ্যে কবিতা কোথায়! কিন্তু তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই শুধু আমি তোমায় কূটনীতির রহস্যের বদলে কবিতা দিতে চাইছি। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? বলো তো মাদকতা জিনিসটা বেশী কোথায়, সুন্দরীদের চোখে না ঠোঁটে?

বসুগুপ্ত : এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন, মহামন্ত্রী!

চাণক্য : কূটনীতির রহস্যের চেয়েও কঠিন, সমাহর্তা! কূট-নীতিতে তো তুমি বেশী পটু। অমরাবতীর অন্তঃপাল তথা মহারাজ নন্দের বসন্তোৎসবে যোগদানকারী বসুগুপ্তের মত লোকের পক্ষে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই কঠিন নয়। আচ্ছা, মহারাজ নন্দের বসন্তোৎসবে 'অঙ্গ ক্রীড়ার' আয়োজন হয়েছিল, তাই না?

বসুগুপ্ত : হ্যাঁ, মহামন্ত্রী!

চাণক্য : এবং তুমি তাতে যোগ দিয়েছিলে— সুতরাং তুমি

অবশ্যই জানো সুন্দরীদের চোখের চেয়ে ঠোঁটেই বেশী মাদকতা। তাই না? (**তীক্ষ্ণ স্বরে**) কি হল, উত্তর দাও?

বসুগুপ্ত : হ্যাঁ মহামন্ত্রী।

চাণক্য : নাঃ, তোমাকে আর একটাও প্রশ্ন করব না। তোমাকে এতগুলো প্রশ্ন করে যে কষ্ট দিয়েছি, তার জন্য তোমায় একটা পুরস্কার দিতে চাই। আর সেই পুরস্কারটা হচ্ছে এই যে তুমি রাজনর্তকী অলকার চুমুক দেওয়া সোমরসের এক ঢোঁক···

অলকা : (**বিহ্বল ভাবে**) আমাকে ক্ষমা করুন, মহামন্ত্রী। আমি সোমরস স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারব না। আজ পর্যন্ত আমি নিজে সোমরস পান করিনি এবং কাউকে করাইও নি। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি মহামন্ত্রী!

চাণক্য : কৌমুদী মহোৎসবে পুরস্কার পাওয়া যায়, দেবী! ভিক্ষা নয়। (**সৈনিককে ডেকে**) সৈনিক! **সৈনিকের প্রবেশ**) এক পাত্র সোমরস আন।

সৈনিক : যে আজ্ঞে। (**প্রস্থান**)

অলকা : (**বিলাপের স্বরে**) মহামন্ত্রী, আমি একেই অভিশপ্ত তার ওপর রাজনর্তকী হয়ে এমনকি নারী পর্যন্ত থাকতে পারলাম না। আমি সংসারের সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা, আমি পাপের কলঙ্ক, আমি নরকের জ্বালা। আমি···আমি···।

চাণক্য : না না দেবী, তুমি মহারাজ নন্দের রাজনর্তকী! অনিন্দ্য সুন্দরী, তুমি কলাময়ী নৃত্যসম্রাজ্ঞী! হ্যাঁ, আমি দুঃখিত যে তোমার জীবন...

(**সৈনিকের সোমরসপাত্র হাতে প্রবেশ**)

কি, সোমরস নিয়ে এসেছ? আরে আমি তো সোমরসের পাত্র নিজেই সঙ্গে করে এনেছিলাম! আচ্ছা নাও, তুমি এটুকু খেয়ে নাও রাজনর্তকী!

অলকা : মহামন্ত্রী! আমায় সোমরস দিও না, আমায় বিষ দাও, ভয়ংকর বিষ দাও, ভয়ংকর বিষ দাও। বিষ পানেই আমি শান্তি পাব!

আমার জিভে সাপের ছোবল চাই, সাপের ছেবাল, মহামন্ত্রী।

চাণক্য : তোমার সর্প-দংশনের দরকার নেই। সে জিনিস অন্য কারো প্রয়োজন। (**সৈনিককে**) সৈনিক! জোর করে রাজনর্তকীকে সোমরস পান করাও। (**সৈনিক বলপূর্বক রাজ-নর্তকীকে সোমরস পান করায়। অনিচ্ছাপূর্বক ঘোঁট ঘোঁট করে সোমরস পানের সময় নিশ্বাসের শব্দ**) ব্যাস্, এবার থাক্! (**সৈনিক রাজনর্তকীর ঠোঁট থেকে সোমরসের পাত্র সরিয়ে নেয়**) এখন এই সোমরস রাজনর্তকীর ঠোঁটের সংস্পর্শে আরও মাদক হয়ে উঠেছে। এখন কৌমুদী মহোৎসবের সমাহর্তা বসুগুপ্তকে পুরস্কার দিতে হবে। সৈনিক! যেটুকু সোমরস পড়ে আছে, সেটুকু সমাহর্তা বসুগুপ্ত পান করবে।

বসুগুপ্ত : সম্রাট! রক্ষা করুন। আমি এই সোমরস খেতে পরাব না...না...না।

চাণক্য : সৈনিক! অবশিষ্ট সোমরসটুকু বসুগুপ্তকে জোর করে খাইয়ে দাও।

(**সৈনিক জোরপূর্বক সোমরস খাওয়ায়। ঘোঁট ঘোঁট শব্দ হয়**)

বসুগুপ্ত : (**ঘোঁট ঘোঁট শব্দ করতে করতে**) ওঃ দারুণ... বিষ... আগুন... জ্বলে গেলাম! সাপের ছোবল··· সাপের ছোবল... মহামন্ত্রী... চাণক্য!... তুমি রাজমন্ত্রী রাক্ষসকে...হারিয়ে দিয়েছ!... কৌমুদী... মহোৎসব আর... হতে পারল না।... অলকা... আমায়... আমায়... ক্ষমা... করো...। কৌমুদী... মহোৎসব... মহোৎসব... মহোৎ...স...ব।

(**প্রাণ ত্যাগ**)

চন্দ্রগুপ্ত : ওঃ বিষকন্যা! রাজনর্তকী বিষকন্যা! চুমুক দেওয়া সোমরস বিষ হয়ে গেল! সমাহর্তা...

চাণক্য : সমাহর্তা আর এ জগতে নেই, চন্দ্রগুপ্ত! আর অলকা...

অলকা : সম্রাট ! ক্ষমা করুন ! মহামন্ত্রী, প্রাণ ভিক্ষা দিন ! আমি নির্দোষ, আমার কোনো দোষ নেই ! সম্রাট ! আপনার পায়ে চুমা দিয়ে... (**পায়ে পড়ার জন্য এগোয়**)

চাণক্য : পিছে হটো ! পিছে হটো চন্দ্রগুপ্ত ! (**চন্দ্রগুপ্ত পিছিয়ে যায়**) এ তোমার পায়ে নিজের দাঁত বসিয়ে দিয়ে তোমাকে খুন করতে চায়। এই এর শেষ চাল। নারীরূপী সর্পিণী বিষকন্যা। রাজমন্ত্রী রাক্ষস বসুগুপ্তকে দিয়ে কৌমুদী মহোৎসবের প্রস্তাব করে অসাবধান চন্দ্রগুপ্তকে খুন করবার চাল চেলেছিল। সৈনিকগণ ! রাজনর্তকীকে বন্দী করো ! শত্রুর ওপর একে প্রয়োগ করা চলবে। (**সৈনিকগণ রাজনর্তকীকে বন্দী করে**) সমাহর্তা বসুগুপ্ত রাজমন্ত্রী রাক্ষসের গুপ্তচর... আর অলকা বিষকন্যা ! আমি স্বেচ্ছায় এই সত্য উদ্ঘাটন করেছি এবং এরপর আমি আর এক এখানে থাকতে পারব না। আমার পথ ছাড়ো ! পথ ছাড়ো ! তপোবন আমার প্রতীক্ষা করছে চন্দ্রগুপ্ত ! তোমার বিশ্বাসের পাত্র বসুগুপ্তের শেষকৃত্য ও কৌমুদী মহোৎসবের আয়োজন একই-ই করো আর নিজের রাজ্য নিজে সামলাও। (**প্রস্থান**)

চন্দ্রগুপ্ত : (**বিহ্বলভাবে**) আর্য চাণক্য ! মহামন্ত্রী চাণক্য ! তোমাকে চন্দ্রগুপ্তের প্রয়োজন আছে... তুমি না থাকলে রাজ্য রসাতলে যাবে... রসাতলে যাবে। মহামন্ত্রী চাণক্য ! কৌমুদী মহোৎসব হবে না ! কৌমুদী মহোৎসব হবে না ! (**চাণক্যের পিছে পিছে দ্রুতপদে প্রস্থান। চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠস্বর ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসে**) কৌমুদী মহোৎসব হবে না !... কৌমুদী মহোৎসব হবে না... হবে না।

(**পর্দা নেমে আসে**)

শাপ ও বর

—সেঠ গোবিন্দ দাস

প্রথমার্ধ

চরিত্র ঃ

স্বামী ও স্ত্রী

(স্থান আঁতুড় ঘর)

সময় ঃ **সন্ধ্যা**

(আঁতুড় ঘর) আধুনিক ধরনের একটা ঘর। ঘরে বেশ কয়েকটা জানলা-দরজা আছে। কিন্তু পিছনের দিকের সবকটা জানলা-দরজাই বন্ধ। ডান ও বাঁদিকের দেওয়ালে শুধু একটা করে জানলা খোলা আছে— ঘরে হাওয়া আসবার জন্যে। দেওয়ালে ক্রীম রঙের ডিসটেম্পার করা এবং তার ওপর গ্রে রঙের একটা লাইন। দেওয়ালে কয়েকটা ছবিও ঝুলছে। ছাত থেকে একটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প ঝুলছে, ল্যাম্পের ওপর সুন্দর একটা শেড। এখন আলো জ্বলছে না। মাটিতে মার্বেলের ফরাস। কিন্তু তার উপর কিছুই বিছানো নেই। পিছনের দেওয়ালের কাছে আধুনিক ধরনের একটা পালঙ্ক, তার ওপর একেবারে দুধের মত সাদা বিছানা। পালঙ্কের কাছেই সাদা রঙের একটা লোহার দোলনা, তার ওপর জালের মশারী— সেইজন্যে মশারীর মধ্যে কি আছে তা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। পালঙ্কের কাছে একটা এবং তা আরেকটা টেবিল যার ওপর ওষুধের কয়েকটা শিশি, থার্মোমিটার ইত্যাদি রাখা। একটা সুন্দর টাইম-পীস ঘড়িও আছে। পালঙ্কের কাছে দুটো কুশন-লাগানো চেয়ার— সেগুলোর ওপর মখমলের বালিশ। চেয়ারের কাছে সিল্কের টেবিল ক্লথে ঢাকা ছোট একটা টেবিল। টেবিলের ওপর ফুলেভরা একটা ফুলদানি। ডানদিকের দেওয়ালের কাছে কাঠের আলনা— যার ওপর কিছু কাপড়চোপড় রাখা আছে। পালঙ্কের ওপর এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন। মহিলাটি সোজা হয়ে শুয়ে, গলা অবধি সারা শরীর একটা বাদামী রঙের দামী কম্বলে ঢাকা। হাত-দুটো কম্বলের বাইরে। মুখ আর হাত-দুটো ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মহিলার বয়স প্রায় বছর তিরিশেক। গায়ের রঙ ফরসা। সুশ্রী। পালঙ্কের কাছে

ছুটো চেয়ারের মধ্যে একটতে একজন লোক বসে আছেন। তাঁর বয়েস প্রায় 32/33। গায়ের রঙ ফরসা। মোটামুটিভাবে সুন্দর বলা চলে। বাটারফ্লাই গোঁফ, সাহেবী পোশাক। মহিলার মুখে চোখে দুঃখ এবং রাগ ও নৈরাশ্যের ছাপ। লোকটির দিকে চেয়ে মহিলা কিছু বলছেন। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, কিন্তু তবুও তাতে বেশ দৃঢ়তা আছে। ক্ষীণতা দৃঢ়তা মিলিয়ে বেশ গম্ভীর একটা পরিবেশ। পুরুষটি চুপচাপ শান্তভাবে বসে চারিদিকে এমন অন্যমনস্কভাবে তাকাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে যে উনি কিছুই দেখছেন না। পুরুষের চোখেমুখে একটা শূন্যতার ছাপ। চোখের তারা এদিক-ওদিক করছে এবং ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছেন, যেন বোতলে ছিপি লাগানো।)

স্ত্রী : হ্যাঁ, আজ শুনতেই হবে, যাবার আগে প্রাণ ভরে অন্ততঃ বলে তো নিই। বোধ হয়, এজন্যেই ভগবান এখনও প্রাণটা নেননি। (**একটু থেমে**) বারোটা বছর ধরে শোনাতে পারিনি, আজ শুনতেই হবে। এখন কোন গোলমাল নয়, চুপচাপ শুনতে হবে।...বারো বছরের তপস্যার, হ্যাঁ, ঘৃণ্য তপস্যার পর দৈবাৎ এমন সুযোগ পাওয়া আর এমনকি! (**লোকটি সামনের দেওয়ালের দিকে তাকায়। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।**)

স্ত্রী : ওঃ এতেও কষ্ট হচ্ছে? দীর্ঘশ্বাস মুখ থেকেই বেরুচ্ছে তো? নাকি কষ্ট হচ্ছে! বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে! কিন্তু আজ তোমাকে শুনতে হবেই।

(**আরো মনোযোগ দিয়ে পুরুষ অর্থাৎ স্বামীটি স্ত্রীর দিকে তাকায়। ওর ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়**)

স্ত্রী : এত রুক্ষ... এত নির্জীব... এত ক্ষণভঙ্গুর হাসি! সুখের নেশায় সারা জীবন ধরে হাসির আশায়, আর ঐ হাসিতে আমার সর্বস্ব উৎসর্গ করার আশায় আমি তোমার ঘরে এসেছিলুম। (**একটু থেমে**) বিয়ের আগে না-জানি বাবা-মা,

বান্ধবীরা, পাড়াপড়শীরা কে কতই-না কিছু ভেবেছিল। বাবা ভেবেছিলেন। বুঝি-বা তাঁর জীবনই সার্থক হয়ে গেল। আমি বড় ঘরে যাচ্ছি, এই ভেবে ভেবে মায়ের চোখ বার বার ছলছল করে উঠছিল। বান্ধবীদের কেউ বা খুশী কেউ বা ঈর্ষায় জ্বলছিল। পাড়াপড়শীরা ভেবেছিল পৃথিবীতে এমন কোন সুখ নেই যা আমি পাব না। বৌদি তো সপ্ত সুখের কল্পনা করে আমার সুখের সংসার কেমন হবে তা বলতেই পঞ্চমুখ। (**একটু থেমে**) আমিও ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি আমি একটা বড় ঘরের বউ। এদেশে কোটিপতির চেয়ে আর বেশী ধনী কে? আর আমি কোটিপতির ঘরে যাচ্ছি। শুনেছিলাম তুমি যেমন সুন্দর তেমনিই শিক্ষিত। তাই জীবনে আর এর চেয়ে বেশী সুখ কি থাকতে পারে? (**একটু থেমে**) আমার বাপের বাড়ীর অবস্থা তোমাদের মত না হলেও একেবারে যেমন-তেমন নয়। তাঁরা আমাকে বেশ ভালোভাবেই পড়াশুনা করিয়েছেন। মাঝে মাঝে পাহাড়ের দেশে বা বড় বড় শহরে বেড়াতেও নিয়ে গেছেন। কালিদাস আর ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়তে আমার ভালো লাগত। কখনও-বা ভবভূতি এবং শেলীর প্রেমের কবিতা। কখনও বা সুরদাসের প্রেমযমুনায় আবার কখনও বা তুলসীদাসের কর্তব্য-গঙ্গায় ডুবে যেতাম। রবীন্দ্রনাথকে আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না। কিন্তু মাইকেলের কবিতার হিন্দী অনুবাদ তো প্রায় আমার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছল। গালিবের লেখার অনুবাদও পড়েছি। পন্ত, মহাদেবী পড়েছি। জীবন সম্বন্ধে কত কী-ই-না ভাবতাম। নিজে নিজে কল্পনার জগৎ বানিয়ে রেখেছিলাম। আমরা দু'জনে কিরকম ভাবে থাকব, কোন্ কোন্ ঋতুতে আমাদের আহার-বিহার কেমন হবে, সকাল আর সন্ধ্যা কেমন করে কাটাব, চাঁদনী রাতে কিম্বা ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আমরা কি কি করব, তার একটা মোটামুটি প্ল্যানও বানিয়ে ফেলেছিলাম। কখনও পাহাড়ের ওপর কখনও বা সমুদ্রের ধারে কখনও বা বড় বড়

শহরে, কখনও বা উপবনে—এসবকে ঘিরে আমার কল্পনা মুক্তিময় হয়ে পৃথিবীতে শুধু তোমার আমি আর আমার তুমি। **(একটু থেমে)** কত-কি না ভেবেছিলাম, কিন্তু হায়! এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ফুলের বাগানে তুষারপাত শুরু হল। ঝড় এতই ভয়ংকর হয়ে উঠল যে ঝড় কেটে গিয়ে বসন্ত আমি আদৌ দেখতে পেলাম না। **(আবার একটু থেমে)** কারণ? কারণ শুধু এক...তুমি...আমি যা চেয়েছিলাম তুমি সেরকম ছিলে না।

(স্বামী একটু ভীতচকিত নেত্রে সামনের দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে দেখতে থাকে। মনে হচ্ছে যেন নির্জীব ছবিটা তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছে)।

স্ত্রী : দেখো, এদিকে চেয়ে দেখো। এই তো সবে শুরু করেছি। এখনও অনেক অনেক কথা বাকি। সে এক যুগের ইতিহাস, তাই না? এসব দিয়ে তো একটা পুরাণ লেখা হয়ে হয়ে যায়। বুঝলে, একটা পুরাণ। **(স্বামী মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে দেখতে থাকে।)**

স্ত্রী : তোমার ভালোবাসা...শুধু তোমার একটু ভালোবাসা পেলেই আমার কল্পনার পৃথিবীটা বাস্তবে রূপ নিত। এই মনোরম পর্বত, ঐ চিরচঞ্চল সমুদ্র, সুন্দর বাগান, প্রাণচঞ্চল শহর, একটার পর একটা ঋতু পরিবর্তন, ঐ সুন্দর চাঁদনী রাত এসব দিয়েই তো তোমার-আমার মধ্যে প্রেমের সূত্রপাত ঘটত, এসব থেকেই আমাদের প্রণয়-সলিলে এক-একটা ছোট্ট বুদবুদ উঠত। সেই প্রেম-সলিলে নাওয়া বা ডুবে যাওয়া তো অনেক দূরের কথা, একবারের জন্যও প্রেম-সলিলের একটা সিঞ্চন পর্যন্ত আমি পাইনি। পেয়েছি উপেক্ষা আর উপেক্ষা। অবহেলার পর অবহেলা।

(স্বামী উঠে পড়বার উপক্রম করে)

স্ত্রী : না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। **(প্রার্থনার সুরে)** আমার সব কথা না শুনে আজও তুমি চলে যাবে?

(স্বামী বসে পড়ে। কিন্তু বসতে বসতে এমনভাবে হাত আর মাথা নাড়ায় যেন তাকে চারদিকে মশামাছি তাড়িয়ে বসতে হচ্ছে।)

স্ত্রী : তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে সুখৈশ্বর্যে ভরা বাড়ীও আমার কাছে শ্মশানের মত মনে হয়। ধনদৌলত, সোনা-রুপো, মণিমাণিক্য জ্যোতিহীন। বাড়ীর মেঝেয় বসানো দামী পাথর ইত্যাদি সব-কিছু নগ্ন পায়ে ফোটে যেন পাথরের কুচি। সারা বাড়ী থেকে একটা আগুনের হল্‌কা উঠছে। আর সেই আগুনে যেন আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি।

(স্বামী দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

স্ত্রী : হ্যাঁ, মিনিটে মিনিটে শুধু শ্বাস নাও আর শ্বাস ছাড়ো। এতদিনে বোধ হয় বুঝেছ! **(একটু থেমে)** হ্যাঁ, আমার না-হয় সংসার বলতে সব থেকেও কিছুই ছিল না, কিন্তু তোমার তো তাই নয়। আমার সেই শূন্য সংসারে শুধু তুমি একমাত্র তুমিই ছিলে। কিন্তু তোমার জগতে তো সবই ছিল। টাকার বদলে প্রেম পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু টাকা দিয়ে নিজের লালসাকে তো চরিতার্থ করা যায়! সেই লালসা মেটাবার জন্য তোমার বিলাস বিহার, একাধিক নারীসঙ্গ সবই ছিল। **(একটু থেমে)** যখন এসব কথা আমার কানে আসত, তখন...তখন আমার অবস্থা আমার জ্বালা...আমার বহ্নিদাহ তোমার এই দীর্ঘ-শ্বাসকে পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে ফেলত মূর্খ! **(একটু থেমে)** শ্বশুর-শাশুড়ি কখনও কখনও পাহাড়ে পর্বতে বেড়াতে নিয়ে গেছেন ঠিকই কিন্তু তুমি ছাড়া পাহাড়ের সেই সুন্দর বরফ সূর্যকিরণে ঝিকমিক না করে উঠে যেন জ্বালামুখী হয়ে উঠত। কখনও কখনও ওঁদের সঙ্গে সমুদ্রেও বেড়াতে গেছি। কিন্তু মনে হয়েছে তুমি কাছে না থাকায় সমস্ত সমুদ্র যেন জলচর শ্বাপদে ভর্তি এক ভয়ংকর জলাধার। কখনও কখনও বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী ইত্যাদি শহরেও ওঁরা নিয়ে গেছেন। কিন্তু

সেখানেও নাটক, থিয়েটার, সার্কাস সিনেমা ইত্যাদি সব-কিছুই যেন মরা মানুষের খেলার মত মনে হয়েছে। তুমি ছিলে আমার জীবন, আর সেই তুমিই যখন আমার নয় তখন আর এসব দিয়ে কি হবে? প্রাণ না থাকলে শরীর মানে মড়া ছাড়া আর কি! **(একটু থেমে)** তোমাকে খুশী করতে না পেরে আমি শুধু নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিয়েছি। এজন্মে তো কোনো পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না— হয়তো এসব কিছু পূর্বজন্মের কর্মফল। কিন্তু ভাগ্য আর পূর্বজন্ম এসব অজুহাত তো শুধু হতভাগ্যকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। যখনই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, সন্দেহ জেগেছে, তখনই তোমার ওপর রাগ হয়েছে। সব একে একে মনে পড়ছে। হায় রে, আমিও তোমার মত ফুর্তিবাজ কেন হলাম না ...আমি...আমিও তো...**(স্বামীর চোখেমুখে ক্রোধের অভিব্যক্তি। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে)**

স্ত্রী ঃ (চাপা বিদ্রূপের হাসি হেসে) কি, রাগ হচ্ছে? শুধু শুনেই রাগ, তা তো হবেই! স্ত্রীও তো বিষয়সম্পত্তির মত কেনা জিনিস...তাই না? তার প্রাণ থাকা সত্ত্বেও তোমরা পুরুষরা তাকে নির্জীব বলেই গণ্য করো। তার হৃদয়ে কামনার সঞ্চার হওয়াটা হ'ল পাপ, তার যদি রাগ হয় তাহলে সে হয় ক্ষমারও অযোগ্যা; কিন্তু কেন...কেন এই অবহেলা, কেন এই অবিচার? আমি তো ঠিক তোমারই থাকতে চেয়েছিলাম— তোমারই বউ হয়ে। কিন্তু তোমার কাছে নিরাশ হয়ে...আর তোমার হালচাল দেখে আর কি সে স্বপ্ন থাকে?...এসব কথা ভাবতেই তো আমার রাগ হয়, তাহলে একবারও কি ভেবে দেখেছ তোমার ক্রিয়াকলাপের ওপর আমার আরও কত রাগ হত?...

(স্বামী দাঁড়িয়ে পড়ে।)

স্ত্রী ঃ (হাত নেড়ে বসতে ইশারা করে) বসো, বসো, ঘাবড়িয়ো না। আমার কথা শেষ হয়নি।

(স্বামী পুনরায় বসে পড়ে চেয়ারের হাতলের ওপর হাত রাখে।)

স্ত্রী : দেখো বাপু, অমন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মত মুখ গোমড়া করে বোসো না। তুমি যেমন চেয়েছ আমি তেমনটিই হয়েছি। হিন্দু ...গোঁড়া হিন্দুর সংস্কার। রামায়ণের কাহিনী পুরাণ-কথা— সে সবের ওপর বিশ্বাস এনেছি। সবমিলে আপন মন, বুদ্ধিকে শেকলে জাপটে ধরেছিল, তার ওপর এই হতভাগ্য সমাজে অপুত্রক বলে বদনাম। পুরুষ...সে যত খারাপ হোক, সে ভালোমন্দ যাই করুক তবুও সে পুরুষ আর স্ত্রী সে যত ভালোই হোক সে মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। আত্মীয়স্বজন আমার সুখের ঘরে ঝড় তুলেছে আর বাড়ীর সম্মান...সম্মানের পিশাচ! না, তা আমি পারি নি...আমি পারি নি তোমার মত হতে। **(একটু থেমে)** যত দিন গেছে, ততই আমার দুঃখ বেড়েছে। আর সেই-যে একের পর এক যাগযজ্ঞ ছেলেপুলে হচ্ছে না দেখে অমন সদাশিব শ্বশুর-শাশুড়িরও যখন মেজাজ বিগড়ে গেল তখন মনে হতে লাগল এই জীবনটা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। সন্তান না হওয়াটা যেন শুধু আমারই দোষ, তোমার এতে এতটুকু দোষও নেই। শাশুড়ি দিনের পর দিন গাল দিয়েছেন— বাঁজা, খড়ম-পা কোথাকার, পাথর! কিছুদিন পর শ্বশুরমশাইও বলতে শুরু করলেন—এর মায়ের যখন এই একটাই মেয়ে, কোনো ছেলে নেই, তখন ঐ বাঁজার থেকে আমার বংশ আর বাড়বে কি করে? এ আবার দেখছি মায়ের চেয়ে আরো এক কদম এগিয়ে আছে। শুধু আমাকেই নয়, আমার মা-বাপও বাদ যায়নি। **(আবার একটু থেমে)** জান...জানতে চেষ্টা করেছ কোনো দিন আমার মনের অবস্থাটা এসব শুনে কি হতে পারে? **(স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে যেন কিছু বলতে চায়। স্ত্রী চুপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন কিছু বলব বলব করেও বলে না তখন স্ত্রীর মুখ খোলে)।**

স্ত্রী : মুখে রা নেই কেন ? কি করে থাকবে ? আমি শুধু দিনের পর দিন ভেবেছি, ছেলে হচ্ছে না তার জন্যে দোষটা আমার না তোমার ? না হলে তো আমি খুব শিগরিরই এ দোষ ঘুচিয়ে ফেলতে পারি। মহাভারতে বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদের অক্ষমতা ওঁদের মৃত্যুর পর বেদব্যাস পূর্ণ করেছিলেন। পাণ্ডু আর ধৃতরাষ্ট্র নিয়োগ প্রথাতেই জন্মেছিলেন। ঐসব রাণীদের বা ব্যাসমুনিকে কেউ পাপী বলে অপবাদ দেয় নি। তা হলে কি তোমার জীবিত অবস্থায়ই আমি কোনো আধুনিক মহর্ষিকে দিয়ে আমার বাঁজা বদনাম দূর করে দেব আর তোমার বংশ বৃদ্ধি করব !

(পুরুষ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে এমনভাবে পায়চারি করতে শুরু করে যেন নিজেকেই তার কেমন অদ্ভুত লাগছে !)

স্ত্রী : বোসো, বোসো, কাছে এসে বোসো। কিন্তু না, তা আমি করতে পারি নি। সেই সময় নিজের মা-বাপের পীড়াপীড়িতে তোমার মনে দয়ার সঞ্চার হয়েছে। হয়তো বিষয়সম্পত্তির উত্তরা-ধিকারী রেখে যাওয়ার ইচ্ছাই তোমার সন্তান-কামনার কারণ। তা না হলে কি আর তুমি আমার কাছে আসতে ? বলছি, বোসো, সব বলছি।

(পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিল, এখন বসবার উপক্রম করে। তার আগে চেয়ারের ওপর চেপ্‌টে যাওয়া বালিশটাকে ঠিক করতে থাকে।)

স্ত্রী : যার সঙ্গ না পেলে একসময় সারা সংসারই আমার কাছে শূন্য মনে হ'ত— আর আজ তুমি এত কাছে, তবু আমার বিন্দুমাত্র আনন্দ হচ্ছে না। এই চেপ্‌টে যাওয়া বালিশটাকে তুমি ঠিক করতে পারো, কিন্তু আমার চেপ্‌টে যাওয়া হৃদয়কে নয় ; তার কারণ কি জান ?

(পুরুষ আবার কিছু বলতে উদ্যত হয়—স্ত্রী চুপ

হয়ে যায়। কিন্তু পুরুষের ঠোঁটটা যখন একটু কেঁপেই আবার থেমে যায়, কোনো শব্দ বেরোয় না, তখন স্ত্রী আবার বলতে শুরু করে।)

স্ত্রী : কি, বলতে পারছ না। ঠিক আছে, তবে শোনো, আমিই বলে দিচ্ছি। তুমি আমার কাছে আসতে শুরু করায় আমার একটুও আনন্দ হয়নি। তার কারণ হল তুমি কিজন্য আমার সঙ্গ নিয়েছ তা আমি জানি। তোমার মা-বাপ-এর সঙ্গে তোমার যেসব কথাবার্তা হয়েছে সে সবও আমার কানে এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার কাছে এসেছ শুধু প্রেমের অভিনয় করে আমার হাড়পাঁজরা আমার রক্ত মাংস থেকে কোনো রকমে একটা পুতুল তৈরি করবার উদ্দেশ্যেই। কারণ তোমার বংশের নাম রাখবার জন্য, তোমার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য তোমার এ পুতুলকে দরকার। তাই …তাই আমার হৃদয়ে যেটুকু স্নেহ, যেটুকু অনুরাগ তখনও অবধি ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। তাই যখন তুমি এলে তখন ইতিমধ্যেই আমার মন বিরক্তি…দারুণ অভক্তিতে ভরে গেছে।

(**স্বামী আশ্চর্য হয়ে দরজার দিকে মুখ তুলেই আবার স্ত্রীর দিকে তাকায়**)।

স্ত্রী : (**হেসে**) কি, আশ্চর্য হচ্ছ? তা তো হবেই। তুমি পুরুষ…পুরুষ তাই না? আমাকে মরুভূমি করে দিয়ে তাতে প্রলয় বৃষ্টি ছাড়াই তুমি ফসল ফলাতে চেয়েছ! তোমার ন্যাকামি আমাকে হয়তো একটা যন্ত্র বানাতে পারত কিন্তু যন্ত্রী বানাতে পারত না। যখন এই যন্ত্র অচল হয়ে পড়ল মেশিন জ্যাম হয়ে গেল, তখন নতুন মেশিন আনার কথা উঠল। তোমার দ্বিতীয় বিয়ে! এইরকম অধঃপতিত, অধম রাক্ষসের হাতে আরো একটা প্রাণ আরো একটা হৃদয়কে বলি দেবার বিকট আয়োজন। ধনীর এই সন্তান-লালসা আর তার জন্য আর-একটা হৃদয়বিদারক এই নরবলি! সংসারে অনেক হৃদয়বান

চরিত্রবান যুবক জীবনভোর অবিবাহিত থেকে যায়, কিন্তু ধনীর বউ থাকা সত্ত্বেও আবার তার বিয়ে হয়। কেন হবে না? বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী উৎপাদনকারী স্ত্রীও তো একটা জীবন্ত সম্পত্তি বটে! টাকা দিয়ে তাকেও তো কেনা যায়, তাই না! হায় রে সমাজ! জগতে টাকাই মানুষের মালিক, মানুষ টাকার মালিক নয়। আমার মত একটা মেয়েমানুষের বলিদান হওয়ার পরেও এই রাক্ষসী যজ্ঞে আরো একটা অবলা হৃদয়ের বলিদান! আর তা করবার এই রাক্ষসী ইচ্ছার ফলেই বোধ হয় আমি ঐ সময়ে গর্ভবতী হলাম।

(**স্বামীটি এবার একটু আরাম করে ঠিকঠাক হয়ে চেয়ারে বসে**)

স্ত্রী: খুশী তো, হ্যাঁ, তা হবে না কেন? হয়তো ভাবছ এতে আমিও খুশী হয়েছি। কিন্তু না, শোনো তা হলে। আগে রাতারাতি কি করে আমি আদরিণী হয়ে গেলাম সে কথা শোনো। তারপর আমার ভাবনাচিন্তার কথা শুনবে। (**একটু থেমে**) বাঁজা রাতারাতি হয়ে গেল সুন্দর প্রসবিনী। পাথর হয়ে গেল ফুলের চেয়েও নরম। খড়ম পা হয়ে গেল লক্ষ্মীর চরণ। শ্বশুর-শাশুড়ির মনে আমার প্রতি আদরের এমন জোয়ার এল যে মনে হল, এতে কোনোদিনই যেন ভাঁটা পড়েনি। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেণ্ডে যেন এই জোয়ার উত্তরোত্তর বেড়েই চলতে লাগল। রোজ রোজ ডাক্তার আর লেডী ডাক্তার আমাকে দেখতে আসা শুরু করল। আমার শারীরিক বল যাতে ঠিক থাকে সেজন্য দুনিয়ার হেন জিনিস নেই যা এনে জড়ো করা হল না। ইউরোপ-আমেরিকার কত হাজার রকমের ওষুধ-পত্রের অর্ডার পাঠানো হল। কেননা, ওসব জিনিস এদেশে পাওয়া যায় না। আর পাওয়া যদি বা যায় তো তা টাটকা হয় না। নিত্যনতুন তেল ঘি-এর তৈরি কত জিনিস, কত খাস্তা নিমকি, কতরকমেরই-না সুস্বাদু খাবার-

দাবার আমার জন্য তৈরি হতে লাগল। সকালে একরকম, দুপুরে একরকম আবার সন্ধ্যায় আর-এক রকম। তোমার শূন্য হৃদয়েও বোধ হয় আমার ওপর অনুরাগের ঝংকার উঠল।

(স্বামী একটু খুশী মনেই স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে। কিছু বলবে বলবে মনে করল, কিন্তু মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরুলো না আর আঙুলগুলো চেয়ারের হাত বরাবর চলতে লাগলো।)

স্ত্রী : (রুক্ষ হাসি হেসে) এসব শুনে বুঝি আনন্দ হচ্ছে আর তাই তোমার আঙুলগুলো অমন নেচে উঠছে— হ্যাঁ, তা নাচবে বৈকি ! একবার হলেও 'তোমার হৃদয়ে আমার জন্যে অনুরাগের উন্মেষ হয়েছে তো বটে—আমার মুখ থেকে এটা শুনে খুশী হবারই তো কথা ! (**একটু থেমে**) সব মেয়েরই ছেলের শখ থাকে, মা হবার ব্যাকুলতা থাকে—এসব আমি শুনেছি এবং পড়েছি। কিন্তু জানো, শ্বশুর-শাশুড়ি আর তোমার এই উৎসাহ দেখে আমার মনের অবস্থা কি হয়েছে ?

(স্বামী গম্ভীর ভাবে স্ত্রীর দিকে তাকায়)

স্ত্রী : তার প্রতিক্রিয়া। এ যাবৎ তুমি এবং তোমার মা-বাপ আমার যতকিছু সুখচিন্তা, সেসবকে একেবারে টুকরো টুকরো করে দিয়েছ। এই ধনদৌলত, বিষয়-আশয় আমার হৃদয়ে যেন বোঝার মত হয়ে ছিল। তোমার আত্মীয়স্বজনের গৌরব, বংশের প্রতিষ্ঠা এসব আমার কাছে বিড়ম্বনা মাত্র মনে হত। আমিই এসবের উত্তরাধিকারী জন্মদাত্রী, এ কথা ভেবে আমার আনন্দ বা উৎসাহ তো হলই না বরং হল কষ্ট হল উন্মাদনা ! রক্ষা নয়, আমি এসবের ধ্বংস চেয়েছিলাম !

(স্বামী কেঁপে ওঠে)

স্ত্রী : কেঁপে উঠছ, কাঁপো, আরো কেঁপে ওঠো, জীবনভোর কাঁপতে থাকো— সমস্ত সংসার তোমার কাঁপুনি দেখুক। (**একটু থেমে**) আমার মত মৃতের পক্ষে জীবিত সন্তান প্রসব করার

সাধ না হবারই কথা! দিনে দিনে আমার পেটে বাচ্চাটা যেমনি বেড়ে উঠতে লাগল ততই আমার মনে হতে লাগল, তোমার মা যে আমাকে 'পাথর' বলেছিলেন, সেই পাথরই বোধ হয় আমার পেটে বেড়ে উঠছে।

(স্বামী আবার দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি শুরু করে। এমনভাবে পায়চারি করতে থাকে যেন মনে হয় সে টলছে)

স্ত্রী : (অত্যন্ত কঠোরভাবে) এসো, বোসো এখানে!

(এতে স্বামী হতচকিত হয়ে পড়ে তৎক্ষণাৎ ঝপাং করে বসে পড়ে।)

স্ত্রী : প্রসবের সময় হয়ে এল। উঃ কি যন্ত্রণা তখন, সে সময় ডাক্তার বলল, আমাকে বাঁচাতে গেলে বাচ্চার মাথা কেটে বার করতে হবে আর বাচ্চাকে বাঁচাতে হলে আমার পেট চিরতে হবে এবং তাতে আমার মৃত্যুও হতে পারে। এতে তোমরা একেবারে লাফিয়ে উঠলে, যেন ফুটবল। দুজনেই বাঁচি সে চেষ্টাই প্রথমে করেছিলেন। ধনলোলুপ কোনো জিনিস একবার হাতে পেলে আর কি তাকে ছাড়তে চায় আর ছাড়তে যদি হয় তাহলে তার চেয়ে বড় কিছু হাতে পেয়ে তবে সে ছাড়ে। শেষে ঠিক হল, আমার পেট চেরা হবে। নরাধম! শয়তান কোথাকার! ছেলের জন্যে এতখানি নারকীয় উৎকণ্ঠা! বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর জন্য এত ঘৃণ্য লালসা! পেট চেরাতে আমি রাজি হইনি। তখন কিছু গুজগুজ ফুসফুস চলল। বাচ্চার মাথা কেটেই বার করা হবে এই বলে আমাকে ধোঁকা দিয়ে অজ্ঞান করানো হল। যখন আমার জ্ঞান এল, তখন বুঝতে পারলাম যে আমার পেট চেরা হয়েছে। ডাক্তার, ডাক্তারও তো একটা পুরুষ, আর ঐ লেডী ডাক্তারও মেয়েছেলে হয়েও একটা বাচ্চার জন্যে, প্রত্যেক দিন যা কত হাজারে হাজারে হচ্ছে আর মরছে, এইরকম একটা বাচ্ছার জন্যে একটা

লেখাপড়া জানা সভ্য শিক্ষিতা সংস্কৃতিসম্পন্না মেয়ের পেট চেরার জন্য নিজেকে বেচে দিল। (**একটু থেমে**) একটা মেয়েমানুষের দেহমন নিয়ে যেমন ছিনিমিনি খেলা সম্ভব, একটা পুরুষ মানুষের শরীর বা প্রাণ নিয়ে তো আর তেমন ছিনিমিনি খেলা চলে না। (**একটু থেমে**) জ্ঞান হয়ে যার কণ্ঠস্বর আমি প্রথম শুনলাম সেটা ছিল তোমার মায়ের। 'মেয়ে হয়েছে'— একেই আমার মন ব্যথায় ভরে ছিল, এটা শুনে আমার আরো ব্যথিত হয়ে উঠল। 'মেয়ে হয়েছে' যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। যেন বজ্রপাত হচ্ছে! সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠছে আর তার ঢেউ এ ঘরের উত্তরাধিকারে যেন প্রলয় ডেকে এনেছে। আমার ওপর হঠাৎ হওয়া আদর এক মুহূর্তেই যেন মাটিতে মিলিয়ে গেল। আমার মায়েরও আমি মেয়ে হয়েই জন্মেছিলাম। আমার ভাগ্যে মেয়ে ছাড়া আর কি হবে? পাথর, কাঁকর, কাঠ কি কয়লা হয়নি, এই বড় আশ্চর্য! মেয়ে এতই ঘৃণ্য পদার্থ এতই খারাপ জিনিস যে তার দিকে চোখ তুলে কেউ একটু তাকালও না। যাই হোক, আমার সেবা-শুশ্রূষা কিন্তু চলতে লাগল। আমি আর তো বাঁজা নই! হয়তো এবার আমি একটা ছেলের জন্ম দেব। আমার নিজের কোনো দাম নেই। আমি যেন ছেলে তৈরীর একটা মেসিন আর আমার আদর সেইজন্যেই। তাই আমার সেবা-শুশ্রূষা। কিন্তু আমার আর নয়...আমি চললাম। অসুখ বাড়ছে।

(**স্বামী ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে**)

স্ত্রী : না, এত তাড়াতাড়ি নয়। আরো কিছু সময় লাগবে। আর যদি এত তাড়াতাড়ি মরি তাহলে ভূত হয়ে তোমাকে এত কাছে পেয়েও একবার নাস্তানাবুদ না করেই ছেড়ে দেব। ভূতই হই আর তোমার ঘাড়েই চাপতে চাই— সে থেকে তুমি কিছুতেই নিস্তার পাবে না।

(**ধমকের সুরে**) বসো!

(স্বামী ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়ে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়)

স্ত্রী : জানো, এখন আমার সব চেয়ে কাকে প্রিয় মনে হচ্ছে? **(একটু থেমে) (দোলনার দিকে আঙুল দেখিয়ে)** ঐ মেয়েটিকে, কেন জানো? **(স্বামী ওর দিকে তাকায় কিন্তু এমনভাবে তাকায় যেন মনে হয় অনেক দূরের কোনো কিছু দেখছে। ওর কথা শুনছে—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কোন্ দূর থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনছে।)**

স্ত্রী : এই বাচ্চাটাকে আমি ভালোবাসি এইজন্যে যে এর প্রতি কারোরই মায়ামমতা নেই। একে কেউই চায় না। আজ আমার হৃদয়ে মাতৃভাবনায় সঞ্চার হচ্ছে। একে আমি আমার বুকের দুধ খাইয়ে, আমার চোখের জলে ভিজিয়ে বলবান ও পবিত্র করে তুলতে চাই। **(একটু থেমে)** কিন্তু...কিন্তু আমি জানি আর বাঁচব না। তোমাকে, তোমার মা-বাবাকে, তোমার ধনদৌলত বিষয়সম্পত্তি, আত্মীয়স্বজন, কাউকে ছেড়ে যেতেই আমার এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না। কিন্তু হ্যাঁ, এই বাচ্চাটার জন্য প্রাণ কাঁদছে। তোমরা সবাই মিলে বহুদিন আগেই আমার হৃদয় আমার আত্মাকে খুন করেছ আর পেট চিরে আজ আমার শরীরটাকে খুন করলে। **(থেমে)** এই যাবার বেলায় ঈশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা করে যাই, হে ভগবান! আমি যেন আর হিন্দুর ঘরে না জন্মাই, আর যদি হিন্দুর ঘরে জন্মাই তো যেন ধনীর ঘরে নয়, ধনীর ঘরে জন্মাই তো ধনীর ঘরে যেন বিয়ে না হয়, আর যদি বা তাও হয় তো যেন লেখা-পড়া করে সুসভ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে বাচ্চা-উৎপাদনের মেশিন না হই। আমার মতই অধিকাংশ লোকের ঘরের বউদের কপালও পোড়া। আর যদি লেখাপড়া করে সুসভ্য সংস্কৃতিসম্পন্ন হই তো যেন ধর্মের, আত্মীয় স্বজনের, লোকাচারের বন্ধন থেকে মুক্ত হই। তোমরা ধনী পুরুষের দল, আমার মত স্ত্রীলোককে খুন করে যেমন

করে তার শবদেহের ওপর তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছ ঠিক এমনি করেই আমি তোমার শরীরকে খণ্ডবিখণ্ড করে সেই রক্তের ওপর নাচব ...প্রলয় নৃত্য? (**হাঁফাতে হাঁফাতে একটু থেমে আবার**) গরীবরা বোধ হয়, এর চেয়ে অনেক সুখে থাকে। মেয়েছেলেকে মজুরের মত ঘরের কাজ অবশ্যই করতে হয়, কিন্তু পুরুষও তেমনি সেখানে এমন যা খুশী তাই করার সুযোগ পায় না। ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা, শ্বশুর-শাশুড়ির সন্দেহ থাকে। তুমি যেমন আমার ওপর অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়ে এসেছ তা বোধ হয় ওদের মধ্যে হয় না। উত্তরাধিকারের চিন্তায় ওদের এত পেয়ে বসে না। আমার মত যদি ওদের কারো দারুণ প্রসব বেদনা হয় তো হাসপাতালে সেখানে বাচ্চার মাথা কেটেই বের করা হয়। বউ-এর পেট চিরে নয়। (**একটু থেমে**) এইসঙ্গে ভগবানকে মাত্র একটা প্রার্থনা! আমার মৃত্যুর পর যেন আর কেউ এখানে বলি না হয়। আর যদি হয় তো আমার জায়গায় যে আসবে সে যেন ফুলের কুঁড়ি না হয়। সুখের ডালি হয়ে আসে যাতে না থাকে বিদ্যায় সৌরভ, না থাকে সংস্কৃতির কোমলতা। এ তো শ্মশান, এখানে তো মৃতদেহেরই দরকার (**আবার একটু থেমে ক্ষীণ স্বরে**) প্রাণবান মানুষের নয়। সব ছবিতেই আলো আর ছায়া আছে, কিন্তু আমার জীবনচিত্রে আলোর রেশমাত্র নেই। সব ছবিতে রঙ-এর ছড়াছড়ি আর আমার চোখ দিয়ে দুর্বার গতিতে অশ্রুধারা বয়েছে। আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, কিছু শুনতে পেলাম না, কিছু বলতে পারলাম না। আমার চোখ, কান আর জিহ্বা সর্বদা ঠাণ্ডাই রয়ে গেল...বরফের মত ঠাণ্ডা...মৃতের মত জড়, স্পন্দনহীন। আমি জীবনের প্রতিটি ঘণ্টা, দিন, মাস... বছরের পর বছর একটা অপদার্থ স্ত্রীর মত নিজের জীবনকে তিলে তিলে খইয়ে ফেলেছি আর আমার এই জীবন হয়ে উঠেছে তোমার উপহাসের সামগ্রী! কারো মর্মান্তিক দুঃখ যদি অপরের উপহাসের বস্তু হয়, তাহলে তা হলে...

(ফুলদানি থেকে একটা ফুল পড়ে যায় আর স্বামী সেই ফুলকে তুলে আবার ফুলদানিতে রাখে)

স্ত্রী ঃ (অত্যন্ত শুকনো হাসি হেসে ক্ষীণ স্বরে) পড়ে যাওয়া ফুল তুমি আবার ফুলদানে সাজিয়ে রাখতে পারো কিন্তু এই অবহেলিত, উৎখাত জীবন...

(স্ত্রী হঠাৎ চুপ হয়ে যায় যেন নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই ভয় পেয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড নিস্তব্ধ।)

স্ত্রী ঃ (হঠাৎ জোর গলায়) দেখো...দেখো...আমি বোধ হয় চললাম। শোনো...শোনো...এই যেতে যেতে অভিশাপ... হ্যাঁ, অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি। তোমার বংশে যেন কুলে বাতি দিতে কেউ না থাকে। কোনো প্রাণীই এই শ্মশানে বেড়ে ওঠবার জন্যে যেন না জন্মায়। এই সোনা, রুপো, হীরে মুক্তো এই নিষ্প্রাণ বিষয়সম্পত্তি, এই হৃদয়, সমস্ত ভাবনাচিন্তা আর এই সব সাধের জিনিসের কুশ্রী সমারোহ···**(আরো ক্ষীণ স্বরে)** এই সবকিছু থাকা সত্ত্বেও...যদি আমি ধর্মশীলা এবং সতী···সতী হই তো··· আমার···অভি···শা...পে···তুমি···ভস্ম...ভস্ম।

স্ত্রীর চোখ বন্ধ হয়। সেইসঙ্গে দোলনা থেকে কান্নার আওয়াজ। পুরুষ ঘাবড়ে গিয়ে হাওয়ার গতিতে চকিতে উঠে পড়ে টলতে টলতে (যেন পড়ে না যায়) দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

(ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে)

শেষার্ধ

চরিত্র ঃ

স্বামী ও স্ত্রী

স্থান ঃ একটি গ্রাম

স্থান ঃ স্ত্রীর সতিকা গৃহ
সময় ঃ সন্ধ্যা

(গাঁয়ের একটা বাড়ীতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ঘর। দেওয়ালগুলো পরিষ্কার করে মাটি দিয়ে লেপা। ঘরে কতকগুলো ছোট ছোট দরজা আর জানলা। সব কটা চৌকাট ও কপাটই গেঁয়ো ধরনের, কিন্তু বেশ তেল জল দিয়ে পরিষ্কার করা। জানলা দরজা সব বন্ধ। ছাতে পেরেক দিয়ে পাটের চটের চাঁদোয়া বাঁধা আর সেই চাঁদোয়ার চার দিক দিয়ে ঝুলছে লাল তুষের ঝালর। মেঝে বেশ ভাল করে গোবর দিয়ে লেপা। মেঝের ওপর ঘাসের দড়ির একটা সাধারণ খাটিয়া— খাটিয়ার ওপর পরিষ্কার বিছানা। খাটিয়ার কাছে কাঠের একটা পাটার ওপর প্রসব সংক্রান্ত কাপড়চোপড়। কাঠের পাটার কাছেই মাটির একটা উনুন তাতে কাঠকয়লার আগুন। খাটিয়ার কাছে মেঝের ওপর লাল রঙ-এর ছাপানো একটা বেডসীট। খাটিয়া আর বেড সীটের মাঝখানে উচু করে লাইন দিয়ে হলুদ রাখা আছে— হলুদের এই বাঁধের ফলে বেড সীটের ওপর কেউ বসলে তাকে আঁতুড় ঘরের ছোঁয়া লাগবে না। খাটিয়ার ওপর একজন স্ত্রীলোক শুয়ে আছে। স্ত্রীলোকটি এমনভাবে কাত হয়ে শুয়ে আছে, যাতে ওর দৃষ্টি বেড সীটের ওপর এসে পড়ে। ওর গলা পর্যন্ত একটা লাল লেপ দিয়ে ঢাকা। মুখ এবং হাত দুটো

লেপের বাইরে। ওঁর পিঠের কাছে ছোট একটা লেপে ঢাকা দেওয়া নবজাত শিশু। শিশুর সর্বাঙ্গ এমনকি মুখ পর্যন্ত লেপে ঢাকা থাকায় তাকে একদম দেখা যাচ্ছে না। স্ত্রীলোকটির বয়স প্রায় বছর তিরিশেক। গায়ের রঙ মোটামুটি ফরসা, সাধারণ সুন্দরী। বেড সীটের ওপর একজন পুরুষ বসে। পুরুষটির বয়স 32/33 বছর হবে। ফরসা রঙ, উচ্চতা মাঝামাঝি, দেখতে মোটামুটি সুন্দর। গায়ে সাদা একটা হাতাওয়ালা জ্যাকেট, পরনে ধুতি, গলায় লাল গামছা—সবকিছুই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পেতলের দীপদানে কয়েকটা বাতি জ্বলছে— তার আলোয় স্বামী স্ত্রী উভয়কেই বেশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। স্ত্রীর মুখেচোখে প্রেমের আবেগ— জলভরা চোখ দুটোতে যেন কেমন এক স্বপ্নালু ভাব। স্বামীর দিকে তাকিয়ে স্ত্রী কিছু বলছে। স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হলেও বেশ গম্ভীর। চোখের জল চেপে রাখার চেষ্টাই এই গাম্ভীর্যের কারণ। এবং চোখের জল চেপে রাখার চেষ্টার প্রতিফলন চোখে মুখে এবং গলায় একটা বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করেছে। স্ত্রী-লোকটি ধীরে ধীরে কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দের ওপর বেশ জোর দিয়ে কথা বলছে। পুরুষ অর্থাৎ স্বামীর মুখে শোক ও কাতরতার ছায়া। চুপ করে সে স্ত্রীর পানে চেয়ে কী যেন ভাবছে। ওর চাহনি দেখে মনে হচ্ছে তার মনের ভিতরে যে আলোড়ন চলেছে তার ছায়া চোখে ধরা পড়েছে।

স্ত্রী : হ্যাঁ, প্রিয়তম, আজ এই শেষবারের মত...লক্ষ্মীটি এই শেষবারের মত আমার কথাগুলো শোনো। যার কথা তোমার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, যার মুখ, যার চেহারা অতি

সাধারণ হলেও তোমার কাছে জগতে সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে হয়। যার কণ্ঠস্বরে কোন বিশেষত্ব না থাকলেও তোমার কাছে তা সবচেয়ে মধুর মনে হয়। তার কথা এই শেষবারের মত শুনে নাও— প্রিয়তম!

(স্বামীর চোখ ছলছল করে ওঠে। সে চোখের জল মুছতে থাকে।

স্ত্রী : একি, একি করছ? ছিঃ ছিঃ প্রিয়তম, তুমি এমন কাতর হয়ে পড়লে যে আমার কথা না বলাই রয়ে যাবে। আর এক-বার শুধু একটিবারের মত তোমাকে আমার যা কিছু বলার তা বলতে না পারলে মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে যে, প্রিয়তম! শুধু প্রেমিকই একই ঘটনাকে, একই কথাকে বারে বারে নতুন করে বলতে পারে। কিন্তু এই সময়...এই মুহূর্তটুকু তো...(**চুপ করে স্বামীর দিকে কাতর দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে আবার**) কি, আমার শেষ ইচ্ছেটুকু তুমি পূর্ণ হতে দেবে না?

(স্বামী গলা ঝেড়ে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বসে পড়ে)

স্ত্রী : হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি! অন্ততঃ একটুখানির জন্য সাহস রাখো। যা শোনার সব কিছু শুনে নাও। আমার কোন ইচ্ছাই তো তুমি কখনও অপূর্ণ রাখোনি। এই শেষ ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ করো, লক্ষ্মীটি, প্লীজ! (**একটু থেমে গলা ঝেড়ে নিয়ে**) প্রিয়তম,...আজ...আজ বারো বছর, পুরো একটা যুগ তোমার ঘরে আসার পর থেকে আজ অবধি যা কিছু ঘটেছে, তার সব আমার চোখের সামনে ছবির মত ভাসছে। আজ থেকে বারো বছর আগে এই বসন্তেই যখন পাহাড়, বন, উপবন, মাঠ, ক্ষেত, বাগান নতুন ফলে ফুলে ভরে উঠছিল, ঠিক তেমনি সময় তোমার আমার বিয়ের কথাবার্তা হয়। তার কিছুদিন পরেই হয় আমাদের শুভ-পরিণয়। আশপাশের গাঁয়ে অনেক অনেক দূর অবধি চাষীবাসীদের মধ্যে তোমাদের নামডাক

ছিল। চাষীবাসীর ঘরে তোমার মত সুন্দর ও শিক্ষিত ছেলে ছিল না। কেন জানি না, আমাকেও লোকে সুন্দরীই বলত।

(স্বামী একটু শুকনো হাসি হেসে মাথা নীচু করে)

স্ত্রী : (শুকনো হাসি হেসে) আমি এখনও বলব, তোমার চোখে আমিই এখনও দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুন্দরী। **(একটু থেমে)** মা আমাকে কত আদরে নিজের বুকে করে বড় করেছেন। বাবাও আমাকে চার ক্লাস পড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাবা ছিলেন পণ্ডিত, দূর দূরান্তের লোক তাঁর সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের কথা জানত। বাবা ঘরেই আমাকে কিছু কিছু সংস্কৃত ভাষা ও সাধারণ জ্ঞান শিখিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে গান-বাজনাও একটু-আধটু শিখিয়েছিলেন। **(স্বামী গামছা দিয়ে মাথা ও গলার ঘাম মুছতে থাকে এবং গামছার এক কোণ দিয়ে কান সাফ করতে থাকে।)**

স্ত্রী : (আবার সেইরকম শুকনো হাসি হেসে) আরে, কান সাফ করা রাখ। বলছি তো, আমার কণ্ঠস্বরই তোমার কানে সব চেয়ে মধুর মনে হত। **(একটু থেমে)** কত ইচ্ছা... কত সাধ নিয়ে আমার মা বাবা আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন। নিজে পণ্ডিত বলে কন্যাদানের সময় বাবা একেবারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রে কন্যাদান করেছিলেন। আমাদের দুজনকেই পরস্পরের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে কত সব বড় বড় প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। **(একটু থেমে)** প্রিয়তম, কিন্তু এই অগ্নিদেবের সাক্ষাতে বলছি জানি না, কর্তব্যের কতটুকু, আমি পালন করতে পেরেছি। কিন্তু তুমি অক্ষরে অক্ষরে সেই সব প্রতিজ্ঞা পালন করেছ।

(পুরুষ ডান হাতের নখ বাঁ হাতে ঘষতে থাকে আর স্ত্রীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।)

স্ত্রী : (ঐরকম শুকনো হেসে) তোমার চোখে আমার সবই ভালো। আচ্ছা আমার কি কোন দোষ থাকতে পারে

না? আমি যখন বলতাম, একমাত্র ভগবানই সমস্ত দোষমুক্ত, তখন তার উত্তরে তুমি যা বলতে তা কি আমি ভুলতে পারি? তুমি বলতে 'শুধু ভগবান নয়, আর-একজন আছে,' প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করতাম— 'সে কে?' আর তার উত্তরে তুমি বলতে 'তুমি'। সেইজন্যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করাই ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন। (**একটু থেমে**) প্রাণনাথ, ঐ··· ঐ সংকল্পের সময়, ঐ সব প্রতিজ্ঞার সময় আমার বন্ধুরা যে গান গেয়েছিল, না-জানি সে গান কতবারই আমার কানে বেজেছে। আর আজ... আজ তা এমন ভাবে বাজছে যেন এর আগে এত মধুর সুরে কখনো বাজেনি।

(**আবার একটু থেমে**) আমি... আমি তোমায় তখন প্রথম দেখছি। কেউ পাছে দেখে ফেলে তাই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বাঁকা চোখে কোনরকমে তোমাকে একটুখানি দেখে নিয়েছিলাম। তোমাকে সেই আবছা আবছা দেখেই আমার রোমগুলো যেন কেমন দাঁড়িয়ে উঠেছিল।... মনটা যেন কেমন-কেমন করে উঠেছিল। আহা, সেদিনের স্মৃতি এখনও আমার কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে আছে। (**আবার একটু হেসে**) বিদায়ের সময় নিজের বাপ-মা ছেড়ে বাড়ীঘর ছেড়ে আসবার সময় অবশ্যই কষ্ট হয়েছিল, চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু পাল্কী চড়ে আসতে আসতে সেই সদ্য-ভাঙা হৃদয় যেন একটা অবলম্বন পেয়েছিল, তুমি ছিলে আমার কাছে... যতই তোমাদের গাঁ, তোমাদের ঘর কাছে আসছিল, ততই আমার মনে কেমন এক অদ্ভুত আনন্দ, একটা নতুন উল্লাসের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। যে-গাঁয়ে, যে-ঘরে তুমি জন্মেছিলে, তুমি বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখেছ, তা দেখবার জন্য মনটা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। শ্বশুরকে তো আমি আগেই দেখেছিলাম। ওঁকে দেখেই আমার মনে ওঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। তাই এবার শাশুড়িকে দেখবার জন্য মনটা আকুলিবিকুলি করে

উঠছিল। (**একটু থেমে**) বার বার ইচ্ছে হচ্ছিল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমাদের গাঁ আর কতদূর' ? কিন্তু আগে কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলি নি, তাই লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসেছিলাম। যখন পাল্কীটা একটা গাঁয়ের দিকে মোড় নিয়ে আস্তে চলতে শুরু করল, তখন বুঝলাম যে তোমাদের গাঁয়ে এসে গেছি! যেখানে তুমি জন্মেছ, বড় হয়েছ, পড়া-শুনা করেছ—সেই গাঁয়ের চিন্তায় মন ভরে উঠছিল! এ গাঁয়ের সবকিছুই কেন জানি না কত সুন্দর, কত পবিত্র মনে হচ্ছিল। ঐ গাঁয়ের প্রতিটি ধূলিকণা, গাছের প্রতিটি পাতাও যেন কেমন সুন্দর আর শুদ্ধ মনে হচ্ছিল। তোমার বাড়ীর পাশে যখন পাল্কী এসে থামল আর মেয়েরা মিষ্টি সুরে গান গেয়ে যখন আমাদের স্বাগত জানাল তখন সেই গানের প্রতি-ধ্বনি আরো কত সুন্দর হয়ে আমার কানে বাজছিল। শাশুড়ি যখন আমাকে বরণ করে মুখের সামনে থেকে জলের পাত্রটা নামিয়ে নিলেন আর আমি ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম, তখন উনি আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলেন... প্রিয়তম, সেই মুহূর্ত, সেই মুহূর্তের সুখ, সে কী আনন্দ... আমি কি তা কখনও ভুলতে পারি? শ্বশুরকে দেখে মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল। কিন্তু শাশুড়ি দেখে মনে হয়েছিল, ইনি পূজ্য তো বটেই, কিন্তু এঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা ঠিক যেন মর্যাদার নয়... মনে হচ্ছিল যে-বুকে শাশুড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন সে বুক যেন সাগরের মত অসীম, আকাশের মত অনন্ত। (**একটু থেমে**) আর... তারপর সেই দিন... সেই সোহাগ-রাত... সেই সোহাগ... (**স্বামীর চোখ দুটি আবার অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে**)

স্ত্রী : না, না,... না, একবিন্দু জলও যদি তোমার চোখ থেকে পড়ে তবে আমার কথা থেমে যাবে, আমি আর বলতে পারব না। (**কাতর ভাবে স্বামীর দিকে দেখতে**

থাকে) বেশ, ছেড়ে দাও, সোহাগ-রাতের কথা আর বলব না। ওসব তুমি জান, মনের সুখ মনেই থাক, আমি তারপর বলে যাচ্ছি। (**আবার একটু থেমে**) আমি যা যা আশা নিয়ে এসেছিলাম তার সবই একে একে পূর্ণ হয়েছে, প্রিয়তম শুধু তাই নয়, যা জীবনে কোন দিন হবে বলে ভাবি নি তাও হয়েছে। মনে নতুন নতুন সাধ জেগেছে আর তার সবই পূর্ণ হয়েছে। শাশুড়ির আমি নয়নের মণি হয়ে উঠেছি আর শ্বশুরের কাছে যেন আমিই তাঁর সবকিছু। আর তোমার··· তোমার··· না-জানি কী-ই না কি...(**স্বামী হাতের ওপর হাত রেখে দীর্ঘ একটা শ্বাস নেয়**)

স্ত্রী : উঃ এই দীর্ঘশ্বাস··· এই দীর্ঘশ্বাস থামাও !

(**স্বামী ক্ষুব্ধ ভাবে বসে পড়ে**)

স্ত্রী ঃ একটু ধৈর্য ধরো, একটু নিজেকে শক্ত করো প্রিয়তম। (**একটু থেমে**) শাশুড়ি বুড়ো হয়েছিলেন তবুও আমাকে ঘরের কাজকর্ম করতে দিতেন না। কত মুস্কিলে ঘরের কাজকর্ম ওঁর হাত থেকে আমি ছাড়িয়ে আনতে পারতাম। যখনই আমি কিছু কাজ করতাম, উনি বলতেন, 'বৌমা, একটু জিরোও মা, হাঁফিয়ে যাবে যে'— ওঁর ঐ মিষ্টি কথা আমাকে কাজ করবার নতুন উৎসাহ দিত। শ্বশুর এসে যদি আমাকে কখনও কোন কাজ করতে দেখতেন তো বলে উঠতেন : 'আরে এটা কি ওর কাজ করবার বয়েস ? এখন একটু খাবে দাবে, খেলাধুলা করবে, তা নয়, শুধু কাজ আর কাজ'। ঐ কথা শুনে যেন আমি নতুন প্রাণ পেতুম। আর তুমি... তুমি তো সব সময় আমার পিছু পিছু ঘুরতে··· রাত নেই দিন নেই চব্বিশ ঘণ্টা শুধু আমারই কাছে কাছে। তুমি ছোট ছেলে নয়, বেশ জোয়ান হয়েও ছোটছেলের মত শিস দিতে, শাশুড়ি যাতে দেখতে না পান সেইভাবে তুমি চোখের ইশারা করতে, জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে চুপিচুপি আমাকে তোমার ঘরে ডাকার

জন্য না-জানি তুমি কত কীই-না করতে! কতবার তোমার কাছে কোনরকমে পালিয়ে এসে দু-চার কথা বলেই যখন তাড়াতাড়ি চলে যেতাম তখন তুমি আমার শাড়ীর আঁচল ধরে কেমন কাতর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে। তোমার সেই চাহনি, আহা কি মিষ্টি কি মধুর...

(**স্বামী মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়**)

স্ত্রী : (**কাতর ভাবে**) এই দিকে তাকাও, লক্ষ্মীটি।

(**স্বামী মুখ ঘুরিয়ে আবার স্ত্রীর দিকে তাকায় আবার একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বসে থাকে**)

স্ত্রী : আমিই তোমাকে বলে বলে ঘরের কাজ করতে আরম্ভ করিয়েছি। শ্বশুরের একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত করেছি। যত পুরানো হতে লাগলাম ততই কাজ বাড়তে লাগলো, তুমি আর আমি আরো বেশীক্ষণের জন্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলাম। তার ফলে রাতে যখন আমরা কাছাকাছি হতাম, তখন মিলন আরো মধুর হয়ে উঠত আর চাঁদনী রাতে আকাশে যখন চাঁদ ঢলঢল করত তখন আর বলতে কি! জ্যোৎস্নালোকের পুলক আমার মনের মণিকোঠাকে ভরিয়ে তুলত, লাজে সেই পুলক আমি প্রকাশ করতে পারতাম না। আমি জানালা খুলে দিতাম আর জ্যোৎস্নার আলো নতুন ইচ্ছা'র ঢেউ তুলে সেগুলো আমার মনের দুয়ারে এসে আছড়ে পড়ত। জ্যোৎস্না-লোকের নৃত্য যেন আমার হৃদয়ে আনন্দ তরঙ্গের ঢেউ তুলত। (**একটু থেমে**) কিছুদিন পর আমি বাইরে বেরুনো শুরু করলাম। কখনও কখনও তোমার সুর আমার মধ্যে জোর করে গানের লহর তুলত আর তখন তোমার মন-ময়ূরী নেচে উঠত। জ্যোৎস্না রাতের আনন্দ তো প্রতি মাসেই ছিল, কিন্তু ঝুলন শুধু একমাস আর হোলি মাত্র একদিনের জন্য। গাঁয়ের পালাপার্বণগুলো, আহা, শ্রাবণী তৃতীয়ার উৎসব আর সেই হোলির গান! আর সেই সব সুখ-আহ্লাদেরই মধ্যমণি ছিলে তুমি...

(স্বামী হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে থাকে। ওর হাঁটাচলা দেখে মনে হয় যেন নিজের শরীরটাই তার কাছে ভার ভার ঠেকছে। স্ত্রী চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মুখের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ও কিছু বলব বলব করছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর)।

স্ত্রী : প্রিয়তম, আমি জানি তোমাকে আজ অনেক কষ্ট দিচ্ছি, কিন্তু আজ… আজ তো তোমাকে এটুকু সহ্য করতেই হবে **(একটু থেমে)** প্রিয়তম, লক্ষ্মীটি, একটু বসো।

(স্বামী আবার চুপচাপ বসে পড়ে এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতের আঙুল কচলাতে থাকে।)

স্ত্রী : একদিকে মনের খুশীতে যেমন ঘুরে বেড়িয়েছি, তেমনি অপরদিকে অঢেল খেয়ে নিয়েছি, অঢেল পরে নিয়েছি। গাই-এর দুধ মোষের দুধের দই, ঘোল ঘি, মাখন। বাজরা, জোয়ার আর গমের রুটি, মুগ, অড়হরের ডাল, বাগানের সবুজ তাজা তাজা সব শাকসবজী! পৌষ মাঘে মটর কড়াই, গম, কার্তিক মাসে জোয়ার আর ভুট্টা। জামাকাপড়ের অভাব তো ছিলই না। আবার রঙীন জামাকাপড়ও কখনও কখনও পরি নি, তা নয়। শ্রাবণের চুনরী, বসন্তে বাসন্তী ধুতি, দেওয়ালীতে লাল শাড়ী, যার পাড়ে শাশুড়ি সোনালী রঙ করে দিতেন। কোন জমিদার, কোন লক্ষপতি কোটিপতি মহাজনও কি এত সুখ ভোগ করেছে কোন দিন? **(একটু থেমে)** কষ্টে আমি কোনদিনই পড়ি নি আর তা পড়বার কথাও নয়। সুখ আর দুঃখ তো চাকার মত ঘুরছে; সুখ আসে দুঃখ যায়, দুঃখ আসে সুখ যায়। কিন্তু দুঃখের দিনেও আমি আনন্দেই ছিলাম। শাশুড়ি যখন মারা গেলেন তখন সারা বাড়ী যেন আমার কাছে অন্ধকারের রাজ্য মনে হচ্ছিল। তারপর শ্বশুর যখন গেলেন তখন আবার মনে হল সারা সংসার বুঝি

অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কোন-কোন বছর ফসল নষ্ট হয়েছে, আর্থিক সংকটে যে পড়ি নি, তা নয়, কিন্তু সব সময়ই আমরা ছিলাম, তুমি আমার আর আমি তোমার। **(কথা বলা থামায়)**

(স্বামীর চোখ থেকে টপ্‌ টপ্‌ ফুঁফোটা জল গড়িয়ে পড়ে কিন্তু তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে সে একটু শক্ত হবার চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টায় দাঁত দিয়ে সে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে। কিছুক্ষণের জন্য সব নিস্তব্ধ।)

স্ত্রী : শাশুড়ি গত হবার পর আমার আর শ্বশুর গত হবার পর তোমার কাজ আরো বেড়ে গেল। দিনে তো সময়ই পেতাম না কিন্তু রাত যেন শুধু আমারই জন্য। দিনের বেলায় খুব ভোরে তুমি রোজ মাঠে চলে যাবার পরও আমি তোমার কথা চিন্তা করতে করতেই সব কাজ করতাম। দুধ দুইবার সময় গোরু-মোষের বাঁট থেকে দুধের ধারার মধ্যে আমি তোমারই প্রেমের ধারা দেখতাম। দুধ দোয়ার জায়গায় বাঁট থেকে দুধ পড়ার শব্দের মধ্যে আমি তোমারই প্রণয়ের স্বর শুনতে পেতাম। দই কাটাবার সময় মাঠা থেকে মাখন বার করবার সময় সেই মাখনে আমি তোমারই স্নেহের স্নিগ্ধতা লক্ষ করতাম। আটা পেষবার সময় ডাল ভাঙবার সময় চাকীর ঘরঘর শব্দে এবং মেঘ গর্জনের সময় তোমার প্রেমালিঙ্গনের কথাই আমার মনে পড়ত। রুটি তৈরী করতে করতে রুটি যখন ফুলে উঠত তখন বসন্তে সমস্ত ফুলের রাজ্য বিকশিত হওয়ার কথা আর সেই সময়ে তোমার প্রেম-চুম্বনের কথা আমার মনে পড়ত। এমন-কি বাসন মাজতেও আমার খারাপ লাগত না, মাজা বাসন যত চকচকে হ'ত ততই আমি খুশী হতাম, কেননা, ঐ বাসনে তোমার জন্যেই তো খাবার তৈরী হবে। ঐ সব মাজা বাসনে খাবার

বানিয়ে থালাতে সাজিয়ে দুধ আর মাখন সমেত যখন আমি তোমার জন্য মাঠে খাবার নিয়ে আসতাম আর তুমি তৃপ্তিভরে সেই খাবার খেতে, তখন তোমার হাসিখুশি মুখ দেখে আমার মনে হত যেন আমার জন্ম সার্থক হল। (**একটু থেমে**) সন্ধে হলে তাড়াতাড়ি ঘরদোর ঝাঁট দিতাম। ঝাঁটার ঝরঝর শব্দে আমার মনে প্রেমের ঝংকার উঠত। মাঠ থেকে কাদা পায়ে ঘরে এসে পা-টা ধোবার পর তোমার পায়ে যেন ধুলো না লাগে সেই কথা ভেবেই আমি সারা বাড়ী একেবারে, তকতকে করে পরিষ্কার করতাম। আর রাতে... রাতে যখন ক্লান্ত হাতে আমি তোমার পা টিপে দিতাম, তখন কেন জানি না হাতের ক্লান্তি তো ছেড়েই যেত সারা দিনের পরিশ্রমের ভারও যেন কোথায় চলে যেত। ওঃ...ওঃ...(**স্বামী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নেশাগ্রস্ত লোকের মত তাড়াতাড়ি পায়চারি করতে থাকে। বার বার চোখের জল মোছে। তার মুখচোখের ভাব ক্ষণে ক্ষণে বদলাতে থাকে— কখনও আলো কখনও বা অন্ধকার**)

স্ত্রী: (**ক্ষীণস্বরে**) আর তোমায় বেশী... বেশী কষ্ট দেব না। প্রিয়তম! শরীরটা আরো খারাপ লাগছে।

(**স্বামী ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে স্ত্রীর দিকে দেখতে থাকে**)

স্ত্রী: (**ক্ষীণস্বরে**) বোসো, লক্ষ্মীটি···অল্প দু-চারটে কথা শুনে নাও।

(**স্বামী বসে পড়ে দুই হাতে এমন জোরে নিজের বুক চেপে ধরে যেন মনে হয় বুঝি তার হৃদয়টা শরীরের বাইরে বেরিয়ে পড়ছে**)

স্ত্রী: আমাদের দুজনকে কেউ কেউ বলত, এরা যেন দুটো পুতুল আবার কেউ বলত এরা দুজনেই খোকাখুকি। আর বলবে না-ই বা কেন? যে বয়সে শিশুর সরলতা, আর সাদা-

সিধে ভাব, তার পবিত্রতা আর থাকে না… প্রেমের বাঁধনে সেই বয়সেও ঐ সব আমাদের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায় নি। আর মিলনের সেই প্রথম দিন থেকেই রোজই যেন আমার কাছে সেই সোহাগ-রাতে প্রথম মিলনের মত মনে হ'ত। আমরা দুজনে পরস্পরের কাছে সেই যেন বর আর কনেই রয়ে গেলাম। (**ধীরে ধীরে**) বলবার তো এখনও অনেক কিছু আছে, বারো বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কি আমি চুপ ছিলাম? কিন্তু অত কথা বোধ হয় বলেও শেষ করা যাবে না। কিন্তু… কিন্তু সময় যে আর বেশী নেই। (**একটু থেমে**) কিন্তু একটা দুঃখ রয়েই গেল, প্রিয়তম, শ্বশুর-শাশুড়ির নাতি দেখবার বড় শখ ছিল'। কিন্তু তাদের সে শখ আমি পূর্ণ করতে পারিনি। মাথা নীচু করে নাতির মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা, ধুলো পা শুদ্ধ তাকে কোলে করে নিজেদের কাপড়চোপড় ময়লা করার বড় সাধ ছিল ওঁদের। আমারও মা হবার ইচ্ছে দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। শাশুড়ি কত মানসিক (মানত) করেছেন, কত রকমের মাতুলি কবচ পরিয়েছিল আমাকে। শ্বশুরও কত পুজো-আর্চা করিয়েছেন। কিন্তু যখন ওঁরা বুঝলেন যে আমি ওঁদের এই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করতে পারছি না বলে আমার মনে কষ্ট হয়, তখন ওঁরা এ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলাই একেবারে বন্ধ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, শাশুড়ি নানারকম উল্টোপাল্টা বকে আমাকে ভোলাবারও কম চেষ্টা করেন নি। ওঁদের সে সাধ এখন পূর্ণ হয়েছে। ওঁরা ছিলেন পুণ্যাতমা। স্বর্গে গেছেন … সাধ পূর্ণ হওয়ার আনন্দ স্বর্গে ওঁদের কাছে হয়তো গিয়ে পৌঁছেছে। (**একটু থেমে**) তোমার এই সন্তানকে পেটে ধরে, পেটে করে তার ভার বহন করে আমার যে কী সুখ! আমি "মা" হয়েছি এ কথা ভেবে আমার মনে যে আনন্দ হয়েছে, যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে তা আমি কথায়

বলে বোঝাতে পারব না। পেটের মধ্যে বাচ্চা যখন নড়া-চড়া শুরু করল তখন মনে হল যেন সমগ্র জীবন্ত পৃথিবীটা আমার মধ্যে নড়ছে। বাচ্চা যখন ঘুরতে শুরু করল, তখন মনে হল যেন সারা ত্রিভুবন আমার পেটের মধ্যে চক্কর মারছে। প্রসব বেদনার সময় একদিকে যেমন আমার কষ্ট হচ্ছিল তেমনি অপর-দিকে আমার মনের মধ্যে আনন্দের হিল্লোলও উঠছিল। ওর মুখ দেখো... আর... আর... তুমি তোমার মুখ দেখো... (**চোখে জল এসে যায়**)

(**স্বামীর চোখ দিয়েও অঝোরে জল পড়তে থাকে। দু হাতে জোরে সে নিজের হাঁটু চেপে ধরে। কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা।**)

স্ত্রীঃ (**অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে**) তুমি আমাকে সারাবার জন্যে আর বাকি কী রেখেছ, প্রিয়তম? ডাক্তার, বদ্যি, হাকিমে তো ঘর ভরিয়ে দিয়েছ। কিন্তু যার যাবার সময় হয়, তাকে কি আর কেউ রুখতে পারে... একদিন-না-এক-দিন মরতে তো হবেই সকলকে। কেউ বুড়ো হয়ে, কেউ ছোটবেলাতেই, কেউ-বা তাড়াতাড়ি আবার কেউ-বা অনেক দেরীতে। আমার তো আনন্দের কথা এই যে আমি জোয়ান থাকতে থাকতেই যাচ্ছি। (**ভাবতে ভাবতে**) জোয়ান বয়সে মরা এইজন্যে ভাল যে হৃদয় কঠিন হয়ে যাওয়া বা চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে আসার আগেই মানুষ এই নোংরা পৃথিবী থেকে মুক্তি পায়। আমায় যেতে হচ্ছে এজন্যে আমি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নই। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এইজন্যে যে তোমায় ছেড়ে যেতে হবে। আমি তো বেশ সুখেই মরছি আর যাবার সময় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে আমি তোমারই মত স্বামী, তোমার বাবা-মার মত শ্বশুর-শাশুড়ি আর তোমার বাড়ীর মত বাড়ী পাই। আর আর... প্রাণনাথ! যাবার সময় তোমার কাছে একটি, শুধু একটি

প্রার্থনা তুমি যদি তা না দাও তবে তোমার সঙ্গে যে পরম সুখে এতদিন ঘর করে এসেছি, তার একবিন্দু সুখও আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না।

(স্বামী কাঁদতে কাঁদেত স্ত্রীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় আর দুই হাতের ওপর মাথা রাখে)

স্ত্রী : বলো, বলো তুমি আমার কথা রাখবে, প্রিয়তম! এ-বাড়ী তুমি শূন্য রাখবে না; নিজের জীবন একলা একলা কাটাবে না, এই অবলা শিশুকে মাতৃহীন করে রাখবে না… আমি স্বর্গে যাচ্ছি,… প্রাণনাথ… আমি স্বর্গে যাচ্ছি, নরকে কেন যাব? স্বর্গ থেকে তোমার শুভ-পরিণয় দেখব। তা দেখে আমার এবং শ্বশুর-শাশুড়ির যে কী আনন্দ হবে, তা তুমি কল্পনা করতে পার না। এই 32/33 বছর বয়সে তো কেউ সন্ন্যাসী হয় না, শাস্ত্র তো 75 বছর বয়সে বানপ্রস্থ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। **(অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে যেন নিজে নিজেই কথা বলছে, একটু থেকে)** তুমি একলা থাকলে একলা থাকলে…আমি স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাব না…তোমার চিন্তাই করতে হবে…কে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করবে…মাঠে তোমার জন্যে কে রুটি নিয়ে যাবে? রাতে… রাতে কে তোমার পা টিপে দেবে? **(চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করে কিন্তু)** কে… এই… অবলা… বাচ্চাকে… দেখবে… বর দাও…

(স্ত্রীর চোখ বন্ধ হয়ে যায়, জোরে শ্বাস বইতে বইতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। স্বামী তাড়াতাড়ি উঠে হলুদের গণ্ডী ডিঙিয়ে স্ত্রীর খাটিয়ার কাছে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে জোরে কেঁদে ওঠে। আর সেই সময় তার কান্নায় যোগ দেয় তারই নবজাত শিশু)

(ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে)

তোয়ালে

—উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক

চরিত্র ঃ

বসন্ত
মধু
সুরো
চিন্তী
মঙ্গলা

(স্থান ঃ নয়াদিল্লী)

(বসন্তের ড্রয়িং রুমের পর্দা ওঠে। ড্রয়িং রুমটা খুব ছোটও নয় আবার খুব বড়ও নয়। বসন্তের মাইনে মাসে আড়াইশো টাকা। নয়াদিল্লীর মত জায়গায় আড়াইশো...কিন্তু হলে কি হবে সে ফার্মের ম্যানেজার। তাই টেলিফোন আছে, ঘরটাও মোটামুটি সাজানো গোছানো। বাঁ দিকের দেওয়ালের গায়ে একটা টেবিল, তার ওপর কিছু কাগজপত্র আর টেলিফোন।

টেবিলের পাশেই ঘরে ঢোকার দরজা। ঘরের এক কোণে একটা ফায়ার প্লেস। কিন্তু ফায়ার প্লেসে সম্ভবত আগুন জ্বলে না, কেননা তার ঢাকনাটা বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার; ফায়ার প্লেসের ওপরটা বেশ জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো—ঠিক যেমন মাঝামাঝি ধরনের বাড়ীতে থাকে। ফায়ার প্লেসের ওপরে দুধারে দুটো পিতলের ফুলদানি, কাছেই একটা ছোট টেবিলের ওপর একটা রেডিও রাখা, যার ঢাকার ঝালরটা টেবিল ছুঁয়ে আছে। রেডিও রাখার টেবিলের কভারটা ফায়ার প্লেসের ওপর ঝুলছে। ফায়ার প্লেসের ঢাকার সঙ্গে টেবিল কভারটা বেশ ম্যাচ করা এবং এসবের মধ্যে মধুর রুচিজ্ঞানের ইঙ্গিত স্পষ্ট।

ফায়ার প্লেসের ওপরে দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার—ক্যালেণ্ডারটা টেবিলে উপবিষ্ট লোকের মুখের সামনে

পড়ে। ক্যালেণ্ডারে নভেম্বর মাসের পাতাটা খোলা। ফায়ার প্লেসের সোজাসুজি রান্নাঘরে যাবার দরজা।

এই দরজা থেকে একটু দূরে সামনের দরজার ঠিক পাশেই একটা বেতের কোচ। তার সামনে একটা তেপায়া। কোচের গদীটা বেশ সুন্দর এবং তেপায়ার ঢাকাটা গদীর কাপড়ের সঙ্গে বেশ ম্যাচ করা।

সামনে, দেওয়ালের বাঁ দিকে কোচ থেকে একটু দূরে বাথরুমের দরজা। এই দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা ড্রেসিং টেবিল—মধু এবং বসন্তের টয়লেটের জিনিসপত্র এই টেবিলে রাখা। এর ওপরে স্ট্যাণ্ডে তোয়ালে টাঙানো। টেবিলের কাছে দু-একটা চেয়ার।

ডান দিকের দেওয়ালে বাইরে যাবার দরজা। পর্দা ওঠালে দেখা যায় বসন্ত ড্রেসিং টেবিলে বসে দাড়ি কামাচ্ছে এবং পরে তোয়ালেতে মুখ মুছছে। এই সময় রান্নাঘরের দরজা দিয়ে সোয়েটার বুনতে বুনতে মধুর প্রবেশ।)

মধু : আবার তুমি মদনের তোয়ালে নিয়েছ! বলছি কি ?...

বসন্ত : (**মুখ মুছতে মুছতে**) ওঃ! এটা বাজারের তোয়ালে! দূর ছাই একদম খেয়ালই থাকে না! (**হাসতে হাসতে**) ব্যাপারটা হচ্ছে মদনের তোয়ালেটা ছোট আর দাড়ি কাটার...

মধু : (**একটু রেগে গিয়ে**) হ্যাঁ, দাড়ি কাটার তোয়ালেটা এইরকম বটেই তো! একটু চোখটা খুলে দেখো, দাড়ি কাটার তোয়ালেটা এই রকম। বটেই তো! একটু চোখটা খুলে দেখো, দাড়ি কাটার তোয়ালে আর মদনের তোয়ালেতে তফাত বোঝা যাচ্ছে এবার ? এটা কত সাদা আর···

বসন্ত : কিন্তু দুটোই রোঁয়াদার যে!

মধু : (**ব্যঙ্গের সুরে**) দুটোই! তাই তো বলছি চোখ বন্ধ করে এ-দুটোর তফাত বলে দেওয়া যায়।

বসন্তঃ (**একটু চুপ করে থেকে**) আসলে আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। দাও, দাড়িকাটার তোয়ালেটা দাও। ওটা কোথায় দেখছি না যে!

মধুঃ (**স্ট্যাণ্ডে টাঙানো তোয়ালেটা উঠিয়ে**) এই তো তোমার চোখের সামনে ঝুলছে। তবুও...

বসন্তঃ চশমা খুলে রেখেছি। দেখছ! আর চশমা ছাড়া আমার···

(**একটু লাজুক হাসি হাসতে হাসতে**)

মধুঃ বটেই তো! কি জানি বাপু কোন্ ছুনিয়ায় থাকো তুমি। এখন না-হয় চশমা নেই! কিন্তু চশমা থাকলেই বা কি?

(**রাগে মুখ ফুলিয়ে বসে পড়ে আর চুপচাপ সোয়েটার বুনতে থাকে। বসন্ত দাড়ি কাটার সরঞ্জাম গুছাতে থাকে। হঠাৎ মধুর দিকে তাকিয়ে**)

বসন্তঃ মুখ ফুলিয়ে বসে আছ যে! রাগ হয়েছে?

মধুঃ (**ব্যঙ্গ হাসি হেসে**) না, রাগ করতে যাব কেন?

বসন্তঃ তুমি কি আমাকে এতই বোকা ভাবো যে আমি এও বুঝতে পারব না?

মধুঃ (**আগের মতই হেসে**) আমি কি বলেছি তুমি বোকা!

বসন্তঃ (**দাড়ি কাটার সরঞ্জাম ছেড়ে দিয়ে চেয়ারটা মধুর দিকে ঘুরিয়ে**) আমি তোমাকে কতবার বলেছি, মনের ভাব গোপন করার টেকনিকটা তোমার আসে না। তোমার উপেক্ষা, তোমার রাগ, তোমার ভাবনাচিন্তা সবই তোমার মুখেচোখে ফুটে ওঠে। তোমার এসব ভাবভঙ্গীগুলো বড় খারাপ লাগে। কিন্তু আমি তোমার কাছে কিছু লুকোই না। নিজের সম্বন্ধে নিজের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সব-কিছুই তো তোমাকে বলেছি। আমার সব-কিছু...

মধু : (**টেবিলের ওপর সোয়েটার রেখে দিয়ে, আগের মতই ব্যঙ্গের হাসি হেসে**) আমি কবে তোমাকে কি বলেছি !

বসন্ত : এরকম ভাবে হেসো না। এরকম বিদ্রূপের হাসিই তোমার কাল হয়েছে। (**মধু চুপ করে থাকে, বসন্ত আবার বলে**)

বসন্ত : আমি তোমাকে কি করে বোঝাবো যে আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চাই।

মধু : (**হেসে**) তা, আমি কি তা না বলেছি ?

বসন্ত : নোংরা জিনিসপত্র আমিও পচ্ছন্দ করি না।

মধু : (**শুধুই হাসতে থাকে**)

বসন্ত : কিন্তু আমি তোমার মত অ্যারিস্টোক্রেটিক পরিবেশে মানুষ হই নি আর ঐ সব সৌখিনতাও আমার আসে না। আমাদের বাড়ীতে একটাই তোয়ালে ছিল আর ছ'ভাই ওতেই কাজ চালাতাম।

মধু : তুমি আমাকে অ্যারিস্টোক্রেটিক বলে বিদ্রূপ করছ ? আমি কবে বলেছি, আমাদের দশ-বিশটা তোয়ালে দরকার।

বসন্ত : দশ-বিশটা নয় তো আর-কি ? স্নান করবার একটা, দাড়ি কামাবার একটা, হাতমুখ মোছবার একটা, তোমার একটা, মদনের একটা।

মধু : (**ঘুরে বসে**) কিন্তু, এতে দোষের কি হল শুনি ? আমার যখন কেনবার ক্ষমতা আছে তো দশটা তোয়ালে থাকবে না কেন ? কাল, ভগবান না করুন, আমাদের তোয়ালে ব্যবহার করার ক্ষমতা যদি না থাকে; আমি তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি গরীব হলেও কি করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা যায়—তোয়ালে না হোক গামছা বা কোন পুরোনো কিন্তু সাদা চাদর বা ধুতির টুকরো—যে-কোন জিনিসই কি করে পরিষ্কার রাখা যায়। কিন্তু অন্যের তোয়ালে আরেকজন কি করে ব্যবহার করে ?

বসন্ত : আমি তো বললাম, আমরা ছ'ভাই একটা তোয়ালেতে কাজ চালাতাম।

মধু : কিন্তু অসুখবিসুখ...

বসন্ত : এ থেকে কোন অসুখবিসুখই হতে পারে না।

মধু : চর্মরোগ···

বসন্ত : তোমার বা মদনের তো কোন অসুখ নেই···আর তা ছাড়া অসুখ এভাবে করে না বুঝলে? অসুখ হয় দুর্বল হয়ে গেলে। যখন শরীরে রক্তের লোহিত কণার সংখ্যা কমে যায়, তখন! চুহা সৈদনশাহের কথা শুনেছ?

মধু : চুহা সৈদনশাহ···

বসন্ত : হ্যাঁ, কয়েকজন অফিসার শিকার করবার উদ্দেশ্যে চুহা সৈদনশাহে গেছলেন। তাঁদের মধ্যে আমেরিকার রকফেলার ট্রাস্টের কয়েকজন ডাক্তারও ছিলেন। লাঞ্চের সময় জলের দরকার হল। বেয়ারা এসে বলল এ গাঁয়ে কোনো কূয়ো নেই। লোকে পুকুরের জলই খায়। ডাক্তারদের বিশ্বাস হল না। কেননা পুকুরের জল তো নোংরা। হেন রোগ নেই যার জীবাণু ঐ জলে নেই। কিন্তু চুহা সৈদনশাহের জাঠেরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, লম্বাচওড়া···

মধু : ওঃ, তা তুমি বলতে চাও আমরাও পুকুরের জল খাওয়া শুরু করে দিই?

বসন্ত : (**উঠে পড়ে পায়চারি করতে থাকে**) তুমি এ কথা শুনে বিদ্রূপের হাসি হাসতে পারো (**মধুর সামনে থেমে গিয়ে**) কিন্তু জানো, আমেরিকান ডাক্তাররা ওখানেই রয়ে গেলেন। একজন জাঠের রক্ত পরীক্ষা করে জানা গেল যে ঐ রক্তে লোহিত কণার সংখ্যা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। তখন উনি ওখানকার লোকের দৈনন্দিন খাবারদাবার পরীক্ষা করলেন। জানা গেল যে ওখানকার লোক প্রচুর পরিমাণে দই আর লস্যি খায় আর দই-এ রোগজীবাণু-ধ্বংসকারী শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তাই বলছি এইসব সৌখিনতা বা সৌন্দর্য দিয়ে নীরোগ থাকা যায় না। বরং শরীরের রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমেই নীরোগ থাকা সম্ভব—যার দ্বারা রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়। (**আবার পায়চারি করতে থাকে**)

মধু : চুহা সৈদনশাহের কথা তো শুনলাম। ময়লা তোয়ালেতে শরীরের লাল কীটাণু বাড়ে না কমে, সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আমি শুধু বুঝি যে ছোট থেকেই আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করি। মামা...

বসন্ত : (টেবিলে হেলান দিয়ে) তুমি আবার তোমার মামা, মেসোর কথা পাড়ছ। মামা বিলেত থেকে ফিরেছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে উনি যা বলছেন সবই বেদবাক্য। সেদিন তোমার মেসো এসেছিলেন। উনি হাত ধোবার পর আমিও ভুলে একটা তোয়ালে এগিয়ে দিলাম। **(মধুর কাছে গিয়ে)** তা উনি দু-পাটি দাঁত বার করে বললেন **(নকল সুরে)** "আমি অন্যের তোয়ালেতে হাত মুছি না"—তাই নিজের রুমাল দিয়ে হাত মুছতে লাগলেন। আমি বলি, উনি তোয়ালেতে হাত মুছলে কি রোগ ওনার গায়ে চেপে বসত ?

মধু : ও তো...

বসন্ত : আর তোমার মামা **(ফিরে গিয়ে টেবিলের ওপর বসে পড়ে)** তুমি যাবার পর আমি একদিন ওঁর ওখানে গেছলাম। রাত হয়ে যাচ্ছিল। পরদিন সোজা অফিসে যেতে হবে। উনি বললেন, দাড়ি এখানেই কেটে নাও। আমি বললাম—"আমি একদিন অন্তর অন্তর দাড়ি বানাই। আজ দাড়ি না বানালেও চলবে।" উনি আবার বলাতে আমি বললাম—"আচ্ছা বেশ বানিয়ে নিচ্ছি।" তখন উনি একটা বাজে রেজর নিয়ে এসে বললেন, **(নকল করে)** "আমি নিজের রেজর অন্য কাউকে দিই না, এইজন্যে আমি আত্মীয়-স্বজন অতিথিদের জন্য অন্য একটা রেজর রেখে দিই।" —রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছল, তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "ঠিক আছে, রেখে দিন, আমি বাড়িতে গিয়ে শেভ করে নেব।"

মধু : মামা...

বসন্ত : (নিজের কথায় গুরুত্ব দিয়ে) এতে বোধ হয় উনি বুঝতে পারলেন যে ওঁর কথাবার্তায় আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। তাই

উনি নিজের রেজরটা দিয়েই আমাকে শেভ করতে বললেন। কিন্তু আমার দাড়ি কাটার পর ব্লেডটা উনি আমার সামনেই লনে ফেলে দিলেন আর চাকরকে বললেন কি যে রেজরটা যেন স্টেরিলাইজ করে আনে। (**মধুকে নকল করে**) মামা...

মধু: আমি বলছি, তুমি ওঁর স্বভাব চরিত্র জানো না, তাই ওঁর ব্যবহার তোমার খারাপ লেগেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার রকমসকম কাব্য ও কলার মতই···

বসন্তঃ (**আবেগে মধুর কাছে এসে**) তোমার এই ঘেন্না-ঘেন্না ভাবের মধ্যে আবার কাব্য আর কলাকে টেনে আনার দরকার কি? তোমার মত পরিবেশে যারা মানুষ হয়েছে, তাদের এই সৌখিনতার মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব আছে— শরীরের প্রতি, নোংরামির প্রতি, জীবনের প্রতি ঘৃণা !

(**মধু চুপ করে থাকে**)

বসন্তঃ আমি জীবনকে ঘৃণা করি না। আমি শরীরকে ঘৃণা করি না, সত্যি কথা বলতে কি আমি নোংরাকেও ঘৃণা করি না।

মধুঃ (**হাসতে হাসতে**) তা হলে জঞ্জালের গাদায় বসো না গিয়ে !

(**বসন্ত আবার গিয়ে চেয়ারের ওপর বসে এবং চেয়ারটাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে আসে।**)

বসন্তঃ আমি নোংরা ঘেন্না করি না, আর আমি নোংরা পছন্দ করি না—দু-দুটো কথার মধ্যে তফাত অবিশ্যি খুবই সূক্ষ্ম। কিন্তু আমাকে কাজ করতে হয়; দিনে দু-চার বার নোংরা যখন ঘাঁটতেই হবে— তবে আর একে ঘেন্না করে কি লাভ? যে গরীবদের তুমি তোমার এই কার্পেটের ওপর পা দিতে দাও না, আমি ওদের পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারি।

(**মধু হাসতে থাকে**)

বসন্তঃ আমি এই নোংরা জায়গায় জীবনের বেশ কয়েকটা

বছর কাটিয়েছি, যেখানে তোমার এই পরিচ্ছন্নতার বাতিকের কোন স্থান নেই।

মধু : (**একই জায়গায় বসে সোয়েটার বুনতে বুনতে**) কিন্তু এখন তো আর তোমার সে অবস্থা নয়। এখন তো আর তুমি নোংরা জায়গায় থাক না। অবস্থার চাপে পড়ে করা, মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তাই বলে অযথা নোংরা থাকা এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

বসন্ত : তুমি বলতে চাও, আমি নোংরা থাকতেই ভালোবাসি ?

মধু : (**ঐ বিদ্রূপের হাসি হেসে**) তা কখন বললাম ?

বসন্ত : (**দাঁড়িয়ে উঠে**) এমন দিনও গেছে, যখন একটা গেঞ্জি পরেই আমি কয়েকদিন কাটিয়ে দিয়েছি। সেটা ধোবার পর্যন্ত ফুরসত পাই নি। আর এখন আমি দিনে দুবার করে গেঞ্জি বদলাই। এই যদি নোংরামির লক্ষণ হয় তো…

মধু : (**ঐ রকম হেসেই**) তা কখন বললাম ?

বসন্ত : পরিচ্ছন্নতা খারাপ নয়। কিন্তু তুমি সব জিনিসকেই বাতিকের পর্যায়ে না নিয়ে গিয়ে ক্ষান্ত হও না। এই বাতিক জিনিসটা আমার মোটেই সহ্য হয় না ! (**আবার পায়চারি করতে থাকে**) গেঞ্জি আর তোয়ালের কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু যদি ভুল করে গেঞ্জি না বদলাই বা অন্য তোয়ালে নিয়ে নিই তো এর মানে এই নয় যে তুমি আমার স্বভাব দেখে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকবে, কি অমন বিদ্রূপের হাসি হাসবে।

(**মধু চুপ করে থাকে**)

বসন্ত : (**রেডিওর কাছে গিয়ে**) তুমি নিজেকে এইসব সংস্কারের বাঁধনে এমন ভাবে বেঁধেছ যে আমার সামান্য ত্রুটিতেই তুমি বিরক্ত হয়ে যাও। নিজের মতকে তুমি একেবারে বেদ-বাক্যের পর্যায়ে নিয়ে নাও ! উর্ষী আর নিমনো।

মধু : (**সোয়েটার বোনা ছেড়ে**) আবার উর্ষী আর নিমনোর কথা তুলছ। উর্ষী আর নিমনো…

বসন্ত : (হাসতে হাসতে) কাল বাজারে ওদের সঙ্গে দেখা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কি ব্যাপার গো! এতদিন আসো নি কেন?" ওরা বলে কি যে কাকীমাকে ওদের ভয় করে **(হাসতে লাগল)**।

মধু : (আগের মতই বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে) কেন, আমি ওদেরকে খেয়ে ফেলব নাকি?

বসন্ত : (তেপায়ার কাছ থেকে) খাবে কি করে... ওরা কি ছোট ছেলে নাকি যে খেয়ে ফেলবে?

মধু : (বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে) ছোট ছেলে!

বসন্ত : (ওঁর ঠাট্টাটা প্রায় না শুনেই তেপায়ার ওপর বসতে বসতে) হাসাটা ওদের স্বভাব। হাসির কথা না হলেও ওরা হাসবে আর তোমার এটিকেট— আস্তে আস্তে ফিটফাট হয়ে চলাফেরা করো— উঃ!

(বিরক্তভাবে মাথা নেড়ে উঠে পড়ল) যে লোক পেট ভরে খেতে পরতে পায় না— এত কিছু মেনে চলা কি তার পক্ষে সম্ভব? আর জীবনে করবে-টাই-বা কি! চিন্তা-ভাবনা কি কিছু কম আছে যে এত রকম আচার-বিচার মেনে চলবে —এটা কোরো না, ওটা কোরো না, এটা বোলো না, ওটা বোলো না।

(মধু চুপ করে থাকে)

বসন্ত : আর ঐসব আচার-বিচারের মধ্যে একটা কমনীয়তার ভাব আছে তাও নয়। তুমি আসার আগে আমি, দেব আর নারায়ণ তিনজনে মিলে একটা লেপের মধ্যে মুড়ি দিয়ে বসতাম। ভাবতে পারো— শীতের সকালে কি সন্ধেয় একটা খাটিয়ার ওপরই একটা লেপের মধ্যে চার-পাঁচজন বন্ধু মিলে মুড়ি দিয়ে বসে। গল্প হচ্ছে, সুখদুঃখের কথা হচ্ছে। চা খাওয়া হচ্ছে, কথাবার্তা চলছে— একটু নেশাটেশাও হচ্ছে— আহা, কি মেজাজ, কি ফুর্তি। আর এখন বন্ধুবান্ধব আসে, আলাদা আলাদা চেয়ারে

বসে। এ যেন এক বোঝা! দুজনেই ভাবে বিদায় হলেই বাঁচি। (**আবেগের সঙ্গে**) তুমি তো বিছানার কাছে একটা পাখী পর্যন্ত আসতে দাও না। তাই বলছি এত সব আদবকায়দা কি আর আমার পোষায়?

(**ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসে আর দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম ঠিক করে রাখতে থাকে**)

মধু: আচার-বিচার আমারও যে ভালো লাগে তা নয়। কিন্তু, যখন দেখি অপর ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন, তখন বাধ্য হয়েই তাকে দিয়ে কাজ করাতে হয়। তুমিই বল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যেস আছে এমন লোক কটা! ক'জন লোক আমার মত পা ধুয়ে তবে লেপের মধ্যে বসে?

বসন্ত: ঐতো, পা ধোয়ার ঝঞ্ঝাটই তো লেপের মধ্যে বসার মেজাজটা নষ্ট করে দেয়।

মধু: দেখো, একটা কুকুরও বসবার সময় লেজ দিয়ে একটু ধুলো ঝেড়ে বসে। আর মানুষ তো স্বাভাবিকভাবেই একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসে। নোংরা মেখে থাকা লোকজনকে আমার বাপু ঘেন্না লাগে (**আবার সোয়েটার বুনতে শুরু করে**)

বসন্ত: (**ঘুরে বসে**) ঘেন্না— আমিও তো তাই বলছি। তুমি আমাকে ঘেন্না করো, আমার স্বভাবকে ঘেন্না করো, তোমার পরিবেশ আমার পরিবেশকে ঘেন্না করে।

মধু: (**বিদ্রূপের হাসি হেসে**) হ্যাঁ, তুমি তো তা বলবেই।

বসন্ত: আমার সব কিছুতেই তোমার ঘেন্না— আমি খেতে পরতে, উঠতে বসতে, কথায় বার্তায় সব কিছুতেই— আমি যখন হাসি একেবারে হোঃ হোঃ করে হাসি আর সেইজন্যে উর্মী আর নিমনো…

মধুঃ (**সোয়েটার ফেলে দিয়ে**) আবার উর্ষী আর নিমনো। সময় অসময় বলে একটা জিনিস আছে তো নাকি? সেদিন পার্টিতে উর্ষী এসেই কোথাও কিছু নেই, আমার কানটা মলে দিল, নিমনো আমার চোখদুটো বন্ধ করে দিল। ঐটা কি ইয়ার্কির সময় নাকি? হাসি-তামাশা আমি অপছন্দ করি না, কিন্তু এই সব বাজে ইয়ার্কি আমার সহ্য হয় না।

বসন্তঃ উর্ষী...

মধুঃ ও হ'ল একটা পয়লা নম্বরের অসভ্য বদমাস মেয়ে। মদনের জন্মদিনে সবাই এসেছে। নিম্মো এত চঞ্চল তবু সেও একপাশে বসে আছে আর এই হতচ্ছাড়া নবাবের বেটি উর্ষী একেবারে চটি সমেত সামনে পা ছড়িয়ে এসে বসল। ওঁর ঐ নোংরা চটি আমার শাড়ীতে একেবারে ঠেকে যায় আর-কি। এসব নোংরামি তোমার ভালো লাগতে পারে, কিন্তু আমি একদম এসব বরদাস্ত করতে পারব না। যে উঠতে বসতে কথা বলতে জানে না, সে মানুষ নয়— একটা পশু।

বসন্তঃ (**গর্জন করে উঠে**) পশু! তুমি আমাকে পশু বললে? এইসব আদবকায়দা দিয়ে তুমি মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা চিন্তাভাবনাটাকে বাঁধতে চাও, এতে করে তার স্বাধীন সত্তাটার মৃত্যু হয়। আমি এসব পছন্দ করি না, আর সেই জন্য তুমি আমাকে ঘৃণা কর। তোমার ঐ বিদ্রূপের হাসিতে আছে শুধু ঘৃণা। আর সেইজন্যেই তো ভয় হয় যে আমি কোনদিন সত্যিই না পশু হয়ে যাই। এখন আমার ইচ্ছে করছে কি জানো, এখান থেকে তোয়ালেটা বাইরে টান মেরে ফেলে দিই আর··· ইচ্ছে করছে··· তোমার এই ব্যঙ্গের হাসি গলা টিপে বন্ধ করে দিই। ঘৃণা ঘৃণা আর ঘৃণা— আমার সব কথাতেই তোমার ঘৃণা— আমাকে পশু ভাবা হচ্ছে।

মধুঃ (**সোয়েটার ওঠাতে ওঠাতে ভারী গলায়**) তুমি শুধু শুধু সব কথা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নাও। যা আমি

স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নি সেই সব কথা নিজে মনে মনে ভাবো। তোমাকে আমি ঘৃণা করি কি ঘৃণা করি না— তা আমি জানি। কিন্তু তুমি আমাকে অবশ্যই ঘৃণা কর। তুমি আমাকে বিয়ে করেছ আর কেন করেছ, তাও আমি জানি। ঘৃণাই যদি করবে তো বিয়ে করার কি দরকার ছিল? আমি তো বুঝতে পারছি না এত রাগ কিসের ওপর— আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, আমার পোশাক-পরিচ্ছদ না আমার স্বভাবচরিত্রের ওপর।

বসন্ত: তুমি…

মধু: আমি ভেবেছিলাম আমি তোমাকে সুখী করে তুলতে পারব। তোমার এই ছন্নছাড়া জীবনকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে তুলতে পারব। কিন্তু কোন চেষ্টাতেই কিছু হল না। তোমার এই নোংরা ভন্‌ভন্‌ করা, এই জিনিসপত্র এলোমেলো ছন্নছাড়ার মত পড়ে থাকা, এতেই তোমার সুখ। আমার সাজানোগুছানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তোমার খারাপ লাগে। বেশ, আমি আজই চলে যাচ্ছি।

(মধু দাঁড়িয়ে পড়ে— টেলিফোনে রিং হতে থাকে। বসন্ত তাড়াতাড়ি গিয়ে টেলিফোন তোলে।)

বসন্ত: হ্যালো, হ্যালো ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার।

মধু: **(চাকরাণীকে ডাকে)** মঙ্গলা!

মঙ্গলা: **(বাথরুমের দরজার মধ্য দিয়ে আসে।)** কি বলছেন?

মধু: আমার বিছানাটা বেঁধে দাও আর আমার ট্রাংকটা এক্ষুনি এই ঘরে নিয়ে এসো।

মঙ্গলা: মেমসাহেব, আপনি…

মধু: যা বলছি, শীগগির ট্রাংকটা নিয়ে এসো।

(মঙ্গলা চলে যায়। বসন্ত 'আচ্ছা স্যার' বলে টেলিফোন রেখে দিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে।)

বসন্ত : শোনো, শোনো, তোমার জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধির আগে আমার জিনিসপত্র তো আগে বেঁধে দাও। আমাকে এখুনি বেনারস যেতে হবে। সাহেবের হুকুম। তোমার জিনিসপত্র পরে বেঁধো! (**হাসতে থাকে**)

(পর্দা পড়ে)

(**একটু পরে আবার পর্দা ওঠে। সেই একই ঘর। জিনিসপত্রও সেই একই। শুধু আগে যেখানে টেবিল ছিল সেখানে এখন একটা খাট আর খাটের মাথার কাছে একটা তেপায়ার ওপর টেলিফোন রাখা আছে। ঐ টেবিলটা ড্রেসিং টেবিলের জায়গায় চলে গেছে আর ড্রেসিং টেবিল আর তার চেয়ারটা ডান কোণে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাটের ওপর লেপটাকে বুক অবধি টেনে নিয়ে মধু দেওয়ালের দিকে মুখ করে অন্যমনস্কভাবে আধশোয়া অবস্থায় আছে। একটু পরে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকায়। ক্যালেণ্ডারে জানুয়ারি মাসের পাতা খোলা। বাইরের দরজাটা খোলা, তা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। লেপটাকে কাঁধ অবধি টেনে নিয়ে মধু মঙ্গলাকে ডাকতে থাকে! মঙ্গলা ও মঙ্গলা!... কিন্তু এত আস্তে আস্তে ডাকছে যে— সে ডাক বোধ হয় মঙ্গলার কানে পোঁছয় না। মধু লেপটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মঙ্গলা নিজে নিজেই আসে।**)

মঙ্গলা : মেমসাহেব, আপনার কি শরীর খারাপ নাকি?

মধু : (**শুয়ে থেকেই একটু মাথা নেড়ে**) মঙ্গলা, কপাটটা বন্ধ করে দে তো, উঃ কি বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

মঙ্গলা : (**কপাট বন্ধ করতে করতে**) জিজ্ঞাসা করলাম কিছু বললেন না যে!

মধু : হ্যাঁ গা-টা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে।

মঙ্গলা : তা, সাহেবের কোন চিঠি এল ?

মধু : হ্যাঁ, এসেছে। আজকালের মধ্যে উনি এসে পড়বেন।

মঙ্গলা : তা হলে...

মধু : **(কাষ্ঠ হাসি হেসে)** শরীরটা কেমন যেন একটু ভার-ভার ঠেকছে। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে...

মধু : কে ?

(দরজায় খট্‌ খট্‌ আওয়াজ হয়)

সুরো : **(বাইরে থেকে)** দরজা খোলো।

মধু : **(উঠে বসে)** মঙ্গলা, দরজাটা খুলে দেখ, কে ?

(মঙ্গলা দরজা খোলে। সুরো আর চিন্তী, ভেতরে আসে।)

মধু : **(লেপ সরিয়ে রেখে)** আরে সুরো, চিন্তী, তোমরা কখন এলে ?

সুরো : আজই সকালে গাড়ী থেকে নেমেছি।

চিন্তী : মা প্রয়াগ যাচ্ছিলেন। সবিতা বলল তা হলে দিল্লীটা দেখেই যাই।

মধু : উঠেছ কোথায় ?

চিন্তী : কনটপ্লেসে, মালিক কাকার ওখানে। উনি সেদিন একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে দিল্লী এলে...

মধু : আর আমাকে একটা চিঠিও দিতে পার নি। এত দিন ধরে বলে রেখেছি, দিল্লী আসো তো...

সুরো : সেইজন্যে সবার আগে তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। মা বলেছিলেন, কুতুবমিনার...

চিন্তী : আমি বললুম, কুতুবমিনার একদিকে আর মধুদির বাড়ী আর-এক দিকে !

(মধু খিলখিল করে হাসতে থাকে)

সুরো : ওঃ দু ঘণ্টা ধরে তোমার বাড়ী খুঁজছি আমরা, বাব্বা !

মধু : কিন্তু, আমার ঠিকানা তো...

চিন্তী : সুরো ভুলে গেছে। টাংগাওয়ালাকে বলেছে, ভৈরোর মন্দির নিয়ে চলো।

মধু : (**আশ্চর্য হয়ে**) ভৈরোর মন্দির...

চিন্তী : আর টাংগাওয়ালা নিয়ে গেছে সবজিমণ্ডী ছাড়িয়ে ত্রিশ হাজারীর গীর্জার কাছে।

মধু : গীর্জার কাছে...(**জোরে বলে ওঠে**)

চিন্তী : (কথা না থামিয়ে) তখন ওর মনে এলো যে ভৈরোর মন্দির নয়, হনুমান মন্দির। আবার নয়াদিল্লী ফিরে আসা হ'ল।

(মধু জোরে খিল খিল করে হেসে ওঠে)

সুরো : তখন খেয়াল হ'ল, আমরা ফালতু ঘুরে মরছি। তোমার বাড়ী একেবারে কাছেই ছিল।

মধু : তোমাদেরও বলি, বাপু...

সুরো : খুব হাসতে শিখেছ তো। জন্ম থেকেই তোমার মাথায় একটু ছিট্ আছে...

চিন্তী : কী তোমার কর্তামশাই এইরকম খিল খিল করে হাসতে শিখিয়ে দিয়েছেন বুঝি ? তাকে দেখছি না তো, কোথায় গেছেন ?

মধু : বেনারস। দু মাস হ'ল। ওখানে ফার্মের ম্যানেজার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত, দু-একদিনের মধ্যেই এসে যাবে।

চিন্তী : ভালো আছেন তো ?

মধু : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ মেজাজেই আছে। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বিছানার ওপর উঠে বোসো না। **(মঙ্গলাকে ডাকে)** মঙ্গলা, মঙ্গলা ! **(সুরো আর চিন্তী চেয়্যারে বসে)**

মধু : আরে, চেয়ারে নয়—এখানে এসো। খাটের ওপর উঠে বোসো লেপ ঢাকা দিয়ে।

সুরো : কিন্তু আমার পা…(**হেসে**)…আমি ধুতে পারব না।

মধু : আরে, পায়ে তোমার কি হয়েছে কি—জুতো পরে এসেছ তো?

চিন্তী : তা বলে পা না ধুয়ে একেবারে বিছানায়?

মধু : তাতে কি হয়েছে। বিছানা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। এখানে এসো, দরজা বন্ধকরে দাও। বাবাঃ, একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। (**মঙ্গলা আসে**)

মঙ্গলা : মেমসাহেব, আপনি ডাকছিলেন?

মধু : হ্যাঁ, চা নিয়ে এসো।

(**চিন্তী দরজা বন্ধ করে দেয়। তিন জনে লেপের মধ্যে পা ঢেকে আরাম করে বসে।**)

সুরো : সামনের মাসে পুষ্পর বিয়ে।

মধু : (**খুশী হয়ে**) লেফটেন্যাণ্ট বীরেন্দ্রের সঙ্গে তো?

চিন্তী : (**হেসে**) সবাই তো আর তোমার মত নয়। ও সারা জীবন বীরেন্দ্রের সঙ্গে প্রেম করেই যাবে, কিন্তু বিয়ে করবার সময় প্রোফেসর মুন্সীরাম।

মধু : কিন্তু মুন্সীরাম….

সুরো : একেবারে ছিনে জোঁক একটি। লেফটেন্যাণ্ট সাহেব কখনওসখনও বছরে দু-একবার আসেন আর প্রোফেসার সাহেব একেবারে মাথার কাছে চব্বিশ ঘণ্টা ঘোড়া নিয়ে তৈরী। ছায়ার মত পেছনে পেছনে ঘুরছে।

চিন্তী : লম্বাটে লিকৃলিকে চেহারা—জোরে হাওয়া দিলে বোধ হয় উড়ে যাবে। আমি ভাবছি, পুষ্পর কথা। যেমন ইয়া মোটা ধুসকো আর বিয়ে হচ্ছে কার সঙ্গে?

মধু : আমি ভাবছি, ঐ লোকটাকে পুষ্পর পছন্দ হ'ল

কি করে? আমি তো ওকে পাঁচ মিনিটের জন্যেও সহ্য করতে পারব না। নোংরার হদ্দ একটা, দেখে মনে হয় যেন···

চিন্তা: যা বলেছ, বছরে একবারও স্নান করে কি না সন্দেহ।

স্বরো: ওকে সহ্য করা ছাড়া উপায় কি? ওর বাবা মুন্সীরামের ওপর খুব খুশী। উনি মুন্সীরামকে খাইয়ে পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তারপরে কলেজে চাকুরিতে লাগিয়ে দিয়েছেন। বীরেন্দ্র তো বি· এ· ক্লাসেই চার বছর পড়ে রইল। কিন্তু মুন্সীরাম সেদিক থেকে একেবারে রেকর্ড ব্রেক করা ছাত্র।

(চায়ের ট্রে হাতে মঙ্গলা ঘরে ঢুকল)

মঙ্গলা: চা রাখব কোথায়, মেমসাহেব?

মধু: টেবিলের ওপর রেখে একটা একটা করে কাপ আমার হাতে দাও। আর তেপায়াটা এদিকে সরিয়ে দিয়ে ওপরে বিস্কুট রেখে দাও।

স্বরো: **(আশ্চর্য হয়ে)** মধু!

মধু: আরে উঠে যাচ্ছ কোথায়? এখানেই বোসো না। এখান থেকে উঠে ডাইনিং টেবিলে গেলে এ চায়ের আর কিছু থাকবে?

চিন্তা: **(ওঠবার চেষ্টা করে এবং একটু রাগের স্বরে)** মধু···

মধু: আরে ছাড়ো ছাড়ো। যাবে কোথায়, এখানেই বোসো।

চিন্তা: **(ঠাট্টা করে)** আচ্ছা। তা হলে বিয়ের পরে রানী মধুমালতী আগের সব মতামত পালটে ফেলেছেন, দেখছি। এখন ডাইনিং টেবিলের বদলে বিছানাতেই চা খাচ্ছেন আর বিছানাতেই খাবারেরও অর্ডার হয়।

স্বরো: কোথায় এক গ্লাস জল খেতে গেলেও ডাইনিং রুমে যেতে হত আর আজ···

মধুঃ আরে দূর, ওসব আদবকায়দা মেনে কি লাভ? সত্যি করে বল তো, এই গরম বিছানা ছেড়ে ডাইনিং রুমে যেতে কে চায়? নাও নাও চা আর বিস্কুট নাও তো। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

(**সবাই চায়ের কাপ তুলে নেয়। গল্প শুরু করে।**)

সুব্রোঃ কিন্তু বিছানায় চা পড়ে গেলে?

মধু: তো কি হবে? চাদরটা ধুয়ে দিলেই হবে। কবে কি ঘটবে সেই ভয়ে রোজকার এই মৌজ তো নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

সুব্রোঃ মৌজ। (**ব্যঙ্গের হাসি হেসে**) বিছানায় বসে চা খাওয়াকে তুমি দারুণ মৌজ ভাব···(**আবার হাসে**)

চিন্তীঃ আর, তা ছাড়া সভ্যতা দৃষ্টি···

মধুঃ মানুষের এই ছকে বাঁধা জীবন শুরু হয় আবার শেষ হয় আর এই চরৈবেতির নামই তো সংস্কৃতি। সোসাইটির এক অংশের কাছে আর-একটা অংশ চিরকালই অসভ্য থেকে যাবে। সুতরাং মানুষ এই সভ্যতা আর সংস্কৃতির পেছনে আর কাঁহাতক ছুটে মরবে।

সুব্রোঃ এ তুমি কি বলছ? তুমি কি বলতে চাও, মানুষ এত সব জেনেশুনে আবার পুরোনো দিনের বর্বর যুগে ফিরে যাবে?

মধুঃ না, বর্বর যুগে ফিরে যাবে কেন? কিন্তু এত নিয়মকানুন— তো ছকে-বাঁধা জীবন কেন? না বর্বর, না ছকে-বাঁধা জীবন— এ দুয়ের মাঝামাঝি জীবনই তো ভালো। অতখানি খোলাখুলি ব্যাপারও নয়, যাতে বর্বর মনে হয় আবার অত কড়াকড়িও নয়, যাতে মানুষ নিয়মের দাস হয়ে পড়ে। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন···

স্থরোঃ ভগবান বুদ্ধ? তোমার কি হয়েছে বলো তো? মান্ধাতার আমলের সব বাছবিচার তুমি আজকের সভ্যতার মধ্যে আনতে চাইছ।

চিন্তোঃ মানুষ প্রতি মুহূর্তেই সামনে এগিয়ে চলেছে। আজকের বাছবিচার কাল অকেজো হয়ে যায়, কালকেরটা আবার পরশু অচল হয়ে যায়। বার্নার্ড শ...

মধুঃ (**ব্যঙ্গের হাসি হেসে**) বার্নার্ড শ'র কথা ছাড়ো। আরে খালি হাতে বসে আছ যে। মঙ্গলা, আর এক কাপ করে চা বানাও।

চিন্তোঃ এই, না, না। এবার আমরা চলি। অনেকক্ষণ হল এসেছি।

মঙ্গলা, হাত ধোবার জল দাও তো।

মধুঃ আরে, আর-এক কাপ করে চা তো হোক আগে।

স্থরোঃ না, মধু। এবার চলি। ওখানে সবাই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি বলে এসেছি স্রেফ মধুর বাড়ীটা কোথায় দেখে আসব। এক-আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। আর এখানে আসতেই দু ঘণ্টা লেগে গেল।

চিন্তোঃ বাথরুম কোথায়? আমি বাথরুম থেকেই হাত ধুয়ে আসি।

মধুঃ আরে, এই ঠাণ্ডায় কি হাত ধোবে?

স্থরোঃ না ভাই, হাত ধুতেই হবে। চট্‌চট্‌ করছে।

মধুঃ তাহলে ঘরে! (**মঙ্গলাকে ডাকে**) মঙ্গলা, ওদের হাত ধোবার জল দাওতো।

স্থরোঃ বাথরুম...

মধুঃ আরে বাথরুমে গিয়ে কি করবে। এখানে বাইরে ধুয়ে নাও।

(**দরজা খুলে স্বরো আর চিন্তী হাত ধোয়। মধু চুপচাপ নিজের কাপের চাটুকু শেষ করতে থাকে।**)

স্বরো : (ভিজে হাতে ফিরে এসে) তোয়ালে কোথায়?

মধু : মঙ্গলা তোয়ালে দিয়ে যায় নি? আচ্ছা এ স্ট্যাণ্ড-এর ওপর যেটা টাঙানো আছে, ঐটেই নাও।

স্বরো : (রেগে গিয়ে) মধু, তুমি ভালো করেই জানো…

মধু : মঙ্গলা, ভেতর থেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে এনে দাও তো।

(**চিন্তীও ভিজে হাতে ফিরে আসে। মঙ্গলা তোয়ালে নিয়ে আসে এবং এরা তোয়ালেতে হাত মোছে।**)

মধু : আমি বলছিলাম, আর একটু বসে গেলে হ'ত না।

চিন্তী : না ভাই, কাল আবার আসবার চেষ্টা করব।

(**হাত মুছে তোয়ালে চেয়ারের পিঠের ওপর রাখে**)

মধু : চেষ্টা-ফেষ্টা নয়। আসতেই হবে। ভুলো না যেন। আর হ্যাঁ, এখানে খেয়ে যেতে হবে কিন্তু।

স্বরো : হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই আসব।

(**মধু উঠতে যায়**)

স্বরো : থাক্ থাক্। আর উঠতে হবে না। গরম লেপ ছেড়ে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

(**দরজা বন্ধ করে হাসতে হাসতে চলে যায়।**)

মধু : আমাকে আর-এক কাপ চা দাও তো মঙ্গলা।

মঙ্গলা : (চা-এর কাপ এগিয়ে দিয়ে) মেমসাহেব, এঁরা কারা?

মধু : আমার বান্ধবী। একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। হোস্টেলেও একসঙ্গে ছিলাম। (**কিছুক্ষণ মধু চুপচাপ চা খেতে থাকে। তারপর**)

মধু: মঙ্গলা!

মঙ্গলা: আজ্ঞে।

মধু: আচ্ছা, আমার দিকে একটু তাকিয়ে বল তো, আমি কি সত্যি সত্যি বদলে গেছি?

মঙ্গলা: (চুপ করে থাকে)

মধু: (যেন নিজে নিজেই বলে) আমার বন্ধুরা বলছে, আমি নাকি বদলে গেছি। পাড়া-প্রতিবেশীও তাই বলছে। আমার দিকে একটু তাকিয়ে বল তো কি আমি সত্যি সত্যি বদলে গেছি নাকি?

মঙ্গলা: মেমসাহেব, আমি তো চব্বিশ ঘণ্টাই আপনার কাছে আছি। আমি কি করে বলব?

মধু: (আবার কথা টেনে নিয়ে) আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল তো, আমি সত্যি সত্যি বদলাতে পেরেছি কিনা। চোখে ঘৃণার কোন চিহ্ন নেই তো?

মঙ্গলা: (আশ্চর্য হয়ে) ঘৃণা!...

মধু: আমার ব্যবহারে নকলপনা সাহেবিয়ানা কিছু দেখা যাচ্ছে না তো?

মঙ্গলা: (আগের মতই আশ্চর্য হয়ে) নকলপনা, সাহেবিয়ানা...

মধু: কৃত্রিম বিনয়, নকলপনা, ঘৃণা—এই তিনটে জিনিসকে আমি কাটিয়ে উঠতে পেরেছি কিনা? দু মাস আগে এই নিয়েই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে উনি চলে গেছেন।

মঙ্গলা: এসব কী বলছেন, মেমসাহেব। সাহেব তো...

মধু: (শূন্যপানে তাকিয়ে) ওঁর রাগ এখনও যায় নি। এই দুমাসে উনি একটা চিঠিও লেখেন নি।

মঙ্গলা: একটা চিঠিও লেখেন নি। কিন্তু...

মধু: (ব্যঙ্গ সহকারে) "আমি ভালো আছি। তুমি

কেমন আছ জানাবে"। কিম্বা "ম্যানেজারের অসুখ এখনও সারে নি। উনি ভালো হলেই আমি চলে যাব।" একে তুমি চিঠি লেখা বলো, আসলে এখনও আমার ওপর ওঁর রাগ যায় নি। উনি ভাবেন, আমি ওঁকে ঘৃণা করি।

মঙ্গলা : (**কিছুই বুঝতে না পেরে**) ঘৃণা, ঘৃণা !

মধু : যদি আমি ছোট থেকেই এমন পরিবেশে মানুষ হয়ে থাকি যেখানে পরিচ্ছন্ন থাকা এবং আদবকায়দা মেনে চলা হয়, সেটা কি আমার দোষ। (**গলার স্বর একটু ভারী হয়ে আসে**) আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা আর সব-কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে চাওয়াটাকে ওঁর কাছে ঘৃণা মনে হয়। তাই ভাবছি, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার পাট একেবারে চুকিয়ে দেব। এইজন্যে কখনও কখনও আমার নিজের ওপরই ঘেন্না হয়। (**দীর্ঘশ্বাস ফেলে**) আমার ছোটবেলাকার সংস্কার—এত তাড়াতাড়ি কি এসব ঘুচবে। (**হঠাৎ দৃঢ় হয়ে**) কিন্তু না, এসব ছাড়তেই হবে। পুরানো আচারবিচার, আদব-কায়দা থেকে আমাকে মুক্তি পেতেই হবে। উনি ভাবেন, আমি ওঁকে ঘৃণা করি।

মঙ্গলা : এসব আপনি কি বলছেন, মেমসাহেব ?

মধু : উনি ভাবেন—ওঁর স্বভাবচরিত্র, ওঁর পরিবেশ, ওঁর সব-কিছুকেই আমি ঘৃণা করি ! (**চাপা কান্নার সুরে**) এই দুমাসে তো আমি নিজেকে একেবারে বদলে ফেলেছি। একেবারে বিলকুল বদলে ফেলেছি।

(**দরজায় আওয়াজ হয়—বসন্ত ঘরে ঢোকে।**)

বসন্ত : হ্যাল্...লো মধু—কি খবর ! কেমন আছ ম্যাডাম ! (**মঙ্গলাকে ডেকে**) মঙ্গলা টাংগা থেকে মালপত্র নামাও। আর... (**পকেট থেকে পয়সা বার করে**) আর এই নাও, দেড়টাকা—টাংগাওয়ালাকে দিয়ে দিয়ো।

(**মঙ্গলা পয়সা নিয়ে চলে যায়।**)

বসন্ত : (**মধুর কাছে গিয়ে**) তারপর, বলো কেমন

আছ ? তোমাকে কেমন কেমন যেন একটু শুকনো শুকনো লাগছে। কি শরীর খারাপ নাকি ?

মধু : (ইতিমধ্যে খাট থেকে নেমে পড়ে একটু হাসবার চেষ্টা করে।) কদিন ধরে ঠাণ্ডাটা বেশ জোর করে পড়েছে। তিন-চারদিন হল একটু সর্দি হয়েছে।

বসন্ত : তোমাকে কতবার বলেছি, নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দাও। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যই হল আসল জিনিস। এই সব ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার চেয়ে স্বাস্থ্যটার ওপর একটু নজর দেওয়া অনেক কাজের কাজ হবে। যদি স্বাস্থ্যটাই ঠিক না থাকে, তো এসব করে কি হবে আর যদি শরীরটা ঠিক থাকে তাহলে এই ঝাড়ামোছার আর কোন দরকার নেই। **(খোশ মেজাজে)** আরে, সব পালটে গেছে দেখছি। খাটটা, ডাইনিং রুমে এল কি করে ? এখানে চায়ের ট্রে, কাপ সব !...

মধু : খাটটাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি, যাতে তুমি আর তোমার বন্ধুবান্ধবের একটুও কষ্ট না হয়। লেপের মধ্যে আরাম করে বসো। টেলিফোন তোমার মাথার কাছে থাকবে।

বসন্ত : (আনন্দে আটখানা হয়ে) আরে ব্যস্। তুমি... তুমি খু...উব...ভালো...খু...উব...মিষ্টি।

মধু : আমিও তো একটু আগে আমার বন্ধুদের নিয়ে এই লেপের মধ্যে বসে ছিলাম।

বসন্ত : (আনন্দে আশ্চর্য হয়ে) সত্যি !

মধু : (খুশী হয়ে ভালবাসা মাখা দৃষ্টিতে বসন্তের দিকে তাকিয়ে) শুধু তাই নয়, লেপের মধ্যে বসে আমরা চাও খেয়েছি।

বসন্ত : (খুব খুশী হয়ে) বা...বা... বা ! এতদিনে তুমি জীবনের আসল সাধ পেয়েছ। জীবনের আসল রহস্য বাইরের এইসব আচারবিচার নেই। জীবনের আসল রহস্য হল মনের

কাছে। যদি আমার প্রতিরোধ শক্তি আমার পাওয়ার অব রেজিস্টেন্স ঠিক থাকে...

মধু : এই নরম নরম বিছানায় বসে এখানেই চা খাবে।

বসন্ত : বাঃ বেশ বেশ। তা হলে মঙ্গলাকে আমার জন্যে চায়ের জল চড়াতে বলো।

মধু : এবার রাগ মিটেছে তো ?

বসন্ত : (**আশ্চর্য হয়ে**) রাগ !

মধু : তুমি এতদিন ধরে আমার ওপর গোসা করে বসে থাকতে পারো, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

বসন্ত : (**আরও আশ্চর্য হয়ে**) গোসা !

মধু : ছ মাস ধরে তুমি একটা ভালো করে চিঠিও দাও নি।

বসন্ত : কিন্তু আমি...

মধু : হ্যাঁ, চিঠি দিয়েছ, "আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ জানাবে।" একে কি চিঠি লেখা বলে নাকি !

বসন্ত : (**হো হো করে হেসে উঠে**) ওঃ, তুমি এই জন্যে ভেবে নিয়েছ যে আমি তোমার ওপর রাগ করে আছি ! পাগলি, কোথাকার ! তোমার ওপর কেউ কখনও রাগ করতে পারে !

মধু : তাই বলে মাত্র ছ'লাইন...

বসন্ত : ছ লাইনই বা লেখবার সময় কোথায় বলো ?

মধু : আচ্ছা, ঢের হয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও দিকিনি চট্‌পট্‌। আমি তোমার চা করে আনি।

বসন্ত : তুমি না খুব...খুউব...খু...উব ভালো।

মধু : (**মুচকি হেসে**) আচ্ছা, আচ্ছা ঢের হয়েছে। আগে হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নাও।

বসন্ত : আবার, তুমি কাপড় বদলাবার ঝামেলা পাকালে তো !

মধু : কেন, জামাকাপড় বদলাবে না ? এক রাত একদিন গাড়ীতে গাড়ীতে এলে। গা-ময় রাস্তার ধুলো। যাও যাও,

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় বদলে ফেলো। সেই সময় আমি চা করে আনছি। (**বসন্তকে বাথরুমের দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে মঙ্গলাকে ডাকে**) মঙ্গলা, ও মঙ্গলা !

মঙ্গলা : (**পাশের ঘর থেকে**) কি বলছেন, মেম-সাহেব।

মধু : মালপত্র সব ঘরে রাখা হয়েছে তো ?

মঙ্গলা : হ্যাঁ মেমসাহেব।

মধু : চা-এর ট্রেটা আর কাপগুলো ধুয়ে নিয়ে এসো। চা-এর জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে ! সাহেব মুখহাত ধুতে গেছে। আমি চা-এর জল বসাচ্ছি। তুমি এর মধ্যে ট্রে আর কাপগুলো ধুয়ে আনো।

(**মঙ্গলা ট্রে আর কাপগুলো নিয়ে যায়। যেতে গিয়ে একটা চামচে পড়ে যায়।**

মধু : (**খনখনে গলা করে**) ফের কার্পেটের ওপর চামচে ফেললে ! কতবার বলেছি, একটু সাবধানে কাজ কর। চামচে ফেললে এখন জায়গাটা চট্‌চট্‌ করবে। ট্রেটা বাইরে রেখে এখন ওখানটায় ভিজে কাপড় দিয়ে মোছ।

বসন্ত : (**বাথরুম থেকে**) হ্যাঁ গো, সাবান কোথায় ?

মধু : ভালো করে দেখো ; সব ওখানেই আছে।

বসন্ত : আর তোয়ালে ?

মধু : মুখহাত ধুয়ে নাও। তারপর এখানে ঘরের মধ্যে কাচা তোয়ালে আছে— তাতে হাতমুখ মুছবে, বুঝলে !

(**মঙ্গলা ভিজে কাপড়ের টুকরো নিয়ে এসে কার্পেটের যে জায়গায় চামচেটা পড়েছিল, সেখানে সাফ করতে থাকে।**)

মধু : কার্পেট সাফ করে ট্রে আর কাপগুলো ধুয়ে নিয়ে এসো। আমি চা-এর জল বসাচ্ছি।

(রান্নাঘরের দরজা থেকে ভেতরে যায়। মঙ্গলা কিছুক্ষণ চুপচাপ কার্পেট মুছতে থাকে। বসন্ত মুখ-হাত ধুয়ে নিয়ে আস্তিন গুটিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে আসে।)

"এ দোলায় দুলব আমি, আমার মন দোলে রে।
কেমন করে দুলব দোলায়, আমার মন দোলে রে।"

(নিজের মনেই চেয়ারের পিঠ থেকে তোয়ালেটা নিয়ে যে-তোয়ালেটায় সুরো আর চিন্তী হাতমুখ মুছে গেছে তা দিয়ে মুখ মুছতে থাকে।)

মধু : (রান্নাঘর থেকে) কেটলিটার এ কী অবস্থা হয়েছে। এক রাশি ময়লা জমে আছে। **(কেটলি হাতে এগিয়ে আসে)** একদিনের জন্যও কি ভালো করে বাসন মাজতে নেই। কতবার বলেছি... বাসনগুলো একটু দেখে··· **(হঠাৎ বসন্তকে সুরো আর চিন্তীর হাতমোছা তোয়ালেতে মুখ মুছতে দেখে)** এই তুমি কাচা তোয়ালেতে মুখ মুছছ? আচ্ছা, নতুন কাচা তোয়ালের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া আছে নাকি। এইমাত্র সুরো আর চিন্তী চা খেয়ে ঐ তোয়ালেতে হাত মুছে গেছে।

বসন্ত : (ঘাবড়ে গিয়ে) কিন্তু নতুন···

মধু : নতুন তোয়ালে ঘরের মধ্যে টাঙানো আছে।

বসন্ত : ওহো, তাই তো, এটা ব্যবহার করা তোয়ালে। আমার একদম খেয়াল থাকে না। আসলে দুটো তোয়ালেই পরিষ্কার তো?···

মধু : হ্যাঁ, তা বৈকি। একটু চোখ খুলে দেখ। একটা শুকনো আর একটা ভিজে।

বসন্ত : চশমাটা খুলে রেখেছি তো। আর চশমা ছাড়া জানই তো, আমার দুনিয়া...

মধুঃ হ্যাঁ, তোমার দুনিয়া··· জানি না বাপু। তুমি যে কোন্ দুনিয়ায় থাকো। এখন না-হয় চশমা নেই. চশমা থাকলেই যে কি সব-কিছু তোমার চোখে পড়ে।

(**মুখ ফুলিয়ে পিছু ফিরে**)

বসন্তঃ আবার তুমি এইসব ঝামেলা করছ তো! রাগ করলে নাকি?

মধুঃ (**মুচকি হেসে**) আচ্ছা মুশকিল, রাগ করতে যাব কেন?

বসন্তঃ (**চেঁচিয়ে উঠে**) তুমি নিজেকে কি ভাবো কি বলো তো? আমি কি এতই বোকা যে তুমি রাগ করেছ কি করো নি, সেটুকু বুঝতে পারব না!

(**পর্দা পড়ে**)

স্ট্রাইক

—ভুবনেশ্বর

চরিত্র ঃ

(প্রথম দৃশ্য)

একজন পুরুষ
ও একজন স্ত্রীলোক

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

তিনজন পুরুষ
ও একজন তরুণ

(তৃতীয় দৃশ্য)

প্রথম দৃশ্যের পুরুষ
ও দ্বিতীয় দৃশ্যের তরুণ

(প্রথম দৃশ্য)

বাংলোর একটা খাবার ঘর। করিডোরের একপাশে একটা পরদা টাঙিয়ে ঘরটা তৈরি করা হয়েছে। ঘরের মধ্যে বেশ বড় একটা টেবিল, টেবিলের ওপর চিনির বাসন, কাপ, প্লেট ইত্যাদি বেশ ভালোভাবে সাজানো আছে। তার পাশেই একটা ছোট টেবিলের ওপর ক্র্যাকরোটস্, পলসন বাটার ও দু-এক রকমের মুখ-রোচক আচার ইত্যাদি রাখা আছে। দুটো চেয়ারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক বসে আছেন। প্রায় দশ মিনিট যাবৎ নীরব। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা চা খাচ্ছেন।

স্ত্রী : (চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে) সরদার সাহেব, তা হলে বেশ ঘাবড়ে গেছলেন বল ?

ভদ্রলোক : (অন্যমনস্ক ভাবে) হুঁ…

স্ত্রী : (কিছু বলবার জন্য প্রস্তুতি নেয়।)

ভদ্রলোক : চাকর দুটো তা হলে আজ ছুটি নিয়েছে…

স্ত্রী : (দু চুমুক চা খেয়ে রুমাল দিয়ে ঠোঁটমুছতে মুছতে) সরদার সাহেবের ডাইরেক্টরেট-এ তা হলে এইসব চলেছে !

ভদ্রলোক : (হাসির আবেগে) হতভাগাগুলোর এতেই তো যত ফুর্তি। এরা ভাবে 'মেজরিটিই' সব— তারাই এদেরকে গাধা থেকে গোরু বানিয়ে দেবে ! হতভাগাগুলো এটুকু বোঝে না যে এখন 'মেজরিটি' কথাটার মানেই বদলে গেছে। মেজরিটি বলতে কি থোড়াই এই আধমরা কেঁচোগুলোকে বোঝায় ! নেতৃত্বের শক্তিই সারা পৃথিবীকে টলিয়ে দেয়, আর সে জিনিস শুধু একটি মাত্র

লোকের মধ্যেই থাকে। (**ভদ্রমহিলা চুপচাপ কাপে চা ঢেলে তাতে দুধ ঢালতে থাকেন। তারপর কাপের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক রুটিতে মাখন লাগাতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সব চুপচাপ।**)

ভদ্রলোক: সরদার সাহেব, রাজা সাহেব, বাবু সাহেব, সবাই-এর সঙ্গেই এই এক মুশকিল। এরা জীবনের আর্টটাকে বুঝতে চেষ্টা করে না। নিরস্ত্র শত্রুর মত অসহায়ভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। ওরা যখন দেখে যে আমি ওদের কাছে ভিক্ষে চাই না, ওদের পা চাটি না, ওদের কাছে ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকি না বা ওদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি না, তখন ওরা একেবারে হাঁ হয়ে যায়। (**মুখ থেকে চায়ের কাপটা নামিয়ে হাসতে থাকে**) এদের ঘিলুতে তো বুদ্ধিসুদ্ধি এক বিন্দুও নেই। যখন ধাক্কা খায়, ঠোক্কর খায় তখনই দাঁড়িয়ে উঠে মুখ বিকৃতি করে। (**গলার স্বর নামিয়ে**) আসলে, এইসব তথাকথিত সম্মানিত লোকগুলো হচ্ছে গাধা, একেবারে আস্ত এক-একটা গাধা! তবে হ্যাঁ, এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থায় ওরা অবশ্যই লাভবান হয়, বেশ একহাত খেলে নিতে পারে। ডিভিডেণ্ট যদি কম হয়, তো বাবুদের তখন গোসায় মুখ ফুলে যায়; কলেজে পড়ুয়াদের কায়দায় কেতাবী ঢঙে স্ট্রাইকের হুমকি দেয়, বাবুদের মুখ ভারী হয়ে যায়, গোসায় একেবারে ফেটে পড়েন। (**নাটকীয় ঢঙে হাত নাড়তে নাড়তে**) আমি একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছি, আগামী তিন বছরে আমি এক পয়সাও ডিভিডেণ্ট দেব না। ওরা আমার কাঁচকলা করবে। (**বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়।**)

(**ভদ্রমহিলা চা-পান শেষ করে নিজের ঘড়ির দিকে তাকান, ভ্রূ কুঁচকে ভদ্রলোকের দিকে তাকান। ঘরে আবার নিস্তব্ধতা ফিরে আসে।**)

ভদ্রলোক: (**একটু উদাস ভাবে**) তা হলে চাকর ছুটো আজ গায়েব? এখনকার মত তো নাহয় মেমসাহেব চা বানালেন,

কিন্তু সন্ধেবেলায় কি হবে ? আমার মিটিং শেষ হতে তো প্রায় আটটা বাজবে।

স্ত্রী : (**রুমালে হাত মুছতে মুছতে**) তা হলে··· (**হঠাৎ**) আমি চলি।

ভদ্রলোক : কোথায় ? কোথায় যাবে ? (**রুমাল নাড়াতে নাড়াতে বাইরের দিকে তাকিয়ে**) ওখানে ? (**বাইরের দিকে তাকিয়ে**) না কি বাজারে, সপিং-এর জন্যে ?

স্ত্রী : না, এখন লক্ষ্ণৌ যাব। ফিরতে সেই শেষ জি. আই. পি. ।

ভদ্রলোক : লক্ষ্ণৌ ? শেষ জি. আই. পি. । কিন্তু যাচ্ছ কেন ?

স্ত্রী : (**চা শেষ করে**) এমনি যাব, একটু ঘুরে আসব। সরদার সাহেবের স্ত্রী মিসেস নিহাল, আমি আর মিসেস মিত্র যাচ্ছি—মিসেস মিত্রের একটু কাজও আছে। বোধহয় রেডিও কিনতে যাবে।

ভদ্রলোক : (**হাত মুছতে মুছতে**) তাই বলো, (**একটু থেমে**) তা গাড়ী নিয়ে যাচ্ছ না কেন ?

স্ত্রী : না, না, গাড়ী কি হবে ? দেরী হলে বড় জোর জি. আই. পি. । জি. আই. পি.ই বোধ হয় শেষ গাড়ী, তাই না ?

ভদ্রলোক : (**পকেট থেকে সোনার পকেট ঘড়ি বার করে একটু মুছে নিয়ে**) হ্যাঁ, জি. আই. পি. এখানে আসে সোয়া দশটায়। তোমার বাড়ী পৌঁছোতে তা হলে দশটা পঁচিশ। ঠিক আছে, গাড়ীতে করে তোমায় পেট্রল পাম্প অবধি পৌঁছে দেব। ঐ মিল্‌খিরামের পেট্রল পাম্পের কাছে। খাবার জন্য এক কাজ করা যাবে, গাড়ীতে আমি টিফিন ক্যারিয়ার রেখে দেব। তুমি স্টেশন থেকে মাংসের কারী বা সবজী-টবজী নিয়ে আসবে। আর রুটিটা ঘরে তৈরি করে নিলেই চলবে। (**ঘড়ি পকেটে রেখে, পকেট হাতড়ে একটা সস্তা সিগারেট কেস বার করে। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।**) এবার সরদার সাহেব ধাতস্থ হবেন। কোন প্রিন্সিপ্‌ল্

নেই, কিছু নেই...

স্ত্রী : একেই না বলে জীবন! যাক্, তা হলে জি. আই. পি. এখানে সাড়ে দশটায় পৌঁছয়?

ভদ্রলোক : (**আবার ঘড়িটা বার করে মুছতে থাকে**) না, সোয়া দশটায়। আর জি. আই. পি.—এর গাড়ী কখনও লেট হয় না—এ আর ই. আই. আর. নয়। (**যেন নিজের কোন জিনিসেরই প্রশংসা করছে।**) বুঝলে, যখন যে কাজটি করা দরকার ঠিক তখন যে তা করতে পারে, ছুনিয়া তারই হাতে— পৃথিবীর যত ধনসম্পত্তি, যত সুখ সব হচ্ছে তার যে নিজের জায়গায় ঠিক আছে। যে নিজের কাজগুলো ঠিক মেশিনের মত শেষ করে ফেলতে পারে! বার্নার্ড শ' আমেরিকার একজন মস্ত বড় লেখক, উনি বলেন...

স্ত্রী : (**একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে**) মিসেস নিহাল তো নিজের গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন। আচ্ছা, তুমি মিটিং-এ কখন যাবে?

ভদ্রলোক : (**একটু আশ্চর্য হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে**) সাড়ে চারটে! না, তা হলে আর বসা চলে না। (**গুন গুন করতে থাকে**) চারটে বেজে সতেরো— ডিউক কোম্পানির অফিসে লাগবে তিন-চার মিনিট—চারটে একুশ— ঠিক আছে, চলো, তোমাকে পিণ্ডী পর্যন্ত পৌঁছে দিই, ওখান থেকে নিহালের বাড়ী মাত্র মিনিট-ছুই।

স্ত্রী : (**হাই তুলে**) বেশ, (**দাঁড়িয়ে যায়**) এই শাড়ীটা পরে যাব, নাকি অন্য একটা?...

(**একটু ঘুরে শাড়ীটা দেখতে থাকে।**)

ভদ্রলোক : (**সিগারেট-এ কয়েকটা টান মেরে সিগারেট ফেলে দেয়**) তোমার যা মর্জি। কিন্তু আমার মাথার দিব্যি, বলো তো লক্ষ্ণৌ-এ কি আছে?

স্ত্রী : (**মুচকি হেসে**) লক্ষ্ণৌ-এ অনেক কিছু আছে—ছোট ইমামবাড়া, বড় ইমামবাড়া, চিড়িয়াখানা, হজরতগঞ্জ, আমীনা…

ভদ্রলোক : না, আমি বলছি, আজ সন্ধেবেলার প্রোগ্রাম কি ?

স্ত্রী : (**যেতে যেতে**) সন্ধেবেলার প্রোগ্রাম ? কোন প্রোগ্রাম নেই।

ভদ্রলোক : (**যেন কোন-একটা বিরাট কিছু কাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে**) এখানে এসো, বসো। (**স্ত্রী ঘুরে এসে দাঁড়ায়**) বসো, এখানে বসো। কিছুদিন হল দেখছি, তোমার যেন কিছু একটা হয়েছে! তোমার মন-মেজাজ ভালো যাচ্ছে না, তা আমি লক্ষ করেছি। তার ওপর ছুটিতে নির্মল আসবে, মোনীও হয়তো এখানেই চলে আসবে। আর হ্যাঁ, জানো তো মোনী এবার বি. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। কিন্তু তোমার হয়েছেটা কি বলো তো ?

স্ত্রী : হবে আবার কি ? কিছুই হয় নি। আমার মনমেজাজ নিয়ে তুমি ভেবে কী করতে পারো শুনি ?

ভদ্রলোক : কিছু করাকরির ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কি ? দেখো, মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, মানুষের যে সামান্য শক্তিটুকু আছে তাকে কি করে সে কাজে লাগাবে তাই নিয়ে। সেই আদিম যুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি মানুষ নিজেকে সুখী বা দুঃখী যাই করুক তার সবই হচ্ছে মানুষ তার নিজের শক্তিটুকুকে কাজে লাগাবার জন্যে। সুখ বা দুঃখ এতই কৃত্রিম ক্ষণস্থায়ী জিনিস যে একদিন দেখবে সুখ বা দুঃখ তৈরি হয়ে শিশিতে করে বিক্রি হচ্ছে! শিশিতে! আর সেইজন্যেই এই সব ভাঁওতাবাজগুলোকে আমি ঘৃণা করি, দারুণ ঘৃণা! এরা শুধু জীবন সংগ্রামে পরাজিতই নয়, পরাজয়টাকে নিয়েও এরা ফুর্তি করছে, এই নিয়ে নাচকুঁদ করছে!

স্ত্রী : আচ্ছা, ওঠো এবার। আমাকে আবার গাড়ীতে করে পৌঁছে দেবে তো?

ভদ্রলোক : (ঘড়ি বার করে মুছতে থাকে) অসম্ভব! তুমি বরং মিসেস নিহালের অপেক্ষায় থাকো।

(দ্রুত ভিতরে চলে যায়, স্ত্রী ওখানেই বাইরে ঘুরতে ঘুরতে বসে পড়ে। একটু পরেই ভদ্রলোক ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। বগলে পুরানো ফেল্‌টের হ্যাট চেপে, হাতের ছোট লাঠিটাকে রুমালে মুছতে মুছতে)

ভদ্রলোক : সোয়া দশটায় তুমি স্টেশনে পৌঁছে যাবে, ওখান থেকে মিলখীরাম পর্যন্ত লাগবে পাঁচমিনিট— দশটা বিশ— এই সাড়ে দশটা পর্যন্ত— না দশটা চল্লিশ পর্যন্ত তুমি এখানে টেবিলে ডিনারের জন্য অপেক্ষা কোরো। আমি স্টেশনেই আসতাম, কিন্তু মিস. মিত্র— না থাক্, তুমি আবার চটে যাবে— **(জোরে হাসি, যাতে স্ত্রী কিছু মনে না করতে পারে)** আচ্ছা চলি! **(সিঁড়ি দিয়ে জোরে নামতে নামতে চলে যায়। স্ত্রী সেই একইভাবে বসে থাকে। একটু পরে আনমনে উঠে ভিতরে চলে যায়। স্টেজের ওপর হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে। মধ্যে দুবার আলো জ্বলে, দেখা যায় খালি চেয়ার-টেবিল পড়ে আছে। প্রথমে দেখা যায় ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজেছে পরে সোয়া ন'টা।)**

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

(মাঝারি ধরনের একটা ক্লাব ঘর। ঘরে বেশ হাই পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। টেবিলের ওপরটা তাস, অ্যাশট্রে ইত্যাদিতে ভরে আছে। চেয়ারগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো। ঘরের এক কোণে একটা বড় ফ্রেঞ্চ উইনডো (জানলা)—এর সামনে সোফার ওপর জনা-তিনেক লোক বসে আছে। শুধু ওদের পিঠ দেখা যাচ্ছে। পাশেই একটা চেয়ারে বসে সুন্দর জামা-কাপড় পরা এক যুবক সামনের একটা ছোট টেবিলে তাস বাটছে। জানলার মধ্যে দিয়ে ছবির মত তারায় ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালের বড় ঘড়িতে পৌনে ন'টা বেজেছে। কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলছে না, তবুও ঘরটা পুরোপুরি নিস্তব্ধ নয়।)

প্রথম ব্যক্তি : এই একঘেঁয়েভাবে আর কতক্ষণ ব্রীজ খেলা যায় ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (যেন ঘুম পাচ্ছে— হাই তুলে) কি আর করা যাবে ! এসো, অন্য কেউ এবার ঝাণ্ডা তুলুক।

তৃতীয় ব্যক্তি : আরে, এরা আসছেও না দেখছি। (চেয়ারে উপবিষ্ট যুবকের দিকে ঘুরে) নাও ভাই, তুমি এবার মিশ্রিত সমাজ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলো। (সবাই ঘুরে যুবকের দিকে তাকায়। তিনজনেই মধ্যবয়েসী এবং একটু মোটা—পরনে দামী কাপড়জামা এবং সকলেই বেশ হাসিখুশি)

যুবক : (লজ্জিতভাবে) আমি কি করে বলব। আমার বউ এখানে এলে, তা হলে নাহয় দেখা যেত। (তিনজনেই হঠাৎ 'হুঁ' করে ওঠে এবং ঘুরে বসে। আবার চুপচাপ। যুবক আবার তাস ফাটাতে থাকে)

প্রথম ব্যক্তি : (পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে আবার রেখে দেয়।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**ঘুরে ঘড়ি দেখতে দেখতে**) শ্রীচাঁদ হতভাগা, নিশ্চয়ই কোথাও গায়েব হয়ে গেছে !

প্রথম ব্যক্তি : না, না, হয়তো কোথাও ফেঁসে গেছে। মাকড়সার মত ওর তো একশোটা চোখ !

যুবক : না, না, ও নিশ্চয়ই আসবে, আমাকে নেমন্তন্ন করে গেছে।

তিনজনেই : (**ঘুরে বসে**) আচ্ছা ! তা হলে ভাড়া-করা বউটা আজ নেই !

(**পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়**)

যুবক : তাই নাকি ? এরকম জানলে আমি এতক্ষণ বসে থাকতাম না।

প্রথম ব্যক্তি : এই শ্রীচাঁদকে দেখো, ওকালতি ছেড়ে যখন ও ব্যবসা করতে এল তখন ও যে কোন দিন দাঁড়াবে এমন কথা আমি ভাবিই নি— কিন্তু এখন ও একটা কোম্পানির সর্বেসর্বা। (**হাসতে থাকে**)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**হাই তুলতে তুলতে এবং বুড়ো আঙুলে চুটকি বাজাতে বাজাতে**)

ভাগ্য বলে যে একটা জিনিস আছে— এ কথাটা যেন দিন দিন ক্রমেই বেশী বেশী করে বিশ্বাস হচ্ছে।

(**যুবক তাস রেখে দিয়ে একাগ্র ভাবে এদের কথা শুনতে থাকে।**)

তৃতীয় ব্যক্তি : (**উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে**) এসো ভাই, এবার যাওয়া যাক। আসুন মিঃ সহায়, আপনাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিই।

প্রথম ব্যক্তি : আরে, বোসো না, শ্রীচাঁদ অবশ্যই আসবে।

যুবক : আর উনিও তো আপনাকে গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছে দেবেন বলেছেন তাই না !

তৃতীয় ব্যক্তি : (**বসে পড়ে**) আচ্ছা, তা হলে তো একটু বসতেই হয়। (**যুবক কিছু একটা কথা পাড়তে চায়**)

যুবক : আজ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়েছে।

তিনজনেই : কি হয়েছে? মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, আচ্ছা?

(তিনজনের কেউই এ কথায় খুব একটা উৎসাহ দেখাতে চায় না। কিন্তু তবুও এ ব্যাপারে কথা বলে চলে।)

প্রথম ব্যক্তি : শ্রীচাঁদ এ ব্যাপারে অনেক কিছু বলছিল। **(হাসতে থাকে। সবাই ওর দিকে তাকায় শোনবার উদ্দেশ্যে।)**

প্রথম ব্যক্তি : (কোর্টের কলার ঠিক করতে করতে) আমাকে সঙ্গে করে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল সেদিন··· উনি মীরাটের কথা পাড়লেন। ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী ভাষায় বলছিলেন, "আরে সাহাব, ইনকো তো এইসে হী ছোড় দেনা চাহিয়ে, ইয়ে তো হম লোঁগো কে খিলৌনে হ্যাঁয়।"

(তিনজনেই একটু কেতাবী ঢঙে হাসে। যুবকও তাতে যোগ দেয়।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : যে-কোন দেশে, যে-কোন গভর্নমেণ্টের সামনে ঐ একই সমস্যা— কি করে ট্যাক্স কমানো যায়। ট্যাক্স কম করে দাও দেখবে প্রজার অবস্থা আপনা থেকেই ভালো হবে।

প্রথম ব্যক্তি : আমাদের মত কোন লোক যদি রাশিয়ায় গিয়ে দেখে, রাশিয়ানরা এ-যাবৎ কী করেছে, তা হলে রাশিয়ানদের সামনে আমাদের একেবারে তুচ্ছ মনে হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি : সত্যি! ভগবানের দিব্যি?

(তিনজনেই হেসে ওঠে। বাইরের দরজায় টোকা মারার শব্দ। সকলে বাইরের দিকে তাকায়। প্রথম দৃশ্যের পুরুষের বেশ খোশ মেজাজে নিশ্চিন্তে প্রবেশ।)

পুরুষ : (নিজের হ্যাট্‌ এবং হাতের লাঠিটা টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে) তা হলে তোমরা শুধু শুধু বসে আছ? ব্রীজ শেষ হয়ে গেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : সহায় আজ আবার হেরেছে।

পুরুষ : (**হাসতে হাসতে**) সহায়, তুমি হারতে একেবারে ওস্তাদ। (**সবাই সিট ছেড়ে উঠে এসে টেবিলের কাছে জড়ো হয়।**)

প্রথম ব্যক্তি : জিত সব তোমারই!

পুরুষ : আরে, হারও যা আর জিতও তাই। এ নিয়ে ভুলেও কেউ কখনও মাথা ঘামায় না। সম্মানের সঙ্গে জেতা, তাকেই না জেতা বলে! জীবন হচ্ছে একটা আর্ট একটা শিল্প— সবচেয়ে বড় আর্ট।

তৃতীয় ব্যক্তি : (**হাই তুলতে তুলতে**) চলো ভাই, অনেক রাত হ'ল।

সবাই ঘড়ির দিকে তাকায়। ভদ্রলোক পকেট থেকে সোনার হাতঘড়িটা বার করে সেটাকে মুছতে থাকেন।) চলো ঘর অবধি আবার পৌঁছে দিতে হবে।

(**তিনজনেই যে যার হ্যাট উঠিয়ে নেয়। কেবল যুবকের মাথায়ই কিছু নেই।**)

প্রথম ব্যক্তি : এই চৌকিদারটা এখন আবার কোথায় মরতে গেল!

দ্বিতীয় ব্যক্তি : মরতে গেল? বেশ বলেছ। নতুন বিয়ে করেছে আর বলছ কিনা মরতে গেল। একটু ভেবেচিন্তে কথা বলো।

(**সবাই হাসতে থাকে। কেবল যুবককেই একটু লজ্জিত মনে হয়। যুবক সকলের পিছনে বাইরে আসে। বাইরের করিডোর থেকে দু-তিনবার হাঁক পাড়ে 'চৌকিদার'! তারপর মোটর স্টার্ট হওয়ার শব্দ। আবার সব চুপচাপ। স্টেজ অন্ধকার হয়। মধ্যে দু-তিনবার আলো জ্বলে। চাষাভুষো ধরনের চেহারার এক চৌকিদারকে টেবিল ঝাড়তে এবং জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়িয়ে জড়ো করতে দেখা যায়।**)

(তৃতীয় দৃশ্য)

(প্রথম দৃশ্যের ঘরের করিডোর— লম্বা, সাধারণত বারান্দা যা হয় তার চেয়ে একটু বেশী। ঘরের সামনে বারান্দার থামে কলিং বেল লাগানো। সব দরজা বন্ধ। দরজাগুলোর সামনে কয়েকটা ভাঙা ভাঙা চেয়ার পড়ে আছে। সিঁড়ির ওপর বেশ বড় সাইজের একটা লোমশ কুকুর শুয়ে আছে। দৃশ্যের শুরুতে কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময়ই গৃহস্বামী ও যুবককে সিঁড়িতে দেখা যায়। যুবক ক্লাব থেকে ফিরছে। কুকুরটা মাথা উঠিয়ে নীচুস্বরে একবার গোঁ গোঁ করে ওঠে। তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে করিডোরে গিয়ে বসে। স্টেজে কম আলো।)

পুরুষ : (সিঁড়িতে উঠতে উঠতে) বলো, বলো— কি হয়েছে।

(কুকুর জিভ নাড়তে থাকে। হঠাৎ কুকুরটা সিঁড়ি থেকে নেমে বাংলোর পিছনের দিকে যায়। যুবক সিঁড়ি থেকেই ওর দিকে ঔৎসুক্যভরে তাকিয়ে থাকে এবং হাসতে থাকে। তাড়াতাড়ি কুকুরটা আবার ফিরে আসে এবং জোরে জোরে জিভ নাড়তে থাকে।)

পুরুষ : এই রে! বউ কি ঘরের চাবিটা আমায় দিয়ে গেছল না কি অন্য কোথাও রেখে গেছে! যত নষ্টের গোড়া হল এই চাকরটা? আমাকে বেটার ছেলে একেবারে জ্বালিয়ে মারল! রোজ রোজ বাবুর ছুটি— আর ছুটি। হতভাগা এটুকু জানেনা...

(যুবক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। পুরুষ খুঁজে খুঁজে সুইচটা জ্বালে। তারপর যুবকের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ে।)

পুরুষ : (হঠাৎ হেসে ওঠে) সুইচটা ঘরের ভেতরে হলেই হয়েছিল আর কি?

যুবক : যাক্‌, এখানেই একটু বসা যাক্‌।

পুরুষ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাড়ে ন'টা তো বাজল (**ঘড়ি বার করে মুছতে থাকে।**) ন'টা সাতাশ। আমার বউ সাড়ে-দশটা নাগাদ এসে যাবে। খাবার ওই নিয়ে আসবে। (**হাই তুলে**) হ্যাঁ, তারপর— বলো আর সব খবরাখবর কি?

যুবক : (**খুশি খুশি ভাব নিয়ে**) আপাতত বাড়ীর সমস্যা মিটেছে।

পুরুষ : (**জুতোর আওয়াজ করতে করতে**) বাড়ী-টাড়ী তো হল, তা তুমি বিয়ে-থা করলে না কেন বলো দিকিন?

যুবক : (**সংযতভাবে**) করলাম না— না এর কোন কারণ নেই।

পুরুষ : (**মুচকি হেসে**) সত্যি বলছি, তোমাদের মত ছেলেছোকরাদের দেখে আমার খুব হাসি পায়।

যুবক : (**যেন এরজন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না।**) বেশ বলেছেন! (**হাসতে থাকে**)

পুরুষ : (**সামলে নিয়ে**) না, না, ইয়ার্কি করছি না। তোমরা আমাদের ঠিক পরের জেনারেশন। কিন্তু তোমরা কি করেছ? তুমিই বলো, তোমরা তুনিয়াকে কি দিয়েছ—? বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলছি না— ওটা একটা আলাদা ব্যাপার— বিজ্ঞান কোন বিশেষ জেনারেশন বা কোন সমাজের একচেটিয়া জিনিস নয়। বিজ্ঞান নিজেই ধীরে ধীরে নিজেকে সুসম্পূর্ণ করে তুলছে। আমি জানি, তুমি আমার কথাগুলোকে নেহাৎ সেকেলে বিচার করে মনে মনে হাসছ। কিন্তু তুমিই বলো, তোমাদের বিচারে তোমরাই বা কি পর্বত উল্টে ফেলেছ?

যুবক : কথাটা হচ্ছিল বিয়ের— তাই না?

পুরুষ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিয়ের কথাই বলো না। তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে প্রত্যেকটি মানুষেরই জাতির জীবনে একটা

ভূমিকা আছে। পৃথিবীটা হচ্ছে একটা দোকান আর প্রত্যেকটি সাবালক মানুষই হচ্ছে সেই দোকানের অংশীদার। এবং যে নিজের এই কর্তব্যটুকু করার চেষ্টা করে না, তার মানবজন্মই বৃথা। (**উত্তেজিতভাবে**) আমি বলছি, আজকালকার বইপত্তরে যা সব শিক্ষা দেয় সব বাজে— সব মিথ্যে ! সব মিথ্যে !

যুবক : আমি বিয়ে করি নি... করি নি। কেননা কখনও স্ত্রীলোকের বুদ্ধি...

পুরুষ : দেখ ভাই, বিয়েটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ও নিয়ে খেলা চলে না। দেখো, একটা কারখানা চালাতেও কত বিজ্ঞান কত আইন ইত্যাদির দরকার হয়— কিন্তু তাই বলে সবকিছু ভগবানের ওপর ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা কেন ? নিজের সামান্যতম শক্তিকে কেন কাজে লাগাবে না ? তুমি বলছ, তুমি মেয়েদের ঠিক বোঝ না। এ একেবারে বাজে কথা। বোঝবার দরকারটা কি ? মেশিনের একটা অংশ আরেকটা অংশকে কখনও মাপজোখ করতে কিম্বা বুঝতে চায় না। স্ত্রী-পুরুষও সেইরকম জীবন-মেশিনের ছুটো অংশবিশেষ !

যুবক : ঐ কারখানা বা মেশিন— ও ছুটো তো একই জিনিস।

পুরুষ : আজ্ঞে না। আমাকেই দেখো-না, আমার প্রথম পক্ষের বউ ছিল। আমার বিরুদ্ধে তার সব সময় নালিশ অভিযোগ। কিন্তু অসুখে পড়তে যখন দেখল যে আমি ওর মাথার কাছে সব সময় হাজির তখন তার সব নালিশ সব অভিযোগ খতম। আমার নাম করতে করতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। এখনকার যে বউ, এ হল দ্বিতীয় পক্ষের। আমাদের ছেলেপুলে নেই। একসঙ্গে ক্লাবে যাই না, সপ্তায় একবার মাত্র সিনেমা যাই। পাহাড় জঙ্গলে বেড়াবার মত সময় আমার নেই। কিন্তু আমরা বেশ ভালোই আছি— কখনও কোন ঝগড়ঝাঁটি নেই। আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হল, আমাদের মধ্যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে এবং সে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এ কোন খাদ নেই। ওর অসুখ করলেই আমি

একাধিক ডাক্তার এনে হৈ-চৈ ফেলে দিই না। আবার আমার অসুখ করলেও ও একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দেয় না। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার বউ স্টেশনের বই-এর দোকানে কোন্ বইটা দেখছে তা আমি জানি। বউ স্টেশনে গাড়ী করে গিয়ে ঠিক দশ মিনিট আগে পৌঁছে গিয়েছিল।

যুবক : কিন্তু ধরুন, মেশিনের একটা অংশ যদি একবার বিগড়ে যায়!

পুরুষ : (**হাসতে হাসতে** (তাহলে সেই অংশটাকে বদলে ফেলবে, নিজেকেই বদলে নেবে। বই জিনিসটা কি জানো? তবে শোনো। আমি তুলো ব্যবসা সম্বন্ধে ছোট একটা বই লিখেছি —বইটাতে লোকে রোজ যা ভাবে বা কথাবার্তা বলে, শুধু সেই কথাগুলোই লিখেছি। মুশকিল বাধল কি যে বইটা নিয়ে একেবারে হৈ-হৈ পড়ে গেল; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বইটাতে আমি যা যা বলতে চেয়েছি সেগুলোকে কার্যকরী করার কথা আমি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি। (**যুবক কিছু বলবে এই আশায় পুরুষ হঠাৎ থেমে যায়। যুবক মাথা নীচু করে চুপচাপ বসে থাকে। কুকুরটা এইসব হৈ-হট্টগোল শুনে পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্যে সব চুপচাপ।**)

যুবক : (**মাথা তুলে**) কারখানা, পার্ট্স্—ওসব ঢের হয়েছে!··· (**পুরুষ কিছু বলবার জন্যে তৈরি হয়, এমন সময় দরজায় খট্‌খট্ শব্দ হয়। কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে দরজার দিকে দৌড়ায়। পুরুষ কুকুরটাকে ডাকতে থাকে আর করিডোরে গিয়ে হাঁক পাড়ে—'কে?' আবার কুকুরকে ডাকতে থাকে। একটা চাপরাশি সাইকেল নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সেলাম করে সে একটা খাম পুরুষের হাতে দেয়।**)

পুরুষ : কি ব্যাপার, তুমি কোথা থেকে আসছ?

(**ঘড়ির চেনের চাকু দিয়ে খামটা খুলে আলোর দিকে যায়।**)

চাপরাশি : আমি নিহাল সাহেবের ড্রাইভার। মেমসাহেব বলে দিয়েছেন যে উনি কাল আসবেন।

পুরুষ : (**চিঠি থেকে মুখ তুলে**) কাল আসবে? তুমি কি করে জানলে?

চাপরাশি : সব মেমসাহেবই আজ ওখানে থাকবেন। এবং আমাকে বলে দিয়েছেন···

পুরুষ : (**পায়চারি করতে করতে**) আর খাবার··· বাড়ীঘর··· আরে, আমার গাড়ীটা মিলখীরামের পাম্পেই রয়েছে যে!

(**চাপরাশি সেলাম করে চলে যায়। কিছু দূরে গিয়ে বলে—**)

চাপরাশি : হুজুর! আপনার কুকুরটা বড় জবরদস্ত কুকুর! বিলিতি কুকুর তাই না?

পুরুষ : (**হতাশভাবে**) তা হলে···তা হলে···!

যুবক : (**উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে**) চলুন, আমার হোটেলে চলুন। আপনার কারখানায় আজ স্ট্রাইক।

পুরুষ : কিন্তু, আমার গাড়ীটা যে মিলখীরামের পাম্পে···

(**আবার চিঠিটা আলোর নীচে গিয়ে পড়তে থাকে।**)

—পর্দা পড়ে—

ঘর ভাঙে

—বিষ্ণু প্রভাকর

চরিত্র :

মনীষা

বিবেক

দীপ্তি

বিশ্বজিৎ

করুণা

অশোক

শরৎ

ইন্দু

মধ্যবিত্তের বাড়ী। বাড়ীতে একটা আধুনিক ধরনের ঘর। ঘরের মধ্যে একপাশে ডাইনিং টেবিল ও কয়েকটা চেয়ার আর অন্যপাশে সোফা ইত্যাদি রাখা আছে। মাঝখানে একটা পরদা দিয়ে ঘরের একপাশ অন্যপাশ থেকে আলাদা করা। পরদাটা অবশ্য প্রায় সময়ই তোলা থাকে। ঘরের যে পাশে সোফা ইত্যাদি আছে, সে পাশটা খাবার জায়গার চেয়ে বড়। ডাইনিং টেবিলটা নতুন। কিন্তু ডাইনিং টেবিলের দুপাশে লাগানো চেয়ারগুলো পুরোনো এবং তার মধ্যে দু-একটা ভাঙা চেয়ারও আছে। টেবিলের ওপর কয়েকটা বই এবং পত্রিকা জড়ো করা আছে। আর চেয়ারগুলোর কোনটার উপর একটা তোয়ালে, কোনটার ওপর একটা জামা আবার কোনটার ওপর হয়তো একটা বুশসার্ট রাখা আছে। বাঁদিকে একটা আলমারি— তার মধ্যে খাবারদাবার জিনিসের কয়েকটা কৌটো টৌটো দেখা যাচ্ছে। খাবার ঘরের সোফাটা তত পুরোনো নয়, কিন্তু তার রেক্সিনটা নোংরা হয়ে গেছে। মোড়া এবং তেপায়াটার অবস্থাও সেই রকম। তে পায়াটার ওপর গোটা দুই সাপ্তাহিক পত্রিকা খোলা পড়ে আছে। ভেতরে যাবার জন্যে দুটো রাস্তা —একটা সামনের দিক দিয়ে অন্যটা ডান দিক দিয়ে। বসবার ঘরটার (অংশটায়) ডানদিকে বাইরে থেকে আসার দরজা। বাঁদিকের কোণে একটা আলমারী, তাতে কিছু কিছু বইপত্র আর আলমারির মাথায় কয়েকটা খেলনা। এদিকে একটা

টেবিল, টেবিলের ওপর অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটা টেলিফোন রাখা আছে। পরদা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সব কিছু দেখা যায়। ঘরে কেউ নেই। হাওয়ায় টেবিল থেকে কয়েকটা কাগজ উড়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চাৎভূমিতে আতশবাজির আওয়াজ আর বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গণ্ডগোলের আওয়াজ। একটু পরে 25-26 বছরের একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢোকে। মেয়েটির নাম মনীষা। বেশ সুন্দরী, তার শাড়ী, চপ্পল, ব্যাগ এবং লিপস্টিক সবকিছুই বেশ ম্যাচ করা। মুখে একটু গম্ভীর গম্ভীর ভাব। এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে সে দরজার কাছে এসে পোঁছায়।

মনীষা : কেউ নেই। যাক্ তাহলে এখন যাওয়া যায়। আপনারা হয়তো ভাবছেন কে এই মেয়েটা আর কোথায়ই বা চলল? সেই কথাই তো হচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে দেখে কি এতই বোকা বোকা মনে হচ্ছে যে আমার ভালোমন্দ আমি বুঝতে শিখি নি, ইচ্ছেমত যেখানে খুশী যেতে পারি না। না, মোটেই তা নয়। আমি কি করব না-করব তা ঠিক করে দেবার অধিকার আমি অন্য কাউকে কিছুতেই দিতে পারি না, কখনও দিতে পারি না। এই আমি চললুম দেখি কে আটকায়?

(মনীষা সোজা ওখান থেকে চলে যায়। একটু পরে গানের সুর কানে আসে— সুর চড়া হয় আবার নেমে আসে। গুন গুন করতে করতে এক যুবক বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢোকে। বছর চব্বিশেক বয়সের এই যুবকের নাম বিবেক। আধুনিক ফ্যাসানে লম্বা লম্বা চুল, জুলফী আর দাড়ি রেখেছে। পরনে চোঙা পাজামা আর রঙীন একটা পাঞ্জাবী। মুখে উপেক্ষা আর বেপরোয়া ভাবের ছাপ। সোজা ডাইনিং

টেবিলের কাছে এসে কিছু যেন সে খুঁজতে থাকে। তারপর একটু মুচকি হেসে খামটা খুলতে থাকে।)

বিবেক: আচ্ছা, তাহলে ওর উত্তর এসে গেছে। জয় ভগবান, দেখি, কি লিখেছে? **(খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করে পড়তে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে মুখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যায়)** "আপনার দরখাস্ত আমরা ভালোভাবে দেখেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনার উপযুক্ত কোন কাজ এখন আমাদের কাছে নেই। আপনার সহযোগিতা কামনা করে..." **(ক্ষেপে গিয়ে)** বদমাশ, হারামজাদা কোথাকার!...কেন আমার কি কোন যোগ্যতা নেই নাকি? কিন্তু থাকেই যদি, তাহলে তা কোন কাজে লাগছে না কেন? **(দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে চিঠিটা ফেলে দিয়ে দর্শকদের দিকে দেখতে থাকে।)** আমার যোগ্যতা যদি কিছু থাকে, তা হ'ল দরখাস্ত লেখবার যোগ্যতা। হায় রে! আজকালকার যুবক যেন দরখাস্ত লেখার একটা মেশিন হয়ে গেছে। **(হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে)** কিন্তু আমি মেশিন হতে পারব না। দরখাস্ত লিখব না। আমি...**(হঠাৎ অনেকগুলো কাগজ তুলে নিয়ে এদিক-ওদিকে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে একটি মেয়ে ঘরে ঢোকে। বয়স বছর বিশেক হবে। গায়ে একটা মলমলের পাতলা পাঞ্জাবী, তার ওপর লাল একটা হাফ্ সোয়েটার। পরনে হলদে রঙএর বেলবটম। পায়ে ঘুঙুর। খোলা চুল সারা পিঠ জুড়ে ছড়ানো। ডাগর ডাগর চোখ। হাতে চিরুনি নিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মুচকি হেসে বলে)**

দীপ্তি: **(দর্শকদের উদ্দেশ্যে) দেখুন, বিবেকদার যত রাগ দরখাস্তের ওপর। বিবেকের কাছে গিয়ে বিবেকের কাঁধে হাত রেখে)** এই বিবেকদা, তোর দরখাস্ত

লেখা শেষ হবে, না হবে না ? এই, মনে আছে, বাবা যেন তোকে কোথায় যেতে বলেছিল ?

বিবেক : আজ্ঞে না, আমার শুধু এইটুকুই মনে আছে যে বাবা তোকে চুল নিয়ে খেলা করতে বারণ করেছিলেন।

দীপ্তি : আমার চিন্তা তোকে করতে হবে না। বাবা তোকে কোথায় যেতে বলেছেন— তাই ভেবে দেখ্।

বিবেক : আমাকে নয়, তোকেই হয়তো কোথাও যেতে বলেছেন।

দীপ্তি : আমাকে নয়, তোকে।

বিবেক : (**জোর গলায়**) তোকে তোকে...

দীপ্তি : (**ক্ষেপে গিয়ে**) তোকে তোকে। আচ্ছা বাবা, তোকেও বলে নি আমাকেও বলে নি। হ'ল তো ?

বিবেক : ব্যাপারটা হ'ল বাবা আমাকে বলেছে। কিন্তু আমাকে কি বাবার কথা মানতেই হবে।

দীপ্তি : দূর, বোকা কোথাকার ! এতে তো আমাদেরই লাভ। আজ দেওয়ালী— বড়দি, দাদা, বৌদি সবাই মিলে তো ঠাকুর দেখতে যাবে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

বিবেক : (**খুশীর সুরে**) আচ্ছা, এবার বুঝেছি। সবাই কেন তোর এত তারিফ করে ? চল চল দাদা আর বড়দির কাছে চল। ওদের হাতে হাতে একটা করে দরখাস্তও দিয়ে যাব।

দীপ্তি : দরখাস্ত আর দরখাস্ত ! আগে আমাকে ধন্যবাদ দে যে তোকে বুদ্ধিটা আমিই দিয়েছি।

বিবেক : (**ব্যঙ্গভরে হাত জোড় করে**) তোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বলিস তো তোকেও একটা দরখাস্ত দিয়ে দিই।

দীপ্তি : আচ্ছা ঢের হয়েছে, এবার চল। ভাগ্যিস বাবা আসার আগেই মামা বেরিয়ে গেছেন। নাহলে দরখাস্তের কপি দেওয়ার আর-একটা লোক পেতে পারতিস্ ?

বিবেক : নে নে চল্ (**দুজনে হাসতে হাসতে এগোয়,**

একটু পরেই গৃহস্বামী বিশ্বজিৎ বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢোকেন। বয়স 60 থেকে 70 বছরের মধ্যেই হবে। ঢিলেঢালা পাঞ্জাবী, সরু পাজামা। মাথায় গান্ধীটুপি। মুখে হতাশার ছাপ। এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে গজ গজ করতে করতে ভেতরে চলে যায়। একটু পরেই ফিরে এসে ঘরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্য বলতে থাকেন।)

বিশ্বজিৎ : ব্যাপারটা দেখেছেন মশাই। দরখাস্তগুলো এদিক-ওদিক উড়ছে, চারদিকে অব্যবস্থা— যেন ঘরে জনপ্রাণীটি পর্যন্ত থাকে না, মানুষ নয় ভূত বাস করে এখানে। আজ দেওয়ালী বলে কথা, কিন্তু এসব দেখে কি আর মেজাজ ঠিক থাকে! আর কাকে কি বলব উনিও তো বাড়ী নেই, গেছেন পাড়ায় গল্প করতে। আছে এক বিবেক, চারদিকে দরখাস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। আরে বাবা! অন্তত রদ্দির ঝুড়িতে ফেল। (**কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে রদ্দির ঝুড়িতে ফেলতে থাকে।**) কিছু একটা করলে তো আমারও একটু সাহায্য হত, (**দর্শকদের দিকে তাকিয়ে**) কই, তাই কি ছাই হচ্ছে? বড় ছেলেও তো এখন রোজগার করে। কিন্তু ভুলেও কাছে ঘেঁষে না। কি দিনকালই না পড়েছে! আর আমাদের সময়ে কত সদ্ভাব কত সুন্দর বোঝা-পড়া ছিল, একজন রোজগার করত, দশজনে খেত। একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা করত, আর এখন সব গোল্লায় যাচ্ছে। কেউ কারো কাছে থাকতে চায় না। (**বলতে বলতে দরখাস্ত আর পত্রিকাগুলোকে গুছোতে থাকে। তারপর ভেতরে গিয়ে কৌটা থেকে কি যেন বার করে খেতে খেতে একটা পত্রিকা নিয়ে সোফার ওপর বসে পড়ে**) এখন যতক্ষণ বাবুরা না কেউ আসছেন, ততক্ষণ আমাকেই অপেক্ষা করতে হবে। নিজের ঘরে নিজেকেই অপেক্ষা করতে হচ্ছে, হায় রে! (**হতাশা আর ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাসি**

হাসতে থাকে। আলো কমে আসে। একটুখানির জন্য অন্ধকার হয়ে যায়। আবার আলো জ্বলে ওঠে। বিশ্বজিৎ সেই একইভাবে বসে 'মাদার ইণ্ডিয়া' পড়ে চলেছে। ভেতর থেকে বাড়ীর গিন্নী করুণা ডাকতে ডাকতে আসে। বয়স 55 বছরের একটু বেশী। চুল বাঁধা, সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার একটা শাদা শাড়ী পরনে। মুখ-চোখের গড়ন ভালো। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে সারা শরীরে একটা রুক্ষতার ছাপ।

করুণা : হ্যাঁ গো, বলি পুজো কখন হবে? পুজোর জোগাড় করতে করতে হন্নে হয়ে গেলুম, বাপু!

বিশ্বজিত : কি বলছ? ওঃ পুজো, আর-একটু অপেক্ষা করো। সবাই এসে জুটুক তবে না!

করুণা : আমি আর সবুর করতে পারি না বাপু! তিনঘণ্টা ধরে তুমি শুধু আর-একটু অপেক্ষা করো, আর-একটু অপেক্ষা করো এই করছ। আমি বলছি কেউ আসবে না।

বিশ্বজিৎ : কেউ আসবে না, কি রকম? ঘরে লোকই নেই, পুজো হবে কি করে? বছরে তো এই একবারই সবাই মিলে এক জায়গায় বসে জড়ো হই।

করুণা : সবাই মিলে বসে জড়ো হই নয়। সবাই জড়ো হত বলো। বসার আর এখন কারো সময় নেই। ফুরসৎ কোথায়?

বিশ্বজিৎ : (**উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে**) ফুরসৎ! ছোটবেলা থেকে আমি চল্লিশ-পঞ্চাশটা লোকের উপস্থিতিতে পুজো করে আসছি। পুরোহিতের জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ আমার এখনও ভালো করে মনে পড়ে। বাচ্ছাদের চেঁচামেচি, ছেলেছোকরাদের হাসি-তামাসা, বুড়োবুড়িদের সুখদুঃখের গল্প, তারপর সকলের কপালে তিলক লাগানো; লাড্ডুর থালা হাতে করে সবাইকে প্রসাদ দিতে দিতে মা সবাই-এর মধ্যে ঘুরছেন— কি শান্ত পবিত্র ভাব তাঁর চোখে-

মুখে যেন সাক্ষাৎ ভারতমাতা ! সব আমার মনে আছে। (**বলতে বলতে যেন উদাস হয়ে যায়**)

করুণা ঃ ভারতমাতার কথা ছেড়ে এখন নিজের ছেলেলেমেয়েদের কথা চিন্তা করো। তোমার কথা কে শুনছে— সব তো একে একে ভেগে যাচ্ছে।

বিশ্বজিৎ ঃ দোহাই তোমার, তুমি এখন ভেতরে যাও। আমি আর একবার শরতকে খুঁজে আসি। বিবেক গেছে অশোকের কাছে আর দীপ্তিকে পাঠিয়েছি ইন্দুর কাছে।

করুণা ঃ আর মনীষাকে কার কাছে পাঠিয়েছ ?

বিশ্বজিৎ ঃ মনীষাকে ! ওকে তো কোথাও পাঠাই নি। আমার বলা না-বলার থোড়াই ও পরোয়া করে। নিজের ইচ্ছেতেই কোথাও গেছে তা হলে।

করুণা ঃ তাই তো বলছি, নিজের ছেলেপুলেদেরই সামলাতে পার না ? আবার মুখে ভারতমাতার কথা ! তুমি ভেবে রেখেছ, পুজোর জন্যে সবাই তোমার ঘরে আসবে। আমি বলছি, কেউ আসবে না। তোমার নিজের ছেলেপুলেরাও আসবে না।

বিশ্বজিৎ ঃ সবাই আসবে। সব বারেই আসে তো এখন কেন আসবে না ?

করুণা ঃ কেন গত বছর ক'জন এসেছিল ?

বিশ্বজিৎ ঃ গত বছর আসে নি কে বলছে ? হ্যাঁ, কে কে এসেছিল বল তো ?

করুণা ঃ সে-সব কথা মনে করে কি লাভ ? তোমার চার ভাই-এর মধ্যে শুধু অশোকই এসেছিল। তাও শুধু নিজে, আর এবার বলছি দেখো তোমার নিজের ছেলেমেয়েরাও আসবে না।

বিশ্বজিৎ ঃ কেন আসবে না ? (**বাইরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে**) ঐ দেখো ওরা আসছে।

করুণা : (**ওদিকে তাকিয়ে**) এ তো দীপ্তি আর বিবেক। উঃ, চব্বিশ ঘণ্টা ধরে শুধু এদের দুজনের ঝগড়া চলছেই। আর হ্যাঁ বিবেককে বলে দিয়ো, ও যেন ওর দরখাস্তগুলো ঠিক ঠিক করে গুছিয়ে রাখে। সে-ই পারবে ওগুলি সামলে রাখতে, কিন্তু আমার দ্বারা অত-সব হবে না। সারা ঘরটাই যেন দরখাস্ত লেখবার জায়গা। আচ্ছা চলি, পুজো করতে হয় তো চলে এসো তাড়াতাড়ি।

(**বিবেক আর দীপ্তি ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢোকে**)

বিবেক : চিরুনি চুল ঠিক করবার জন্যে রাখে না তো কি চুলগুলোকে এলোমেলো করবার জন্যে রাখে? তুই কি জানিস কি?

দীপ্তি : ঢের জানি। আর জেনে দরকার নেই।

বিবেক : কি জানিস তুই, ছাই?

দীপ্তি : জানি যে তুই বুর্জোয়াদের ভাষায় কথা বলছিস।

বিবেক : চুল ঠিক করাটা বুর্জোয়া ভাষা হল?

দীপ্তি : তা নয় তো কি? এই স্যাম্পু ব্যবহার করিস, ঐ তেলটা মাখিস, এই রকম বিনুনি বাঁধ, ওরকম বিনুনি বাঁধিস নি, বাঙালি বিনুনি, পিরামিডী বিনুনি, অজন্তা প্যাটার্নের বিনুনি, দক্ষিণী ধাঁচের বিনুনি, 'পোনি টেল', বব্ হেয়ার, আরে বাবা! আমার যেমন খুশী তেমন করব। তোর তাতে কি? আমার এই রকমই ভালো লাগে। (**কথা বলতে বলতে বিশ্বজিতের পাশে এসে দাঁড়ায়।**)

বিশ্বজিৎ : এসে গেছিস, দুজনে! তা বলি, তোরা লড়তেই থাকবি না কিছু করবি? আর, বিবেক, বলি সারা ঘরটা কি আরজিখানা পেয়েছিস নাকি? চেয়ে দেখ তো একবার সারা ঘরময় আধা-লেখা, আধা-ছেঁড়া দরখাস্ততে ভর্তি হয়ে আছে একেবারে

দীপ্তি : দেখ বাবা, দাদার নিজের এমন নোংরা করা স্বভাব আর আমাকে উপদেশ দেয় চুল ঠিক করার।

বিবেক : বাবা, তুমিই বলো, চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করে, না চুল এলোমেলো করে ?

দীপ্তি : বোকা কোথাকার ! আজকাল চুল এলোমেলো করাকেই চুল ঠিক করা বলে।

বিশ্বজিৎ : চুপ, কোন কথা নয়। তোকে আমি কোথায় পাঠিয়েছিলুম ?

দীপ্তি : ইন্দুদির কাছে। দিদি আর জামাইবাবু দুজনেই ঠাকুর দেখতে বেরুচ্ছে। ওরা আসবে না।

বিশ্বজিৎ : আসবে না, কেন আসবে না ? আর মনীষা কোথায় ?

দীপ্তি : আমি কি জানি ? কোন বন্ধুর সঙ্গে হয়তো ঠাকুর দেখতে গেছে।

বিশ্বজিৎ : উঃ, ভগবান ! দেশের কি অবস্থা ! সবাই একা একা, শুধু নিজেরটুকু হয়ে গেলেই হল। অপরের কি হচ্ছে না-হচ্ছে সেদিকে কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমাদের এক সময় ছিল, তখন বড়দের কথার অবাধ্য হয়ে কিছুই করা চলত না। আর আজ ?

বিবেক : বাবা ! তোমাদের যুগ কবে খতম হয়ে গেছে। কি করে ভালো থাকা যায়, এখন তাই ভাবো।

দীপ্তি : কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা পুরানো ইতিহাসের মধ্যেই পড়ে থাকা পছন্দ করে।

বিশ্বজিৎ : থামা, তোদের ওসব কেতাবী ভাষা। আমিও কিছু বুঝি বুঝলি ? একটা যুগ কেটে গিয়ে যে ইতিহাস তৈরি হয় তা আমাদেরই ইতিহাস। অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানকে টিকিয়ে রাখা যায় না। সে যা হোক, এখন কথা হচ্ছে, তোরা এতক্ষণ ছিলিস কোথায় ?

বিবেক : অশোককাকুর বাড়ী গেছলাম। কাকু বলল, পুজোর পরেই কাকু আসতে পারবে, কেননা, ওদের বাড়ী পুজো

হতে তখনো অনেক দেরি। আর দীপকদা দেওয়ালীর শুভেচ্ছা জানাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ী গেছে।

দীপ্তি : বাবা, জানো, যবে থেকে দীপকদা নিজের দল ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রীর দলে যোগ দিয়েছে, তখন থেকেই ওর মন্ত্রী হবার কথা খুব শোনা যাচ্ছে। আজ রাতেই হয়তো ঘোষণা হবে ;

বিবেক : হয়ে যায় তো ভালোই। আমি এ যাবৎ শ'খানেক দরখাস্ত করেছি আর শ'খানেক দরখাস্ত ওঁকেই পাঠিয়ে দেব। এবার ঠিক চাকরি হবে।

বিশ্বজিৎ : ধিক, অমন কাজে। ভালোমন্দ বাছবিচার নেই, যে-কোন রকমে কাজ হাসিল হলেই হ'ল। গান্ধীজি বলতেন···

বিবেক : গান্ধীজি যা-কিছু বলেছেন, সব লিখে ও নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে। বড় বড় লোকদের বাণী ঘরে টাঙিয়ে রাখবার জন্যই তো হয়। এই দেখ না, গান্ধীজি ভারতীয় সমাজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে টাঙিয়ে রেখেছি··· 'সিদ্ধান্তহীন রাজনীতি', 'বিনা পরিশ্রমের ধন', 'অন্তরাত্মা ছাড়া আনন্দ', 'চরিত্র ছাড়া জ্ঞান', 'নীতিজ্ঞানবর্জিত কাজকর্ম', 'মানবতাহীন বিজ্ঞান', আর 'ত্যাগ বিনা পূজা' (**বলার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের মুখে আলোর ফোকাস পড়ে**)।

দীপ্তি : যতসব বুর্জোয়া কথাবার্তা। ওসবের যুগ এখন নেই। রাজনীতির সঙ্গে সিদ্ধান্তের, ধনের সঙ্গে পরিশ্রমের, আনন্দের সঙ্গে আত্মার, জ্ঞানের সঙ্গে চরিত্রের, কাজের সঙ্গে নীতিজ্ঞানের, মানবতার সঙ্গে বিজ্ঞানের বা পুজোর সঙ্গে ত্যাগের সম্বন্ধ কি ?

(**দুজনেই হাসতে থাকে**)

বিশ্বজিৎ : (**রেগে উঠে**) চুপ করো, যুগ কেটে গেলেও নৈতিকতা কখনও বদলায় না।

বিবেক : কিন্তু নৈতিকতার অর্থ বদলে যায়। যেমন দীপ্তির মতে চুল ঠিক করার মানে বদলে গেছে।

বিশ্বজিৎ : তোদের কথাবার্তার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝছি না।

বিবেক : আর তোমার কথা আমরা বুঝতে পারছি না। কেননা ভাষার নিজস্ব সত্তা কোথায়? এ তো শুধু আমাদের শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের প্রতিধ্বনি মাত্র। তুমি বলছ, এরকম হওয়া উচিত আর আমরা বলছি, এই হচ্ছে।

দীপ্তি : শরতদাও বৌদিকে নিয়ে দেওয়ালী কাটাতে হোটেলে গেছে। বাবা, তুমি তাড়াতাড়ি পুজো সেরে নাও। আমরাও ওখানে যাব।

বিশ্বজিৎ : না।

দীপ্তি : কেন, যাব না কেন?

বিশ্বজিৎ : আমি বলছি, তাই যাবি না এবং মনে রাখিস আমি তোর বাবা।

দীপ্তি : তুমি আমার বাবা, তা কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু তাই বলে তুমি আমায় আটকাবে কেন? তুমি আমায় আটকাচ্ছ; কেননা, তোমার পয়সাতেই আমি বেঁচে আছি। বাবা তো তুমি শরৎ, ইন্দু, মনীষারও, কই ওদের কিছু বলতে পারছ? আমি তোমার পয়সায় খাই পরি, কিন্তু তোমার চাকর নই।

বিশ্বজিৎ : (**রাগে কেঁপে উঠে**) তোর একটুও লজ্জা করছে না। তুই... তাই... জানিস্ তুই কি বলছিস?

বিবেক : যা হচ্ছে তাই বলছি। যা হওয়া উচিত তা বলছি না। দীপকদাকে একবার মন্ত্রী হতে দাও। তারপর দেখে নিয়ো।

বিশ্বজিৎ : দীপক আর দীপক! ও যা-কিছু করছে এসব ধর্ম নয়—অধর্ম। জেনে রাখিস অধর্মের পথে আমি তোকে চলতে দেব না।

বিবেক : ফের সেই বুর্জোয়া কথাবার্তা। জীবনভোর ধর্মের দোহাই দেওয়া ছাড়া আর কি করেছ? সাফল্যকেই যারা জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা তোমার থেকে অনেক ভালো।

বিশ্বজিৎ : এ বড় বাড়াবাড়ির কথা হ'ল, যে নিজের স্বার্থের খাতিরে দলবদল করে তার সঙ্গে আমার তুলনা করিস না। ওর কাছে গিয়ে তুই চাকরি চাইবি? অমন চাকরিতে দরকার নেই।

বিবেক : দিনভোর বসে বসে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠানোর চেয়ে দীপকদার কাছে যাওয়া খারাপটা কিসের শুনি? কাজ হাসিল করতে হলে যে-কোন লোকের কাছেই যাওয়া চলে। এতে খারাপের কি আছে? (**দ্রুতপদে করুণার প্রবেশ**)

করুণা : ব্যাস্, ব্যাস্ হয়েছে। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকব? তোমরা এসে দয়া কর না কেন?

দীপ্তি : বাবা, চলো চলো। তাড়াতাড়ি পুজো সেরে নাও।

বিবেক : পুজো করতে কত সময় লাগবে? পাঁচ মিনিট। পুরুতমশাই তো এখনো এসে পৌঁছান নি। তা হলে তুমিই তিন-বার গায়ত্রী জপ করে নাও না।

দীপ্তি : গায়ত্রী জপ করলেই যদি হয়ে যায়, তা হলে তা তো এখানে করলেই হয়, আর পুজোর দরকার কি?

করুণা : পুজোর দরকার আছে। বরাবর হয়ে আসছে। প্রতিবছর একবার করে ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মী এসে থাকেন।

বিবেক : (**ব্যঙ্গভরে হাসতে থাকে**) মা, আজ তাহলে একটা দরখাস্ত লিখে মাঃলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে দেব না কি?

বিশ্বজিৎ : চুপ। দেবদেবী নিয়ে তামাসা করতে নেই। এই জন্যেই তো গান্ধীজি বলেছিলেন, জ্ঞানের সঙ্গে চরিত্রের সহযোগ দরকার।

বিবেক : চরিত্র, চরিত্র আর চরিত্র (**জোর গলায়**) তুমি তো এত সৎচরিত্র, ধার্মিক— কিন্তু তাতে আমার কি লাভ হয়েছে? তোমার কথায় চলে আমি শুধু দরখাস্ত লিখতেই শিখেছি। যে তোমার রাস্তায় চলে নি, সেই দেখো কিছু-না-কিছু করেছে। বিমলদা কানাডায় গিয়ে দিব্যি মেজাজে আছে। শরৎদাও মোটামুটি কাটিয়ে দিচ্ছে। ইন্দুদিও বেশ সুখেই আছে।

আর যে-দীপককে তুমি অধার্মিক বলছ সে তো মন্ত্রী হতে চলল। তা হলে তোমার ধর্ম নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব ?

করুণা : বলি তোমরা যাবে, না যাবে না বলো দিকি ?

দীপ্তি : (**দীর্ঘশ্বাস টেনে**) চল্ দাদা, মান্ধাতার রাস্তায়ই চলতে হবে, চলো যতদিন যাওয়া যায়।

বিশ্বজিৎ : ওঃ কি দিনই-না পড়েছে। চল্লিশ-পঞ্চাশটা লোকের মধ্যে বসে পুরো বিধিবিধান মেনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পুজো করেছি। আর আজ সব শেষ। কোথাও কিছু নেই। শুধু পড়ে আছে তুটি ক্ষুব্ধ ছেলেমেয়ে আর এক গায়ত্রী মন্ত্র।

করুণা : আজ আবার এ সময় মনীষাটাও বাড়ী নেই।

দীপ্তি : কিছু ভেবো না মা। দিদি এখন সাবালিকা। কারোর সঙ্গে ঠিক দেওয়ালী কাটাতে গেছে।

করুণা : আমরা তো ওর কেউ নই। বাড়ীও ওর কাছে কিছু নয়। কেউ'ই ওর সব। আমাদেরও তো ধৈর্যের সীমা আছে না কি ?

বিবেক : ধৈর্যের কোন সীমা নেই। মনীষা আজ আর তোমাদের পয়সায় খায় পরে না।

বিশ্বজিৎ : আমার পয়সায় খেতে পরতে না পারে, কিন্তু এ বাড়ার লোক তো বটে! আমিই কি আমার বাবার ঘাড়ে বসে খেয়েছি ? কিন্তু তাই বলে বাবার কথার অবাধ্য হয়ে একদিনের জন্যও কি বাড়ীর বাইরে কাটিয়েছি ?

দীপ্তি : বাবা, তখনকার লোক চাঁদেও যেত না, টেরিলিনও পরত না। আর তখন চুইংগামও ছিল না। এটা মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগ। কম্পিউটার মানুষের চেয়ে বেশী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে। (**হঠাৎ বাইরে থেকে ডাকতে ডাকতে অশোকের প্রবেশ। বয়েস বছর ষাটেক। বিশ্বজিতের মত পোশাক-পরিচ্ছদ। মুখেচোখে সাদাসিধে ভাব।**)

অশোক : দাদা! কটা সুখবর আছে। আপনার দীপক মন্ত্রী হয়েছে।

(**সহসা সকলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে।**)

বিবেক : সত্যি কাকু ?

দীপ্তি : আমি এখনই দীপকদাকে অভিনন্দন জানাতে যাব। মন্ত্রী হওয়া যদিও বুর্জোয়াপনা। তবু দীপকদা কিছু করে দেখালো তো !

করুণা : বড় আনন্দের খবর। রাতদিন ঝগড়া করা, তর্ক করা, দরখাস্ত লেখা আর 'হিপী' হওয়ার চেয়ে এ ঢের ভালো।

বিশ্বজিৎ : হ্যাঁ, তার চেয়ে অবশ্যই ভালো। খুব খুশী হয়েছি, ও কোথায় এখন ? এখানে এলে পারত তো !

অশোক : ও তো এখনো বাড়ী আসে নি, আমি পুজো-আর্চা করলুম। (**হঠাৎ দীপ্তির দিকে তাকিয়ে**) আরে, আমি তো এতক্ষণ দেখিই নি। দীপ্তি মা আমার একেবারে পাক্কা 'হিপী' হয়েছে দেখছি। মলমলের সাদা পাঞ্জাবী, হাফহাতা লাল সোয়েটার, কালো সরু পাজামা, পায়ে ঘুঙুর, উস্কোখুস্কো চুল, বা···বা···বা··· !

বিবেক : কাকু, আপনি একে উস্কোখুস্কো চুল বলছেন। ওর ভাষায় এ হ'ল চুল ঠিক করা, আর এটা সরু পাজামা নয়। 'বেলবটম'। কিন্তু ওসব কথা থাক্। আমি এইমাত্র 101 নং দরখাস্তটা লিখে রেখেছি। এটাতে আপনি সুপারিশ করে দীপকদাকে দিয়ে দেবেন। আর জানেনই তো বিনা সুপারিশে আজকাল কিছু হয় না। এবার আমার চাকরি পাওয়া উচিত।

অশোক : চাকরি পেয়ে যাবে। চাকরির ভাবনা কি ? এখন পাবে না তো আর কবে পাবে ? কিন্তু বাবা হৈ-হৈ কোরো না। সব কাজেরই একটা পদ্ধতি আছে, রাস্তা আছে বুঝলে ?

বিশ্বজিৎ : আমিও তো তাই বলি। কিন্তু বার বার আমাকে এরা বুর্জোয়া বুর্জোয়া বলে শুধু চুপ করিয়ে দেয়।

করুণা : কিন্তু বলি মনীষার কি হল একটু ভেবে দেখছ

কি ? এখনও এল না। ইন্দুর বাড়ি গেল নাকি ? তা হলে অন্ততঃ বলে যাওয়া উচিত ছিল। এ মেয়ের তো ব্যাস...

(**ফোন বেজে ওঠে।**)

বিবেক : মা, তুমি বলছিলে বলে যাওয়া উচিত ছিল। আর এই খবর এসে গেছে। (**টেবিলের কাছে গিয়ে ফোন ওঠায়**) হ্যালো, বিবেক বলছি। ওঃ তুমি ! তোমার জন্যে তো আমরা গোরু-খোঁজা খুঁজছি। তা তুমি কোথা থেকে বলছ ? তোমার গলার স্বর এত গম্ভীর গম্ভীর ঠেকছে কেন ? কি ? বাবাকে ফোন দেব ? তা হলে আমাকে বলবে না। ভালো কথা, আমিও দেখে নেব। আচ্ছা বাপু, রাগ কোরো না এক্ষুনি বাবাকে ফোন দিচ্ছি। (**বিশ্বজিৎকে উদ্দেশ্য করে**) বাবা ! মনীষাদি তোমায় ডাকছে। (**বিশ্বজিৎ এগিয়ে এসে ফোন ধরে**)

বিশ্বজিৎ : হ্যালো, মনীষা নাকি ? হ্যাঁ, আমি বিশ্বজিৎ বলছি। তুই কোথা থেকে বলছিস ? তুই কখন ফিরবি, তার আশায় বসে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল কি ? (**সহসা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়**) কি বললি ? আবার বল। সত্যি ? তা হলে ঘরে আর আসবি না ? না না, এ হতে পারে না। (**টেলিফোন হাত থেকে পড়ে যায়, ধপাস করে সোফার ওপর বসে পড়ে। পশ্চাৎভূমিতে বাজনা জোর হয়। সবাই বিশ্বজিৎকে ঘিরে ধরে**)

করুণা : কি হ'ল ? মনীষা কি বলল ? কথা বলছ না কেন ? আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে কি দেখছ ?

বিশ্বজিৎ : (**ঝড়ের মত**) মনীষা বিয়ে করেছে।

করুণা : বিয়ে করেছে ? কাকে ?

বিশ্বজিৎ : তুমি সব জানো।

করুণা : (**ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে**) মনীষা তাহলে আসাদকেই বিয়ে করল।

বিবেক : মনীষাদি বিয়ে করল, আর আমাকে একবার বলল না পর্যন্ত ! আমি এখনই যাচ্ছি ।

দীপ্তি : (**উল্লসিতভাবে**) আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনীষাদি জিন্দাবাদ ! মনীষাদি জিন্দাবাদ ! আমি এখনই গিয়ে দিদিকে অভিনন্দন জানাব ।

অশোক : চুপ করো ! আমি জানাতে চাই এই আসাদ ছোকরাটি কে ?

করুণা : 'লেকচারার'। মনীষা যে কলেজে পড়ায় ও-ও ঐ একই কলেজে পড়ায় ।

অশোক : বৌদি, আপনি কি জানতেন যে মনীষা ওকে বিয়ে করতে চায় ?

করুণা : হ্যাঁ, তা জানতাম। ও ওর পছন্দ আমাকে বলে দিয়েছিল। আমি অনেক বুঝেয়েছি। কিন্তু ভাই, কথা শোনে নি।

বিবেক : কথা শোনবার দরকার কি ? ও তো একটা পুরুষ মানুষকেই বিয়ে করেছে। লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। সুন্দর স্বাস্থ্য, মধুর ব্যবহার, প্রতিভা আছে, পয়সাকড়িও ভালো রোজগার করে। একজন ভারতীয় বাবা-মা মেয়ের পাত্রের জন্যে আর এর চেয়ে বেশী কী আশা করতে পারে ?

দীপ্তি : আর ও মুসলমানই বা কিসে ? নামাজ পর্যন্ত পড়ে না। দেশের নেতারা বলছেন, আজকের যুগের ছেলেমেয়েদের সব রকমের ভেদাভেদের প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যখন আমরা ঐ প্রাচীর ভাঙি তখন এই নেতাই বাবা সেজে আমাদের আটকাতে চায়। নেতা আর পিতা একই লোকের দুই রূপ। হুঃ !

বিশ্বজিৎ : (**জোরে**) ওরে থাম্। বক্তৃতা অনেক হয়েছে, থাম্ এবার ।

অশোক : দাদা, আপনি কি এই বিয়ে থামাতে চান ? দীপককে বলে হয়তো কিছু কাজ হতে পারে। ও এখন মন্ত্রী হয়েছে তো !

করুণা : না, এখন আর কিছু করে লাভ নেই। ও এখন সাবালিকা, তা ছাড়া, নিজে পয়সা রোজগার করে।

বিশ্বজিৎ : হ্যাঁ, এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়। আমার মনীষা মরে গেছে।

করুণা : ওর অধিকার ছিল। নিজের রাস্তা নিজেই ঠিক করে নিয়েছে।

দীপ্তি : বাবা, তুমি পুজো করবে না ?

বিবেক : কেন করবেন না ? প্রত্যেক বছর করে আসছেন, আজও করবেন। পুজো করাটা একটা স্বভাবে পেয়ে বসেছে। করতেই হবে। আমি তো গায়ত্রী মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ পর্যন্ত ভুলে গেছি। মনে রাখার কোনও মানেও হয় না। পুরো ভাঁওতাবাজি। আর মনে রাখা অর্থহীন বলেই তো এটা একটা ফালতু বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বজিৎ : (**চেঁচিয়ে উঠে**) চুপ কর।

(পশ্চাৎভূমিতে বাজনা জোর হয়, মঞ্চের ওপর হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে। পরদা নামে। পরের দৃশ্যে মঞ্চ প্রায় আগের অঙ্কের মত। বিশ্বজিৎ আর করুণা সোফার ওপর বসে। বিশ্বজিৎ আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলে চলেছে।)

বিশ্বজিৎ : হায় মন ! সব সময়ই একটা-না-একটা চিন্তা মাথায় লেগেই আছে। কখনও ভাবছি, বিমলটা অতদূরে কানাডায় না-জানি কেমন আছে। ওর কাজকর্ম সব ঠিকঠাক চলছে তো। কখনও আবার ইন্দুর কথা ভাবছি। ওর বাড়ির লোকজন সবাই নিশ্চয়ই বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। আবার কখনও বা শরতের কথা মনে হচ্ছে। ওর নিজের শরীর সম্বন্ধে ঠিক যত্ন নিচ্ছে কি না ? বৌমা ওর সেবাযত্ন ঠিকঠাক করছে কিনা। মনীষার ওপর রাগ অবিশ্যি আছে। ও আসাদকে বিয়ে করুক এ আমি কখনও চাই নি। কিন্তু আবার ওর জন্যেই সব চেয়ে বেশী চিন্তা হচ্ছে। নতুন ঘরে ওর

কেমন লাগছে। ওর কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? আমি তো শুধু এইটুকুই চাই যে সবাই সুখে থাক্। নিজের ছেলেপুলেরা সবাই ভালো থাকুক তা হলেই আমার শান্তি। মনে প্রাণে আমি তাই চাইছি। কিন্তু ছেলেরা বলবে এতে আমার স্বার্থ আছে, এমন ভাবতে আমি বাধ্য। হায় রে!

করুণা: ঠিকই তো বলে। তুমি ওদের জন্যে কি করেছ? স্নেহ ভালোবাসা আর পয়সাই তো সব। ওদের ভবিষ্যতের কথা তুমি একবারও চিন্তা করেছ? ওদের সঙ্গে বসে কোনদিন ছুটো মিষ্টি কথা বলেছ? এখন যখন ওরা নিজের নিজের পথ নিজেরা বেছে নিচ্ছে, তখন তোমার যত রাজ্যের আপত্তি।

বিশ্বজিৎ: হ্যাঁ, সে কথা ঠিক যে ওদের ভবিষ্যতের জন্যে আমি কিছু করতে পারি নি, কিন্তু ওদের নিজের পথ নিজে বেছে নিতে বাধাটাই বা দিচ্ছি কোথায়? আমি তো শুধু চাইছি ওরা যেন ঠিক পথে চলে। এই দীপ্তিকেই দেখ না। সোমত্ত মেয়ে একটা কথাও শোনে কি? ওর পোষাক-আষাক আর কথাবার্তা শুনে তো আমারই ভয় লাগে। কবে কিছু না হয়ে বসে। আর এই বিবেক ...(**হঠাৎ দ্রুতপদে দীপ্তি ও বিবেক তর্ক করতে করতে প্রবেশ করে।**)

দীপ্তি: আমি কোথায় যাচ্ছি না-যাচ্ছি তোর তাতে কি? তুই তোর দরখাস্ত নিয়েই থাক্-না বাপু!

বিবেক: আমি বাবাকে বলে দেব। তুই সিগারেট খেতে শুরু করেছিস।

দীপ্তি: যা না, বলগে না। কে বারণ করছে তোকে?

বিবেক: তোর কি ভয়ডর একটুও নেই রে?

দীপ্তি: ওঃ তুই তো ভয়ে মরে যাচ্ছিস একেবারে; তুমি যে চুপচাপ বাইরে যাবার প্ল্যান করে রেখেছ, তার বেলা? (**বলতে বলতে ছুজন সোফার কাছে এসে হাজির হয়।**)

করুণা: কি হ'ল আবার তোদের? রাতদিন শুধু ঝগড়া

আর ঝগড়া। কোথায় গেছলি এখন দুজন? বিবেক, দীপক কী বলল রে?

বিবেক: আমি দীপকদার কাছে যাব না।

করুণা: কেন, কী হয়েছে?

বিবেক: ওর কথাবার্তার ধরন বড় খারাপ। কাকুর কথাই শোনে না। ও শুধু ভাবছে ওর গদিটা কতদিন টেঁকে?

বিশ্বজিৎ: তাই বল-না কেন, তোর একশো এক নম্বর দরখাস্তটাও বেকার গেল।

বিবেক: হোক গে যাক। আমি আর দরখাস্ত করব না।

করুণা: দরখাস্ত করবি না তো করবিটা কি শুনি?

বিবেক: বিপ্লব করব। যারা সব-কিছু ধ্বংস করতে চায়, আমি তাদের দলে যোগ দেব।

বিশ্বজিৎ: (**ব্যঙ্গভরে**) বিপ্লব! বিদ্রোহ! ধ্বংস! এ-সব কথা তো খুব শিখেছিস দেখছি। এ সবের মানে জানিস? বিপ্লবের অর্থ গড়া আর তার মূলে আছে কর্তব্য। দেশ ও সমাজের প্রতি প্রত্যেকেরই কিছু কর্তব্য আছে। সে সব না ভেবে শুধু বিপ্লবের স্বপ্নই দেখছিস। বিপ্লব করা তোর দ্বারা হবে না।

বিবেক: বাবা, কি কর্তব্য আর কি কর্তব্য নয়, সে সব কথা বহুবার শুনেছি। কর্তব্যের দোহাই দিয়ে তোমরা শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কথাই ভেবেছ। যৌথ পরিবার তৈরি করে রেখেছ। এখনও তুমি ভাবছ, আমি তোমার কাছে খঞ্জের লাঠি হয়ে থাকি, তাই না? না, না, সেদিন আর নেই।

বিশ্বজিৎ: দুটো বই পড়ে ভাবছিস, খুব শিখে ফেলেছিস না? যা মুখে আসছে অমনি তাই বলছিস। কর্তব্য মানে খঞ্জের লাঠি। ও!

বিবেক: তা নয়তো কি। তুমি আমাকে এখন কর্তব্য মানে শেখাচ্ছ? কর্তব্য মানে আমি যা বলেছি, তাই বোঝায়। কিন্তু

আমি তা হতে পারব না। মরে যাব, তবু উপদেশে আর দরকার নেই। সব ভেঙে চুরমার করে দেব। জ্বালিয়ে দেব সব...

দীপ্তি : সাবাশ, সাবাশ দাদা ! দাদা জিন্দাবাদ !

করুণা : চুপ কর। রাতদিন শুধু বসে বসে এইসব ভাবা হচ্ছে আর ঝগড়া হচ্ছে— কেন আর কোন কাজ নেই ? কাল অবধি দীপকদার গুণগান হচ্ছিল আর আজ তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করলেই দোষ না !

দীপ্তি : তুমি জানো না মা। দেখে নিয়ো ওর গদি পনেরো দিনের বেশী টিকবে না। ওদের সরকারের পতন অনিবার্য।

বিশ্বজিৎ : সত্যি ! আমি তো বলেছিলুম এ সরকার দুর্নীতির ওপর...

বিবেক : দুর্নীতি আর দুর্নীতি ! এই সরকারই আমাকে যদি চাকরি দিত, তা হলে কি আর একে দুর্নীতিপরায়ণ বলতে ?

বিশ্বজিৎ : কেন, আমি কি সে কথা বলি নি ?

বিবেক : বলেছ, কিন্তু অশোককাকু বা দীপকদার সামনে নয়। আমি দরখাস্ত দেবার পরও নয়। আজকের দিনে যে কাজ হাসিল করতে পারছে তার জন্যে কিছুই দুর্নীতি নয়। আর তাই এখন আমিও যে-কোন কাজই করতে তৈরি আছি। আমি পাঁচ বছরের জন্যে বিশ্বভ্রমণে বেরোব বলে ঠিক করেছি।

বিশ্বজিৎ : বিশ্বভ্রমণ ? কিসের জন্যে ?

বিবেক : আজকের এই পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে আবার নৈতিকতা কি ? কর্তব্য আর অধিকার বলতেই বা কি বোঝায় ? আজকের দিনে নৈতিকতার সঙ্গে বা জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধের এবং কর্তব্যের কোন সম্পর্ক আছে ? এই প্রশ্নটা আমি দুনিয়ার প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্যেই আমি বিশ্বভ্রমণে বেরোব ! তারপর একটা বই লিখব। আর তোমার কাছ থেকে কথা ধার করে বলব, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি কী না করতে পারি !

করুণা : কেন, এই দেশে কি আর-কিছু করার নেই ? বাইরে গেলেই সব হয়ে যাবে ?

বিবেক : হ্যাঁ, মা। বাইরে গেলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। বিমলদাকে দেখছ না।

করুণা : তোর সঙ্গে তর্ক করার ক্ষমতা আমার নেই। এসব কথা বোঝাবার মত বিদ্ধেবুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু…

বিবেক : এতে বোঝাবার কি আছে? এ বাড়ীর এই প্যাঁচালো পরিবেশ থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই। এখানে বেশীদিন থাকলে মাথার দফারফা হয়ে যাবে। কিন্তু আমার মাথাটাকে আমি নষ্ট করতে দিতে পারি না। যন্ত্রণায় আমি ছটফট করে মরতে চাই না। এ থেকে আমি মুক্তি চাই।

করুণা : ভবিষ্যতে কি হবে একবার ভেবে দেখেছিস ?

বিবেক : এখনই যখন কিছু করতে পারছি না, তখন ভবিষ্যতে কি করতে পারব না-পারব, তা বলা কঠিন। কিন্তু একটা জিনিস ঠিক করে ফেলেছি যে আগামী পরশু দিন খুব ভোরে আমি বেরিয়ে পড়ছি।

বিশ্বজিৎ : কিন্তু পয়সা কোথায় পাবি ?

বিবেক : বাবা, আমি যে দলের সঙ্গে যাচ্ছি, তাদের কেউই একটাও পয়সা সঙ্গে নিয়ে বেরোচ্ছে না। পয়সা মানুষে মানুষে একটা নকল সম্বন্ধ গড়ে তোলে। কি উচিত আর কি অনুচিত পয়সা তা বোঝবার বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়। তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। মা, তোমাকেও আর চোখের জল ফেলতে হবে না। আচ্ছা, কাপড়টা বদলে আমি মনীষাদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। ওরাও তো কানাডা যাবার তোড়জোড় করছে। (**ভেতরের দিকে যায়**)

বিশ্বজিৎ : যাও, যাও সবাই চলে যাও। আমার কিচ্ছুই করবার নেই। শুধু বসে বসে দেখা ছাড়া আর কিচ্ছু করবার নেই।

দীপ্তি : যেতে দেখে তোমার খারাপ লাগছে, বাবা ? তোমার একটু হালকা মনে হচ্ছে না ? তোমার কি মনে হচ্ছে না যে তোমার ঘাড় থেকে আর-একটা বোঝা নেমে গেল।

করুণা : (উঠে পড়ে) বলি, তুই থাম্‌বি, নাকি বল দিকি ? খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না তো ? আর কতক্ষণ উনুন জ্বালিয়ে বসে থাকব ?

দীপ্তি : (হেসে উঠে) বসে থাকতে তোমার ভালো লাগে, তাই বসে আছ। এই হচ্ছে তোমার কর্তব্য আর এই তোমার মমতা। আমার ভাষায় একে বলে স্বভাব। অনর্থক বোঝাও বলতে পারো।

করুণা : তোর ভাষা তোরই থাক্‌। এই ভাষাতেই তো সর্বনাশ করছিস। যখনই দেখো, শুধু তর্ক আর তর্ক। তোর প্রাণে যা চায়, তাই কর। আমি আর বসে থাকতে পারব না। (**ভেতরে যায়**)

দীপ্তি : কেন বসে থাকতে পারবে না। বসে থাকবার জন্যেই তুমি জন্মেছ। এই যে কাকুও এসে গেছেন (**অশোকের প্রবেশ**) আসুন, আসুন কাকু।

বিশ্বজিৎ : এসো অশোক, বসো।

অশোক : দীপকের কাছে শুনলুম বিবেক নাকি বিশ্বভ্রমণে বেরুচ্ছে।

বিশ্বজিৎ : শুনেছি তো আমিও।

অশোক : তা, আপনিও ওকে অমনি যেতে দিচ্ছেন ?

বিশ্বজিৎ : ওর আগেই বা কাকে থামাতে পেরেছি ? সবাই একে একে চলে যাবে, এই দেখাই আমার ভাগ্যে লেখা আছে। আর কি-ই বা করা যাবে। তুমিই কি দীপককে দিয়ে কিছু করাতে পেরেছ ?

অশোক : আজকাল কে কার কথা শোনে, দাদা ? আর ওকেই বা দোষ দিই কি করে ? ওর ওপরেও অনেক লোক আছে

যে সবচেয়ে ওপরে আছে, সেও সুপারিশ করছে। আর এখন তো ওর সরকারই তো আর নেই।

বিশ্বজিৎ : কি বললে, ওর সরকার খতম ?

অশোক : হ্যাঁ, শাসক দলের কিছু লোক গিয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়েছে। দীপকও নিরাশ হয়ে বাড়ী চলে এসেছে। ওর অনেক আশা ছিল যে দেশের জন্যে ও কিছু করবে।···

বিশ্বজিৎ : (**হঠাৎ হেসে উঠে**) খুব দেশ দেশ করছ, দেখছি। আজকাল সবাই দেশ দেশ করে দু পয়সা লুটে নিচ্ছে।

দীপ্তি : (**হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে**) সব মিথ্যে! সব মিথ্যে! দেশ আজ কোথায়? দেশের মধ্যে আর-একটা দেশ বানিয়ে বসেছি আমরা। দেশের ভেতরে এই দেশের নাম হল স্বার্থ, যা প্রদেশ, ধর্ম, জাতি আর সীমানা দিয়ে চারিদিকে প্রকট হয়ে রয়েছে। কাগজে চোর গুণ্ডা, বদমাইসের কাহিনী ছাপে। ঘুষের পয়সায় করা সম্পত্তির কথা ছাপে। প্রকাশ্যে গুণ্ডাগিরির কথাও ছাপাচ্ছে। জাল জোচ্চোর আর কালাবাজারিতে চারদিক ছেয়ে আছে। নকল নথিপত্র পর্যন্ত ছাপা হচ্ছে, যাতে বিরোধীদের হারানো যায়। কিন্তু এসব দিকে কোন দেশভক্তের ভ্রূক্ষেপও নেই।

অশোক : (**জোর গলায়**) কোন্ সব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বলি কোন্ সব দিকে ?

দীপ্তি : শুনতে চান? শুনতে ভালো লাগবে তো? বেশ শুনুন তবে। আমরা চাই নতুন জেনারেশন যেন এগিয়ে যেতে পারে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে শুধু হতাশা নৈরাশ্য। আর যাদের সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে তারা এখনও তাদের অধিকার নিয়ে বসে আছে। কিন্তু আমি বলব, এখন এমন একটা যুগ আসছে, যখন মানুষের আর অন্যের কাছ থেকে লুকোবার কিছু নেই। মানুষ একেবারে নগ্ন হয়ে পড়েছে। আর সেই নগ্ন দেহের ওপর জন্ম নিচ্ছে নতুন সভ্যতা। (**দ্রুতপদে করুণার প্রবেশ**)

করুণা : বলি, এত গলাবাজি কিসের রে তোর ? তুই খেতে যাবি কি না বল ?

দীপ্তি : এখন নয়।

করুণা : তা হলে আমাকে এখন কি করতে বলিস ?

দীপ্তি : কি আর করবে ? রামায়ণের গোড়ায় ভাগ্যলিপি পড়বার যে ছক্ কাটা আছে, তাতে সবাইকার ভবিষ্যৎ কি হবে তার খোঁজ করো।

অশোক : আপনারা এ মেয়েটাকে লায় দিয়ে দিয়ে একেবারে এর মাথাটাকে খেয়ে বসে আছেন।

বিশ্বজিৎ : আমি ! আমার কথা ও কোনদিন শুনেছে ? নাকি এখনই ও আমার কথা শোনে ? (**বিবেকের প্রবেশ**)

বিবেক : আচ্ছা কাকু চলি। আর দীপকদার কাছে আপনাকে আমার জন্য কিছু বলতে হবে না। পরশুদিন আমি বিশ্বভ্রমণে বেরুচ্ছি। আর হ্যাঁ বাবা, আজ আমি মনীষাদির বাড়ীতেই থাকব।

দীপ্তি : একটু থাম্ দাদা। আমিও যাচ্ছি।

বিবেক : চল্ (**মায়ের দিকে একটু হেসে**) মা, আশীর্বাদ করা যদিও একটা বুর্জোয়াপনা তবু, তোমাদের খুশী করার জন্যে যাবার আগে আশীর্বাদ নিতে আসব। চল্ দীপ্তি।

দীপ্তি : বাবা, আমি তা হলে যাই। আর মা, আমার জন্য ভেবো না, আমি ওখানেই খেয়ে নেব।

(দুজনে চলে যায়। মুহূর্তের জন্য সব নীরব। তারপর বিশ্বজিৎ দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বলে।)

বিশ্বজিৎ : অশোক তুমিই বলো, আমি এখন কোথায় যাই ?

অশোক : আমাদের কোন চুলোয় যাবার জায়গা নেই দাদা। যাক, ভালোই হয়েছে।

করুণা : সবাই চলে গেল। এখন তুমি তো অন্তত খেয়ে নাও।

বিশ্বজিৎ : খাবার ? এও এক ঝামেলা। আচ্ছা চলো অশোক, বসা যাক। অনেক দিন একসঙ্গে বসে খাই নি আমরা।

অশোক : একসঙ্গে বসে ? যেন মনে হচ্ছে এসব গতজন্মের ব্যাপার। এ জীবনটা তো বাজে কাজে কেটে গেল।

বিশ্বজিৎ : আর এরা বলে, যা বাজে, তাই সবচেয়ে কাজের। নিরর্থকতার মধ্যেই অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

অশোক : কে জানে, অর্থই যখন নেই তখন আর খুঁজে কি লাভ। (**বলতে বলতে দুজনে ভেতরে যায়। মঞ্চের ওপর অন্ধকার নেমে আসে। আলো জ্বললে দেখা যায় ডাইনিং টেবিলের চারদিকে বসে আছে মেজ ছেলে শরৎ, বড়মেয়ে ইন্দু, মেজ মেয়ে মনীষা আর ছোট মেয়ে দীপ্তি। সকলে চা খাচ্ছে। দীপ্তি একটু অন্য ধরনের 'হিপী' বেশে।**)

দীপ্তি : ওঃ প্রায় যেন এক যুগ পরে আমরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হলাম। মেজদা, বল তো, শেষ কবে তুমি এসেছিলে ?

শরৎ : সে কি আর মনে আছে ? মাঝে দু-একবার এসেছিলাম কিন্তু তুই ছিলি না।

ইন্দু : আমারও বিশেষ একটা আসা হয়ে ওঠে না। বাড়ীর এক গাদা কাজ। হ্যাঁ, মা কোথায় গেল ?

দীপ্তি : যাবে আর কোথায় ? পাড়াতেই কারো বাড়ী গেছে হয়তো। বাবাকে নিয়েই বড় ভাবনা হয়। আর সেইজন্যেই তো তোমাদের সবাইকে ডেকেছি। ঐ যে, মা এসে গেছে (**করুণার প্রবেশ**)

শরৎ, ইন্দু
ও : মা, কেমন আছ গো ?
মনীষা

করুণা : (**বসতে বসতে**) ভালো। যাক তোরা সব এসে গেছিস। আমি তাই ভাবছিলুম।

শরৎ : কি ভাবছিলে ? তুমি ডেকেছ তা আর না এসে থাকা যায় ? কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

ইন্দু : কিছু জরুরী কথা মনে হচ্ছে।

মনীষা : দীপ্তি বলছে, বাবাকে নিয়েই নাকি যত সমস্যা ?

করুণা : হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। তোমাদের বাবার কথাই বলতে তোমাদেরকো ডেকেছি। দিন দিন তাঁর অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। কেমন যেন জড়ের মত হয়ে যাচ্ছে। জীবনে যেন কোন সুখ নেই। কারোর ওপরই কোন রাগ নেই— আমার ওপরেও না। কিছু বললে চুপচাপ শুনে যায়। হ্যাঁও করে না, নাও করে না। সারাদিন শুধু আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর বিড়বিড় করে বকে। আর হ্যাঁ, আর এসব ছাড়া আরো একটা জিনিস ইদানীং লক্ষ্য করছি।

শরৎ : সেটা আবার কি ?

করুণা : উনি আজকাল গালাগালি দিতে শুরু করেছেন।

ইন্দু : কি বলছ কি বাবা গালাগালি দেয় তোমাকে ?

মনীষা : দূর তা আবার হয় ? আমি বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছি। এখন পর্যন্ত বাবা আসাদকে স্বীকার করে নেয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা হলে উনি বেশ ভালোভাবেই কথাবার্তা বলেন।

শরৎ : বাবা যে-রকমই থাকুন, গালাগালি দিতে তো ওঁকে কখনও শুনি নি ?

দীপ্তি : আমার উপর বরাবরই উনি চটা। কিন্তু আমাকে পর্যন্ত উনি কখনও গালাগালি করেন নি।

করুণা : তোরাই তাহলে বল, আমার কিছু বলবার নেই। সব কথা না শুনেই যার যা মনে হচ্ছে, বলতে শুরু করেছিস। আমিই কি কখনও বলেছি যে উনি কাউকে গালাগালি দেন। (**গম্ভীরভাবে**) আমাকে গালাগালি দিলে তো আমার কোন দুঃখ ছিল না। কিন্তু উনি নিজেকেই নিজে গালাগালি করেন যে ! নিজেকে অভিশাপ দেন, কাঁদেন।

ইন্দু : সে তো আলাদা কথা। অন্যকে যে কিছু বলতে পারে না, সেই নিজেকে অভিশাপ দেয়।

শরৎ ঃ ব্যাপারটা হচ্ছে, উনি দারুণ মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন। এমন অবস্থায় লোকে পাগল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

করুণা ঃ আমিও তাই বলছি। তোরা ওঁর সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখ। তোরা তো সব নিজের নিজের মতেই চলেছিস— যা প্রাণে চেয়েছে করেছিস। কাউকেই আমি থামাতে পারি নি। বিমল রয়েছে কানাডায়। কখনও কখনও কিছু টাকা পাঠিয়েই সে খালাস। বিবেক ঘুরে বেড়াচ্ছে তার প্রশ্নের উত্তর খুজতে। আর এই দীপ্তির হালচালই দেখ না। সিগারেট পর্যন্ত খাওয়া শুরু করেছে। সন্ধের পরও অনেকক্ষণ অবধি বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আবার এখন বায়না ধরেছেন যে উনি হোস্টেলে গিয়ে থাকবেন।

দীপ্তি ঃ মা, আচ্ছা, আমার অসুবিধাগুলি বুঝতে চাও না কেন বলো তো ? তুমি আমায় ভালোবাসো, স্নেহ করো। কিন্তু বোঝাবার চেষ্টা তো একটুও করো না। কাউকে বোঝাবার চেষ্টা করাই হল তাকে ভালোবাসা। তুমি এটা বোঝ না কেন যে হোস্টেলে থাকার অনেক সুবিধা আছে। ডাক্তারী পড়'টা ছেলেখেলা নয়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘুরি ঠিক কথা, কিন্তু বখাটেপনা তো করছি না। নানারকম সাংস্কৃতিক কাজকর্মে যোগ দেওয়ার জন্যে বাড়ী ফিরতে দেরি হয়ে যায় এবং এজন্যে কখনও কখনও নীতীনের সঙ্গে চলে যাই— এইতেই তোমার যত আপত্তি। এসব তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। তবুও যদি তোমার রাগ হয়, তাহলে আমি নাচার।

করুণা ঃ করতে তোকে কে কি বলছে ? আর বলবেই বা কেন ? পয়সার তো অভাব নেই— যখন যা দরকার পেয়ে যাচ্ছিস কিনা।

দীপ্তি ঃ (**রেগে গিয়ে**) রাতদিন শুধু পয়সা আর পয়সা। পয়সা দিতে না চাও তো দিয়ো না। আমি আমার নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেব। পড়া বন্ধ করে দেব, সেইসঙ্গে এ বাড়ীতেও আর ঢুকব না। রাতদিন কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্— এ আর ভালো লাগে না। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়।

করুণা : থাকতে না ইচ্ছে হয় তো থেকো না। কে এখানে তোমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু এসব চেঁচামেচি রাগারাগি চলবে না বাপু! আমারাও তো এ বাড়ীতেই দিন কাটিয়েছি। চল্লিশ-পঞ্চাশটা লোক নিয়ে ঘর করেছি, কিন্তু রাতদিন রাগারাগি চেঁচামেচি তো কই কখনও করি নি।

দীপ্তি : কখনও কি ভেবে দেখেছ যে সেই চল্লিশ-পঞ্চাশটা লোক গেল কোথায়? আর কেনই-বা গেল?

করুণা : হ্যাঁ হ্যাঁ, সব জানি, সব দেখেছি। যাক্ সে কথা ছাড়। এখন তোদের বাবার কি হবে তাই ভাব। এখনও ফিরল না, তোদেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে— একটু দেখাশোনা কর, বড় হয়েছিস সব। আমার তো কিছু করতেই ভয় করে বাপু!

মনীষা : মা, ঘণ্টা তিন-চারেক আগে যখন আমি রেলে করে আসাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরছিলুম, তখন বাবাকে দেখেছি।

করুণা : কী দেখেছিস?

মনীষা : পুলের ওদিকে রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিল।

শরৎ : রেল লাইনের ধারে?

ইন্দু : ওখানে কিং করতে গেছে?

দীপ্তি : বাবা তো ওদিকে কোনদিন বেড়াতে যায় না।

করুণা : এই ভয়েই তো আমি মরি। যা যা শিগগির দেখ্, উনি কোথায়?

মনীষা : অত ভয়ের কিছু নেই। গাড়ী থেকে আমি বাবাকে ডাকলুম। তুমি তো জানই গাড়ীটা ঐ জায়গায় এলে একেবারে আস্তে হয়ে যায়। বাবা আমাকে দেখে হাসছিলেন।

শরৎ : হ্যাঁ গো মা। বাবা এক্ষুনি এসে পড়বে। কিচ্ছু ভেবো না।

করুণা : ভাবব কি ভাবব না, তা আমি বুঝব। সোজাসুজি বল তো তুই ওঁকে খুঁজতে যাবি কিনা?

শরৎ : তুমি শুধু শুধুই রেগে যাচ্ছ। যেতে কার আপত্তি, কিন্তু সময় কই ? তুমি তো জানই আমি একটা পেট্রোল পাম্পের লাইসেনসের জন্যে চেষ্টা করছি। সেইজন্যে পয়সার ধান্দায় আছি। কিন্তু যতক্ষণ না ওপরওয়ালাদের কারো সুপারিশ হচ্ছে, ততদিন কিছুই হবে না। দীপকদা আমাকে আটটার সময় যেতে বলেছে আর এখনই ঘড়িতে বাজে সোয়া সাতটা। (**উঠে পড়ে**)

করুণা : তাহলে তুই কি দেখতে বেরুবি না ? বেশ বেশ, তুই যা। ওপরওয়ালায় খোঁজ করগে যা। (**শরৎ চলে যায়**)

ইন্দু : আমাকেও তো যেতে হয় এবার ।

করুণা : তুই কোথায় যাবি ?

ইন্দু : জানো না, আমার বাড়ী তৈরি হচ্ছে ? বাড়ী তৈরি এক মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। গভর্নমেণ্টের কাছে লোন নিয়েছি, ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে লোন নিয়েছি, বন্ধুবান্ধবের কাছেও দেনা হয়েছে— তবুও কি ঝামেলার শেষ আছে ? সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দুজনের এখন আহার নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ। একজনকে-না-একজনকে ওখানে থাকতেই হয়। না হলে মালপত্র চুরি যায়। এই সেদিনই তো এক বাণ্ডিল লোহার রড চুরি হয়ে গেছে। কাল দশ বস্তা সিমেণ্ট গায়েব হয়ে গেছে। তাহলেই বল, দুটো তো লোক, কোন্ দিকে যাই ? আচ্ছা মা, চললুম। মজুরদের আবার হিসাব টিসাব করতে হবে। (**চলে যায়**)

করুণা : তোরা কি একবারও ভেবে দেখেছিস যে আমার এখন বয়েস হয়েছে। রান্না করতে গেলে আমার হাত কাঁপে।

মনীষা : রান্নার তো না হয় একটা বন্দোবস্ত করা যাবে, কিন্তু বাবার কি করবে ? তোমার রান্না ছাড়া তো আর কারও রান্নাও বাবার চলবে না।

করুণা : সেইজন্যে তো আমি কাউকে কুটোটিও নাড়তে বলি না। কিন্তু ওঁকে এখন কোথায় খুঁজতে যাই বল দিকি ?

দীপ্তি : কোথাও যাবার দরকার নেই। তুমি মিছিমিছি ভেবে

ভেবে মাথা খারাপ করছ। বাবা নিজে নিজেই চলে আসবেন। মা, আমি মেজদির সঙ্গে যাব ওদের বাড়ী ?

করুণা : তা কি এখনই যেতে হবে ?

দীপ্তি : কেন, যাই না ! তুমি কিচ্ছু ভেব না, আমি ঠিক পরশু দিন চলে আসব। পরশু দিন তো আমার জন্মদিন— আমি সাবালিকা হয়ে যাব। তখন আর আমাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। ভয় নেই, আমার ভালোমন্দ বোঝার মতো বয়েস আমার হয়েছে। হোস্টেলে কোন ভয় নেই। ভয় তো শুধু নিজেকেই। আর যে নিজেকে ভয় করে সেই তার নিজের দায়িত্ব বোঝেনা। এইসব বিধিনিষেধ সংস্কার সব আমি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলব। তাই বলে নিজের জীবনটাকে তো নষ্ট করতে পারি না। আমি বাঁচতে চাই। (**ঠিক সেই সময় শরৎ আর বিশ্বজিৎ মঞ্চে ঢোকে।**) মা, এই দেখ ! বাবা এসে গেছেন। সব ঠিক আছে। কিচ্ছু হয়নি। চেহারাতে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই।

শরৎ : নাও, মা, এবার তুমি সামলাও ! মিছিমিছি ভয়েই মরছিলে। বাবা নিজে নিজেই এসে গেছেন। আচ্ছা, এবার তাহলে আমি যাই ? পয়সাকড়ির বন্দোবস্ত না করতে পারলে পেট্রোল পাম্পটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। (**চলে যায়**)

বিশ্বজিৎ : (**সোফার উপর বসে**) হ্যাঁ হ্যাঁ, যা তোরা সবাই যা। তোরা এখানে থাকবিই বা কি করে এই পরিবেশে ? তা ব্যাপার কি বল দেখি, তোরা সব আজ এখানে ?

করুণা : সে সব হচ্ছে। তার আগে বল তো, সকাল থেকে গেছলে কোথায় ? (**চা জলখাবার দেয়**)।

মনীষা : বাবা, আপনি ঘণ্টা চারেক আগে রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন না ?

করুণা : ওখানে কি করতে গেছলে ?

বিশ্বজিৎ : (**ধীরেসুস্থে চা খেতে খেতে**) তোমরা যা ভাবছ, তাই করতেই গেছলাম।

মনীষা : আত্মহত্যা ? না না না, তা হতেই পারে না। এ অসম্ভব।

বিশ্বজিৎ : তা তোরা এটা ভাবতে পারিস আর আমি করতে পারি না। যাক গে থাক্ ওসব কথা। (**হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে**) মনীষা, তুই যখন 'বাবা' বলে চেঁচিয়ে ডাকলি তখন আমার কি মনে হচ্ছিল জানিস ? আমার মনে হচ্ছিল, সারা আকাশ যেন বাবা শব্দে মুখরিত হয়ে উঠছে। ভাবলুম, আত্মহত্যা... মানে মৃত্যু আর মৃত্যু তো একদিন-না-একদিন হবেই। তবে আত্ম-হত্যা করে কি লাভ ? মিছিমিছি নিজের প্রাণটাকে নিজে নষ্ট করি কেন ? আমাকে এখনো অনেক কিছু দেখতে হবে, অনেক কিছু দেখার বাকি আছে। তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। কিছু না দেখে এই পৃথিবী থেকে পালিয়ে গিয়ে কি লাভ ? তাই আবার ফিরে এলুম।

করুণা : খুব ভালো করেছ। তোমার পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে তো আমার পাগল হয়ে যাবার উপক্রম।

মনীষা : না গো না মা, বাবা তোমার সঙ্গে তামাসা করছেন। বাবা মোটেই আত্মহত্যা করতে যাননি। আচ্ছা বাবা, এবার তাহলে আমি চলি।

দীপ্তি : এই মেজদি, দাঁড়া, আমিও যাব। বাবা, ভুলে যেয়ো না যেন পরশু আমার জন্মদিন। ঐ দিন থেকে আমি সাবালিকা হয়ে যাব।

বিশ্বজিৎ : আচ্ছা তুইও তাহলে সাবালিকা হয়ে যাবি ? স্বাধীন হয়ে যাবি ? বেশ বেশ, তোকেও সাবালিকা হতে দেখব। কিন্তু এমনিতেও তো আমি বুঝি না তুই নাবালিকা কবে ছিলি ? সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেই জানি না আমি স্বয়ং সাবালক না নাবালক। (**সবাই হেসে ওঠে। মনীষা আর দীপ্তি চলে যায়। কিছুক্ষণ বিশ্বজিৎ আর করুণা চুপচাপ বসে থাকে। তারপর করুণা বলে ওঠে**)—

করুণা : হ্যাঁ গো, তুমি সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করতে গেছ্‌লে?

বিশ্বজিৎ : তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও ?

করুণা : কি কথার ?

বিশ্বজিৎ : আমার এখন যা অবস্থা, তা হ'ল আমি না বেঁচে আছি না মরে আছি। আত্মহত্যা কি এর থেকে আলাদা কিছু ?

করুণা : সেইজন্যে, আমি বলি তুমিও কেন ভাব না যে তুমিও স্বাধীন, তুমিও মুক্ত হয়ে গেছ। ছেলেপুলেদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত। মুক্ত হয়ে যাওয়া ওঃ কি শান্তি !

বিশ্বজিৎ : শান্তি তো ভালোই। কিন্তু এই বন্ধন থেকে খালাস পাই কি করে ? স্বভাবের বন্ধন, আপন সন্তান-সন্ততির বন্ধন, বাবা হওয়ার বন্ধন (**হাসতে থাকে**) বাপ হওয়ার বন্ধন। ওরা সব আমাকে ছেড়ে গেলেও এই আশা যে ওরা আবার একদিন ফিরে আসবে।

(হাসতে থাকে। করুণা ভয়ার্তভাবে বিশ্বজিতের দিকে দেখতে থাকে। তবুও হাসি থামে না, আর সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।)

—যবনিকা—

বন্দী

—জগদীশচন্দ্র মাথুর

চরিত্র :

রায়বাহাদুর তারানাথ
হেমলতা (তারানাথের কন্যা)
বীরেন
আয়া
চেতরাম
বালেশ্বর ওরফে বি. পি. সিন্‌হা
করমচাঁদ বরৈঠা

(প্রথম দৃশ্য)

(উত্তর ভারতের একটি গ্রাম। গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাংলোর সামনে বাগান। পশ্চাতভূমিতে বাড়ী দেখা যাচ্ছে। বাড়ীর মধ্যে যাবার জন্য রাস্তাটা বাঁ দিক দিয়ে আর বাইরে যাবার রাস্তাটা ডান দিক দিয়ে। চৈত্র পূর্ণিমার সন্ধ্যা। গোধূলি শেষ হয়ে এসে চাঁদের আলোয় চার দিক ভরে গেছে। রায়বাহাদুর তারানাথ বাগানের এককোণে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মেয়ের সঙ্গে সেই দিকে হেঁটে চলেছেন।)

তারানাথ : আর এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে তোর মা পুজোর পর তুলসীগাছে জল দিতে আসত আর আমি···

হেমলতা : তুমি তখন নিশ্চয়ই নাস্তিক ছিলে, তাই না বাবা ?

তারানাথ : না, সেটা হ'ল তোর মাকে রাগাবার জন্যে। কিন্তু ওর দারুণ ভক্তি ছিল।··· আর আমি তখন বাগানের কোন কোণে হয়তো...ঐ তো ঐ তো সেই পাথরটা, দেখতে পাচ্ছিস ?

হেমলতা : হ্যাঁ, মনে আছে।

তারানাথ : কি মনে আছে ?

হেমলতা : ঐ পাথরটার ওপর বসে বসে তুমি আমাকে তারা, নক্ষত্র ইত্যাদির গল্প বলতে। **(একটু থেমে যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে)** বাবা, কলকাতায় তারায় ভরা আকাশটা যেন মনের এক কোণে তলিয়ে পড়ে থাকত। কিন্তু এখানে এই গাঁয়ে আসার পর মনটাও এই চৈত্র পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতোই চারদিকে যেন ছড়িয়ে পড়েছে, তাই না ?

তারানাথ : উন্মুক্ত প্রসারিত আকাশের মতো তোর মনটাও একেবারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে...তাই তো ! **(হেসে উঠে।**

একটু থেমে) ও, হ্যাঁ কটা বাজল বল দিকি (**নীচু গলায়**) গাড়ীর সময় হয়ে গেছে কি ?

হেমলতা : বাবা, তুমি ভাবছ (**একটু হেসে**) জ্যোৎস্না আমার সত্যি সত্যিই ভালো লাগে না, স্রেফ...

তারানাথ : (হেমলতার কথায় কান না দিয়ে) ওর জন্যেই তো ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করছি। (**হাসতে হাসতে**) মন্দ কি ? বীরেন ছেলে হিসেবে ভালোই, জানিস তো, ওকে এখানে আসার কথা বলেছি ! দেখি গাঁয়ের পরিবেশ ওর মনকে নাড়া দেয় কিনা।

হেমলতা : ও তো জন্ম থেকেই শহরে শহরে !

তারানাথ : একরকম তাই। ও বলে, ছোট বেলায় বাবা মারা যাবার পর বেরিলী চলে গেছল আর তারপর লক্ষ্ণৌ, সেখান থেকে সোজা কলকাতা।

হেমলতা : আমাকেও তো তুমি একেবারে ছোট বেলাতেই কলকাতায় নিয়ে চলে গেছলে। আর তারপর গাঁয়ে নিয়ে এলে এই প্রথম।

তারানাথ : আমি তোকে নিয়ে এসেছি না তুই আমাকে নিয়ে এসেছিস ?

হেমলতা : আসার পর থেকেই যেন আমি এ গাঁয়ের মেয়ে হয়ে গেছি, তাই না বাবা ? যেন মনে হচ্ছে কত যুগ যুগান্তের পরিচয় এ-গাঁয়ের সঙ্গে। (**উল্লসিত ভাবে**) এই আমার ফাটল-ধরা পুরোনো বাড়ী যেন বৃদ্ধ বয়সের কুঁচকে পড়া হাসিমুখ। সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ যার ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আর এই জ্যোৎস্না— এ যেন তার হাসির প্রতিটি ঝলকেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছে। (**তন্ময় হয়ে**) কলকাতায় চৈত্র পূর্ণিমার চাঁদের আলো যেন ঈদের চাঁদ। কিন্তু এখানে ঝোপঝাড়ের ওপর, বাঁশবনের ওপর, মাঠঘাটের ওপর জ্যোৎস্নার আলো অকৃপণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আহা কী অপরূপ ! (**অপরিমিত সুখানুভূতির আবেগ**)

(**নেপথ্যে :** হেমদিদি চা তৈরী !)

তারানাথ : এত দেরিতে চা ?

হেমলতা : আয়ার জিদ আর কি ? বলে শীত আসছে, একটু চা খেয়ে নাও। (**বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে**) এখানে, বাগানে নিয়ে এসো ! আর দুটো মোড়াও নিয়ে এসো সঙ্গে করে !

তারানাথ : (**পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে**) তোর মা যদি তোর মতো বলতে লিখতে পারত, তাহলে সেও কবি বা তোর মতো আর্টিস্ট হয়ে যেত।

হেমলতা : যা বলেছ, তাই যদি হ'ত, মা আর তা হলে তোমায় কলকাতায় যেতে দিত না।

তারানাথ : আটকিয়ে তো ছিল। দু'চার ফোঁটা চোখের জলও ফেলেছিল। কিন্তু তোর কি মনে হয়, আমি যেতাম না ? না যেয়ে উপায় ? পুরো কেরিয়ারের প্রশ্ন। সে সময় জমিদারীর অবস্থা বেশ জম্‌জমাট ছিল ঠিকই, কিন্তু শেষে কি হ'ত— একবার ভেবে দেখেছিস ?

হেমলতা : কি আর হ'ত, এই গাঁয়েই একটা কোর্ট বসত। আর সেখানেই তুমি ওকালতি করতে কিম্বা জজ সাহেব হয়ে যেতে।

তারানাথ : বাবাঃ বেশ বলেছিস। তাহলে তো এখানেই একটা বড় হাসপাতালও হ'ত যেখানে তোর মায়ের চিকিৎসা করানো যেত। আর লেখাপড়ার জন্যে কলেজ হাইস্কুল এসবও এখানে থাকত, আর সিনেমা, থিয়েটার...(**আয়ার প্রবেশ। হাতে ট্রে। নিজের থেকেই বলে ওঠে**)

আয়া : বাবু, আমি তো তাই বলছি। হেমদিদির এখানে কেমন করে দিন কাটবে— সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, ক্লাব নেই। (**পিছন দিকে ফিরে ডেকে ওঠে**) আরে ও চেতুয়া ! টেবিলটা কোন চুলোয় নিয়ে গেলি ? দূর ছাই— এসব গেঁয়ো লোককে দিয়ে কি কোন কাজ হয় ! বকে বকে হয়রান ! (**চেতরাম এক হাতে ছোট টেবিল আর-এক হাতে মোড়া**

নিয়ে আসে।) ওখানে রাখ্ ... হ্যাঁ ব্যাস্। টেবিলের ওপর চায়ের ট্রে রেখে চা বানাতে থাকে। বাবু, আপনার জন্যে চা করব তো ?

তারানাথ : (**অন্যমনস্ক ভাবে মোড়ায় বসতে বসতে**) আমার জন্যে...

আয়া : (**চেতরামকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে**) আরে দাঁড়িয়ে কেন ? যা দৌড়ে আর-একটা মোড়া নিয়ে আয়।

চেতরাম : এক্ষুনি আনছি ! (**দৌড়ে যায়**)

আয়া : নাও, হেমদিদি। গরম জামাকাপড় না হয় অন্ততঃ গরম চা তো খাও ! (**চা দেয়**)

হেমলতা : তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমি বরফের চুটির উপর বসে আছি।

আয়া : (**আর একটি চা বানাতে বানাতে**) না, হেমদিদি। শহরের লোকের পক্ষে গাঁয়ের হাওয়াটা ভালো নয়।

হেমলতা : তুমিও তো গাঁয়ের লোক গো !

আয়া : জীবনের চার ভাগের তিন ভাগই তো কেটে গেল তোমাদের বাড়ীতে।

(**চায়ের কাপ রায়বাহাদুরকে দিতে দিতে**) নিন বাবু ! (**রায়বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে**) আরে !

তারানাথ : কেন, কি হ'ল ?

আয়া : আর আপনাকেও বলিহারি যাই, আপনিও এই খোলা জায়গায় বিলকুল নিশ্চিন্তে বসে আছেন ?

(**তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে যায়**)

হেমলতা : কোথায় যাচ্ছ ?

আয়া : (**তাড়াতাড়ি যেতে যেতে**) ড্রেসিং গাউন আনতে। বাবুর বেয়ারা কলকাতা থেকে এলে কি আর এমন হ'ত ? (**চলে যায়**)

তারানাথ : হাঃ হাঃ হাঃ ! গুড ওল্ড আয়া ! (**চা খেতে খেতে**) ও ভাবে, সারা তুনিয়াটাই বুঝি আপন ভোলা বাচ্ছা ছেলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ও একাই যেন সবায়ের মা সেজে বসে আছে।

হেমলতা : আচ্ছা বাবা, সত্যি সত্যি কি এর গাঁ সহ্য হয় না ? আমার তো বিশ্বাস হয় না। কিন্তু··· (**চেতরাম মোড়া নিয়ে আসে**) মোড়াটা ওখানে টেবিলের কাছে রেখে দাও।

তারানাথ : আমাকে ঐ পুরোনো মোড়াটা দাও। ওতে কোমরটা ঠিক সেট হয়ে বসে। (**একটু থেমে চেতরামকে উদ্দেশ্য করে**) হ্যাঁ, তোমার নাম কি ?

চেতরাম : হুজুর, চেতরাম।

তারানাথ : থাক কোথায় ?

চেতরাম : আজ্ঞে মুসহর পাড়ায়।

তারানাথ : ওখানে একটা জায়গা ছিল— কয়েক ঘরের বাস— কিন্তু বড় নোংরা।··· বাবার নাম কি ?

চেতরাম : কমতুরাম !··· হুজুর এখন আর সেই নোংরা জায়গাটা নেই।

তারানাথ : আরে তুই কমতুর ছেলে ?

হেমলতা : হ্যাঁ, সেই নোংরা জায়গাটা আর নেই কেন ?

(**আয়ার প্রবেশ**)

আয়া : বাবু এই নিন ড্রেসিং গাউন। যখন এই ফাঁকায় বসবেনই··· আরে চেতু তুই দাঁড়িয়ে কেন ?

তারানাথ : (**ড্রেসিং গাউন পরতে পরতে**) আয়া, এ হ'ল সেই কমতুর ছেলে গো— যে এখানে বছর পনেরো আগে কাজ করে গেছে···

আয়া : হ্যাঁ বাবু। আমি তো কমতুকেই ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু ও ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। যাক্, জানাশোনা লোক, চুরি চামারি করলে ধরা মুশকিল হবে না।

হেমলতা : তোমার শুধু...

আয়া : দিদিভাই। এখন আর সেই সাদাসিধে গ্রাম নেই। বুঝলে ? তোমার আমার মতো লোককে ঠকানো এখন এদের পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। চেতু, চায়ের ট্রেটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসিস। খাট-বিছানা সব ঠিক করতে হবে আবার। (**যেতে যেতে**) দেখি, আবার বাবুর্চীর রান্না হল কিনা ! (**প্রস্থান**)

তারানাথ : ডিয়ার ওল্ড আয়া ! (**চায়ের কাপটা নিয়ে**)

হেমলতা : চেতরাম !

চেতরাম : আজ্ঞে দিদি !

হেমলতা : তোমাদের পাড়া এখন আর নোংরা নয়, কেন ?

চেতরাম : পুরো লোকালয়টাই যে একেবারে ধুয়ে গেছে, দিদি !

তারানাথ ধুয়ে গেছে ?

চেতরাম হ্যাঁ, হুজুর। গত বছর দারুণ বন্যা হয়েছিল ওতেই আমাদের গ্রাম একেবারে শেষ হয়ে গেছে। চল্লিশ ঘরের বাস। আমার দাদার কাঠা আষ্টেকের একটা ক্ষেত ছিল। কত কষ্টে মহাজনের কাছ থেকে জমিটা ছাড়িয়ে ছিল। এখন সেটা নদীর বালিতে ঢেকে নষ্ট হয়ে গেছে। কানুকাকার চারটে ছাগল ছিল। সব বন্যার জলে...

তারানাথ : সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি ?

চেতরাম : কথাবার্তা তো চলছে... কিন্তু, এখনো তো আমরা পাহাড়ের কাছে তরাই-এ চলে গেছি। নতুন গাঁ বসেছে সেখানে।

তারানাথ : তা ভালো। কিন্তু ওখানকার জমি তো ভালো নয়। জমিতে রস কোথায় ওখানে ?

চেতরাম : অসুবিধা তো হচ্ছেই। কলসীতে করে জল এনে এনে দশ-পনেরো জন মিলে জমি তৈরি করছে। একটা বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে অসুবিধা ঘুচবে।

তারানাথ : তোমরা তো অনেক কিছু করেছ, দেখছি !

হেমলতা : কিন্তু ঝঞ্ঝাট অনেক। এদের দিন চলে কি করে ?

তারানাথ : এই চাকরিবাকরি ইত্যাদি যখন যা পায়।

চেতরাম : হুজুর সে তো আছেই। কিন্তু লোকে এখন বাঁশের কাজকর্ম করে। বাঁশের ঐসব জিনিসপত্র হাটে বাজারে বেশ ভালো দামে বিক্রি হয়। এর চেয়েও ভালো ভালো মোড়া তৈরি হয়।

তারানাথ : আচ্ছা ? তাহলে ভাই আমার জন্যে এক সেট্ নিয়ে এসো।

চেতরাম : নিশ্চয়ই আনব, হুজুর। দাদা তো রাতদিন এই নিয়েই আছে। আমিও রঙবেরঙের ঝুড়ি তৈরি করতে পারি। আমার তৈরি ঝুড়ি লোচনদার খুব পছন্দ। বলে শহরে নিয়ে গেলে ঐগুলো নাকি একেবারে পড়তে পাবে না।

হেমলতা : আচ্ছা, বাড়ীতে তাহলে তোমার দাদা আছে ?

চেতরাম : **(হাসতে থাকে)** না, দিদি, লোচনদা ? লোচনদা তো সার্বজনীন দাদা। কথায় বলে...

তারানাথ : সার্বজনীন দাদা।

(**নেপথ্যে :** 'চতু ও চতু')

চেতরাম : চা নিয়ে যাব, হুজুর ?

তারানাথ : হ্যাঁ, হেম, তোর আর চা লাগবে না তো ?

হেমলতা : উঁ, না, না। নিয়ে যাও।

(চেতরাম ট্রে নিয়ে যায়। রায়বাহাদুর ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত রেখে ঘুরে বেড়াতে থাকেন)

তারানাথ : এই হচ্ছে এদের জীবন। এরা যেমনি গরীব আর তেমনি নোংরা। তখন তো এদের পাড়া দিয়ে নাক না বন্ধ করে যাওয়া যেত না। এর বাপটা বেশ খাটিয়ে লোক ছিল। এক কথায় এরা পরিশ্রমী, কিন্তু হলে কি হবে লোকগুলোর মাথায় কিচ্ছু নেই।

হেমলতা : বাবা, তোমার মনে আছে, আমাদের আর্টের মাস্টারমশাই-এর আঁকা সেই ছবিটা, "চাষীর সন্ধ্যা"। কাঁধে লাঙ্গল, সামনে বলদ, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত চাষী, সূর্যাস্তের রঙিন আকাশের শোভা— কিন্তু সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই।

তারানাথ : উনি ছবিটার দাম করেছিলেন পাঁচশো টাকা না?

হেমলতা : বাবা, চেতরামের মুখের সঙ্গে ছবিটার ঐ চাষীর মুখ অনেক মিলে যায়, তাই না বল?... মাস্টারমশাই বলতেন গ্রামের জীবন আর গ্রামীণ দৃশ্যের মধ্যে অগণিত মাস্টারপীসের জিনিস ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে যেন শতাব্দীর অবসাদ। এদের মুখে চোখে যেন এক যুগের অন্ধকার। অমৃতা শেরগিল...

তারানাথ : অমৃতা শেরগিল! ওর সব ছবিতেই মৃত্যুর করাল ছায়া।

হেমলতা : ও তো যার যার নিজের অ্যাটিচিউড। নিজের অঙ্কন-ভঙ্গী! কিন্তু বাবা, এটা তো স্বীকার করবে যে শেরগিলের রঙে ভারতের গাঁয়ের মাটির স্পর্শ ফুটে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমার বুরুশ, আমার তুলি যেন এখানে আসার পর নতুন দৃষ্টি খুঁজে পেয়েছে। এখানে কত ছবি তোলা যায়! গম পেকে আসছে এমন ক্ষেতে চকিতনয়না কৃষক কন্যা! রঙবেরঙের ঝুড়ি বানাচ্ছে এইরকম কোন চেতরামের বাপ! সকালবেলায় সূর্যের আলোয় ধূসর রঙের গোরুর দুধ দুইছে গোয়ালা···

তারানাথ : আর এই চাঁদের আলো! (**হাসতে থাকে**) কিন্তু হেম, ঐ ছবিটা তৈরি শেষ হয়েছে তো?

হেমলতা : কোন্‌টা?

তারানাথ : আরে... সেই... সেই আসল ছবিটা!

হেমলতা : বাবা, তুমি না! (**লজ্জিত ভাবে**) বীরেন পনেরো মিনিটের জন্যেও একভাবে বসে থাকতে পারে না। কেবল এদিক-ওদিক দৌড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।

তারানাথ : এখন মনে হচ্ছে, বাবু হয়তো কোথাও সত্যিই লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন !

হেমলতা : মিছামিছি তুমি টাঙ্গাটাকে পাঠালে। ও তো হেঁটেই আসতে পারত। ওর পায়ে এখন শনিবারের তাড়া...

(হঠাৎ পিছন থেকে বীরেনের আবির্ভাব)

বীরেন : শনিবার নয়, আজ তো শুক্রবার। আর সেইজন্যেই তুমি টাঙ্গা পাঠাতে ভুলে গেছ ?

হেমলতা : বীরেন !

তারানাথ : বীরেন ! তুমি স্টেশনে টাঙ্গা পাও নি ?

বীরেন : না, বাবা। টাঙ্গা তো কই দেখলাম না, হয়তো...

তারানাথ : আচ্ছা আহাম্মক তো এই কোচওয়ানটা। রাস্তা তো একটাই।

বীরেন : যাকগে, ছেড়ে দিন। হেঁটে আসায় আমার একটা কাজ হয়ে গেল।

তারানাথ : তোমার জিনিসপত্র কোথায় ?

হেমলতা : চেতু ! (**জোরে ডাকে**) আয়া, চেতুকে একটু পাঠিয়ে দিয়ো তো ! মালপত্র...

বীরেন : মালপত্তর তো স্টেশনেই চৌধুরী জং বাহাদুরের হেপাজতে ছেড়ে এসেছি।

তারানাথ : আচ্ছা, তোমার সঙ্গে চৌধুরী জং বাহাদুরেরও দেখা হয়েছিল ?

হেমলতা : প্রত্যেক গাড়ীতেই কোন-না-কোন আগন্তুক যাত্রীকে নিয়ে আসবার জন্যে যেতে হয়। সুতরাং চৌধুরীর সঙ্গে দেখা না হবার কি আছে ?

বীরেন : কিন্তু ঐ এক মহা বিরক্তির ব্যাপার, কামাই নেই কিছু নেই প্রত্যেক গাড়ীর জন্যেই স্টেশনে হাজির থাকতে হবে।

তারানাথ : এই ছোট্ট স্টেশনে দুটোই তো মাত্র গাড়ী আসে। তবুও চৌধুরী না থাকলে যেন স্টেশনের জৌলুস থাকে না।

বীরেন : ঠিক বলেছেন। ওর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন দ্বীপে দাঁড়িয়ে থাকা দিশেহারা এক নাবিক।

হেমলতা : এখানে চৌরঙ্গীর মতো গাড়ীঘোড়া পাবার আশা করাটাই তো ভুল।

বীরেন : **(অট্টহাস্য করে)** বেক্‌নের সেই কথাটা মনে আছে? "এক গাদা লোকের মধ্যেও কোন চেনাশোনা লোক না থাকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও নিজেকে বোবাই মনে হয়।" কিন্তু তুমি কি করে ভাবলে যে আমি পায়ে হেঁটে আসতে পারব না।...আমি তো একরকম চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে এসেছি।

তারানাথ : চৌধুরী বোধ হয় তোমাকে ওর সেই আদ্যোপান্ত কাহিনী শোনাতে শুরু করে দিয়েছিল।

বীরেন : আজ্ঞে হ্যাঁ, ও বলছিল ও বছরে একবার কলকাতায় রেস খেলতে যায়। আর গভর্নর সাহেব নাকি ওকে একবার ডিনারে ডেকেছিলেন সেই নিমন্ত্রণ পত্র এখনো ওর কাছে আছে আর এ গাঁয়ে যতবার কালেক্টার সাহেব এসেছেন তার দিন তারিখ সব ওর মনে আছে।

হেমলতা : **(আশ্চর্য হয়ে)** আরে ব্যাস্‌!

তারানাথ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিজেকে জাহির করার ব্যাপারে এ অঞ্চলে চৌধুরীর জুড়ি নেই।

বীরেন : ওকে দেখলেই মনে হয়, লোকটা একটু হামবড়িয়া ধরনের। তাই ও স্টেশনে আমার মালপত্রগুলো দেখবার ভার নেওয়া মাত্রই আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাস্তা ছেড়ে ক্ষেতের ওপর দিয়ে বস্তির দিকে যাত্রা শুরু করে দিলুম। **(আয়ার প্রবেশ)**

আয়া : বীরেনবাবু, আগে একটু গরম চা খাবেন, না একেবারেই খাবার বন্দোবস্ত করব...!

বীরেন : আরে, হ্যালো হ্যালো আয়া, কেমন আছ?

আয়া : আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু আপনি আসার আগে হেমদিদিকে নিয়ে একেবারে হুড়োহুড়ি পড়েছিল। না হলে...

হেমলতা : না হলে কি ? কলকাতায় ঐ হুড়োহুড়ির চেয়ে গাঁয়ের এই শান্তশিষ্ট ভাব আমার ভালোই লাগে।

তারানাথ : আয়া, হেমের এসব কথাবার্তার মানে তুমি বুঝবে না।

বীরেন : কিন্তু, আয়া আমি তো এখন এখানে জঙ্গল মে মঙ্গল করতে এসেছি।

আয়া : ভগবান করুন, ঐ শুভদিন শীগ্‌গিরই আসুক। আমি তো হেমদিদিকে...

হেমলতা : আঃ থামাও দিকি ঐসব কথা...

তারানাথ : (**অট্টহাস্য করে**) হাঃ হাঃ হাঃ !

বীরেন : না না, আমি অন্য কথা বলছিলাম। আমি একেবারে এ গাঁয়ের চেহারাটা পাল্টে ফেলতে চাই। এ গাঁটা যেন ঠিক আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল ···

হেমলতা : বীণার তার ওস্তাদের আঙুলের অপেক্ষা করছে ! (**একটু হেসে**) তাই না !

তারানাথ : হাঃ হাঃ হাঃ। বীরেন, মেয়ে আমার একেবারে চৌকশ তাই না ?

বীরেন : কিন্তু বীণার সুরে সে জোর কোথায়, যা দিয়ে এক নতুন পৃথিবী তৈরি হতে পারে।

হেমলতা : (**ব্যঙ্গ করে**) কলম্বাস !

তারানাথ : নতুন পৃথিবী নির্মাণ। বেশ ইণ্টারেস্টিং, বলো বলো।

বীরেন : যে রাস্তা দিয়ে এলাম— শর্টকাট্, ঐ রাস্তার ধারে যে জমিটা আছে একটু উঁচু সমতল জায়গা— ঐ জমিটা দেখে আমার মনে হল এবং আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি যে···

আয়া : বীরেনবাবু!

বীরেন : (**নিজের কথাই চালিয়ে গিয়ে**) একেবারে 'আইডিয়াল' জায়গা। যেন একেবারে ঠিক এইজন্যেই তৈরি হয়ে আছে।

তারানাথ : কিজন্যে তৈরি হয়ে আছে?

আয়া : বাবু, বীরেনবাবুর কথা তো শেষ হবে না, কিন্তু আমার যে এক গাদা কাজ বাকি।

হেমলতা : (**চঞ্চল হয়ে**) এর জন্যে খাবার তৈরি করো-না, আয়া!

বীরেন : (**নিজের কথাতেই মত্ত হয়ে**) বাবা, আমার মতে এর চেয়ে ভালো জায়গা···

তারানাথ : না, না, বীরেন! আগে আয়া যা বলছে শুনে নাও। হেম, বীরেনকে আগে ওর ঘরটা দেখিয়ে দাও। একটু গরম জলের বন্দোবস্ত করো। তারপর আমাকে খবর দিয়ো।

আয়া : কিন্তু এখন হিম পড়তে শুরু করেছে। বেশীক্ষণ বাইরে থাকা কি ঠিক হবে, বাবু?

তারানাথ : ব্যাস্, এই এবার উঠছি বলে। এর মধ্যে চৌধুরী সাহেব এসে গেলে ওঁর সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে নিতাম। সেইজন্যেই···

বীরেন : (**যেতে যেতে**) কিন্তু বাবা, আপনি ভেবে দেখুন, গ্রামোদ্ধার সমিতির পক্ষে পাহাড়ের নীচে ঐ জায়গাটার চেয়ে উপযুক্ত আর কোন জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। আমি ওদেরকে ··· (**প্রস্থান**)

তারানাথ : গ্রামোদ্ধার সমিতি! বেশ খেয়াল আছে তো। এককালে আমিও (**সামনের দিকে তাকিয়ে**) কে? চেতু! আরে তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

চেতরাম : হুজুর ··· (**থেমে যায়**)

তারানাথ : কি, গরম জল তৈরি হয় নি?

চেতরাম : গরম জল বসিয়ে এসেছি, হুজুর। আর ঘরও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তারানাথ : বেশ করেছিস।

চেতরাম : হুজুর! (**একটু ঘাবড়ে গিয়ে থেমে যায়**)

তারানাথ : কি ব্যাপার কিছু বলবি ?

চেতরাম : হুজুর, পাহাড়ের নীচের ঐ জমিটা!

তারানাথ : কোন্ জমিটা ?

চেতরাম : নতুন বাবু যে জমিটা নেবার কথা বলছেন।

তারানাথ : বীরেন! আচ্ছা, আচ্ছা যে জমিটায় গ্রামোদ্ধার সমিতি বসাতে চাইছে।

চেতরাম : কিন্তু হুজুর! ওতে তো আমরা সব ঘরবাড়ী তৈরি করে ফেলেছি। আট-দশটা বাঁশের ঘর বানিয়ে ফেললেই আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

তারানাথ : তোদের মুসহর পাড়ার কথা বলছিস তো ? তোরা যেখানে বাড়ীঘর করবি সেখানেই বসতি বসবে। কিন্তু গাঁয়ে যেসব উন্নয়নের কাজ হবে ··· (**টাঙ্গায় ঘোড়ার খুরের শব্দ**) কে এল ? টাঙ্গাটা এল নাকি ? যা তো, বীরেনবাবুর মালপত্র নামিয়ে নিয়ে আয় তো। (**চেতরাম বাইরে যায়। টাঙ্গা থেমে যাওয়ার আওয়াজ**) চৌধুরী সাহেব নাকি ?

বালেশ্বর : (**বাইরে থেকে কথা বলতে বলতে আসে**) আজ্ঞে, চৌধুরী সাহেবই আমাকে মালপত্রের সঙ্গে পাঠিয়েছেন। আমার নাম বালেশ্বর ওরফে বি. পি. সিন্হা। আর এই হল করমচাঁদ বরৈঠা। (**করমচাঁদ বরৈঠা নমস্কার করে**) বাচ্চুবাবুর খুড়তুতোভাই। আমি চৌধুরী সাহেবের ভাইপো হই।

তারানাথ : চৌধুরী সাহেব কোথায় গেছেন ?

বালেশ্বর : আজ্ঞে, টাঙ্গায় এসেছেন বলে ওঁর নৈশভ্রমণের 'কোটা' এখনও পূর্ণ হয়নি। তাই আবার ঘুরতে বেরিয়েছেন।

তারানাথ : (**হেসে**) তা বেশ বেশ!

করমচাঁদ ঃ আমরা ভাবলাম, আপনার মালটাও পোঁছে দিই আর একটু দেখাও করে আসি।

বালেশ্বর ঃ আজ্ঞে ব্যাপারটা হচ্ছে, গাঁয়ে কেমন যেন জীবন-হীন··· মর মর ভাব।

করমচাঁদ ঃ যেদিন থেকে শহর ছেড়ে এখানে এসেছি সেদিন থেকেই যেন একরকম বন্দী হয়ে আছি। "ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ ' !

তারানাথ ঃ শহরে কি করতে ?

বালেশ্বর ঃ করমচাঁদ তো ইণ্টারমিডিয়েট অবধি পড়ে চলে এসেছে আর আমি...

করমচাঁদ ঃ পরীক্ষায় এমন যা তা 'কোশ্চেন' করেছিল যে কেউই...

বালেশ্বর ঃ আমি বি. এ. পড়ছিলুম। একটা অফিসে কেরানীর চাকরির জন্যে দরখাস্তও দিয়েছিলুম। কিন্তু সুপারিশ না থাকার জন্যে...

তারানাথ ঃ কেরানীর চাকরি কি হবে ? তোমার তো বেশ কয়েক বিঘে জমি আছে হে !

বালেশ্বর ঃ লেখাপড়া করেও যদি চাষবাস করতে হয় ! 'পড়ে ফারসী আর ব্যাচে তেল'।

করমচাঁদ ঃ তাছাড়া শহরের জীবনে আলাদা একটা 'চার্ম' আছে। খাবার জন্যে হোটেল, বেড়াবার জন্যে মোটরগাড়ী. ফুর্তির জন্য সিনেমা।

তারানাথ ঃ থাকতে কোথায় শহরে ?

বালেশ্বর ঃ শহরে আবার থাকার ভাবনা কি ? চার আঙুল জমিই তো যথেষ্ট।

করমচাঁদ ঃ শহরের রাস্তাগুলোও তো এখানকার বৈঠকখানার চেয়ে ভালো। রাতদিন হৈ-হুল্লোড়, কত রঙবেরঙের জিনিসপত্র !

তারানাথ : এসব তো ভাই, মানতে পারলাম না। আমার ছোটবেলা এবং যৌবনের অনেকগুলো বছর আমি শহরে কাটিয়েছি।

বালেশ্বর : জজ সাহেব, তখনকার কথা ছেড়ে দিন।

করমচাঁদ : আর তা ছাড়া, ছোট বয়সে শহরের ঐ সুন্দর জীবনের সঙ্গে গাঁয়ের জীবন তুলনা করার সুযোগই বা কোথায়?

তারানাথ : সুন্দর! দূর, দূর! শহর তো আজকাল একেবারে যা তা হয়ে গেছে।

করমচাঁদ : দেখুন, কাঁধের ঢাক পেটালে পরে তবেই সিদ্ধ হয়। ভেবেছিলাম, কিছু লেখাপড়া জানা লোক নিয়ে একটা ক্লাব করব।

বালেশ্বর : কিন্তু লোকে তাও করতে দেয় না।

তারানাথ : কে করতে দেয় না?

করমচাঁদ : ও এখানকার পলিটিক্সের খবর জানেন না বুঝি?

তারানাথ : এখানেও পলিটিক্স?

বালেশ্বর : তবে আর বলছি কি! আমি আর করমচাঁদ একটা বেশ ভালো করে ক্লাব করতে চেয়েছিলাম। একজন সভাপতি, দুজন সহ সভাপতি, একজন সম্পাদক, দুজন যুগ্ম সম্পাদক আর পাঁচজন কমিটি মেম্বার।

করমচাঁদ : কিন্তু দেখুন! (একটা কাগজ বার করে রায় সাহেবকে দেখায়) এই ধরনের লেটার প্যাড্ ছাপাবার ইচ্ছে ছিল। ওপরে ক্লাবের নাম থাকবে আর তার নীচে সবায়ের নাম আর...

বালেশ্বর : কিন্তু মুশকিল হল এই যে ঠাকুরদের পাড়ার ধরম সিং আর কৃষ্ণকুমার সিং এদের দুজনকে সহ সভাপতি বানাতে হবে আর ওদের পাড়া থেকে তিনজন কমিটি মেম্বার নিতে হবে। আমি বললাম, তোমরা একজন যুগ্ম সম্পাদক নাও আর দুজন কমিটি মেম্বার নাও।

তারানাথ : ওরা তো সব শিক্ষিত লোক।

করমচাঁদ : আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাট্রিক অবধি পড়েছে।

তারানাথ : তারপর ?

করমচাঁদ : নিজেদের সব লাট সাহেব ভাবেন ওরা। বলে কি ক্লাব হলে ওদের পাড়াতেই করতে হবে।

বালেশ্বর : আপনিই বলুন, আমরা থাকতে ঠাকুরদের পাড়ায় কি করে ক্লাব খোলা সম্ভব ?

করমচাঁদ : আপনিই বলুন।

তারানাথ : ভাই, এসব ব্যাপারে তোমরা বীরেনের সঙ্গে কথা বলো। ঐ বীরেন এসে গেছে।

বীরেন : (হেমের সঙ্গে আসতে আসতে) হ্যাঁ, বাবা। গ্রামোদ্ধার সমিতির ব্যাপারে এখনও আমার কথা শেষ হয় নি।

তারানাথ : বীরেন, তুমি ও ব্যাপারে এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলো। এই হচ্ছে বালেশ্বর ওরফে বি. পি. সিন্‌হা, আর এই করমচাঁদ বরৈঠা। এ গাঁয়ের দুজন শিক্ষিত যুবক। একটা ক্লাব খুলতে চায়। আচ্ছা, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি এবার চলি। (হেম, বীরেনকে বেশীক্ষণ দেরি করতে দিসনি।)

(প্রস্থান)

বীরেন : গ্রামে ক্লাব খুলতে চান ? বেশ তো, ভালো কথা।

বালেশ্বর : আজ্ঞে হ্যাঁ। এই দেখুন, এই হচ্ছে আমাদের লেটার প্যাড আর নিয়মাবলীর ফর্ম। কিন্তু কথাটা হচ্ছে...

বীরেন : আসুন, আমার ঘরে আসুন। এদিক দিয়ে আসুন। হেম, একটু দাঁড়াও আমি এখুনি আসছি।

(বালেশ্বর ও করমচাঁদের প্রস্থান)

হেমলতা : আমি এখানেই আছি। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করো। নাহলে আবার জান তো, আয়া জিজ্ঞাসা করবে...

বীরেন : তুমিও বরং এসো-না ? কি রকম জমজমাট প্ল্যান করেছি। শুনলে চমকে যাবে।

হেমলতা : ঘরে যাব ! এখানে দেখেছ কি সুন্দর জ্যোৎস্না !

(**বাইরে দূরে সম্মিলিত কণ্ঠে গানের আওয়াজ**) ঐ শুনছ, গানের সুর ! আহা, যেন জ্যোৎস্না কথা কইছে।

বীরেন : (যেতে যেতে দুষ্টুমির সুরে (আমি তো শুধু একজনেরই চাঁদের মতো মুখ দেখছি আর শুনছি নিজের বুকের মধ্যে ধড়পড়ানি। (**হাত নাড়িয়ে**) টা ··· টা ··· (**প্রস্থান**)

হেমলতা : (**মিষ্টি হাসি হেসে**) যাঃ কি অসভ্য ··· !

(**সম্মিলিত সুরে গানের শব্দ জোর হয়। নারী ও পুরুষের মিলিত কণ্ঠস্বর**)

··· **গান** ···

(**গান চলাকালে তাড়াতাড়ি চেতরাম এসে বাইরের দিকে যায়**)

হেমলতা : কে ? চেতু ? কোথায় যাচ্ছ ?

চেতরাম : ঐ ... ঐ ... গান ...

হেমলতা : বড় সুন্দর গান !

চেতরাম : আমার পাড়ার দল। প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে ওরা সারা গ্রামের চারদিকে ঘোরে।

হেমলতা : এদিকেই তো আসছে না ?

চেতরাম : সামনে রাস্তায়। ঐ দেখুন। আরে ঐ দেখুন—ঐ যে আমাদের লোচনদাকে দেখা যাচ্ছে।

হেমলতা : কই কোন্‌টা ?

চেতরাম : ঐ যে মির্জাই পরে। আমি যাচ্ছি, দিদি। ওরা আমায় ডাকছে। (**প্রস্থান**)

(**গানের সুর নিকটে এসে আবার দূরে মিলিয়ে যায়**)

হেমলতা : (গানের সুর ক্ষীণ হয়ে আসে) আহাঃ কি মধুর গান !

আয়া : হেম দিদি, ও হেম দিদি ! বলি আর কতক্ষণ এভাবে বাইরে থাকবে ?

হেমলতা : **(জোরে)** এই যে আসছি আয়া। **(আবার ক্ষীণ সুরে)** জ্যোৎস্না আর আমি! আমি আর বীরেন! কিন্তু এই গান আর ঐ ··· ঐ ··· লোচন! **(ভাবতে ভাবতে প্রস্থান)**

(পর্দা পড়ে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পনেরো দিন পরে। স্থান ঐ একই। সকাল বেলা। বাইরে রায়বাহাদুর এবং আর-এক ব্যক্তির কথা-বার্তার শব্দ। একটু পরে হো হো করে হাসতে হাসতে রায়বাহাদুরের প্রবেশ।)

তারানাথ : (**হাসির শব্দ**, হোঃ হোঃ হোঃ বা ভাই বা! শুনেছিস হেম? ও হেম?

হেমলতা : (**নেপথ্যে থেকে**) আসছি বাবা!

তারানাথ : হোঃ হোঃ হোঃ (**হাসির শব্দ**)

(হেমের প্রবেশ। হাতে একটি বড় ছবি আর রঙের তুলি)

হেমলতা : কি হয়েছে বাবা?

তারানাথ : চৌধুরী সাহেব বড় মজার লোক বুঝলি! এই মাত্র আমাকে দরজা অবধি ছাড়তে এসেছিলেন এর সঙ্গে প্রাতঃ-ভ্রমণে না বেরোলে বোধ হয় আমি এই পাড়াগাঁয় এতদিনে বোবা আর কালা হয়ে যেতাম।

হেমলতা : আপনার তো আজ ওনার বাড়ী অবধি যাবার কথা ছিল।

তারানাথ : তাই ভেবেই তো গেছলাম যে কিছুক্ষণের জন্য ওর বৈঠকখানায় বসব। কিন্তু ও বাইরে থেকে চেঁচিয়ে বলল ওখানেই দাঁড়ান।

হেমলতা : আরে!

তারানাথ : বলতে লাগল, আগে আমি ওপরে যাই। তারপর আপনি কার্ড পাঠাবেন তবে বৈঠকখানায় আসা মঞ্জুর হবে। এই হল নিয়ম।

হেমলতা : (হাসতে হাসতে) দারুণ রকমের সাহেবি বন্দোবস্ত দেখছি।

তারানাথ : আরো শোন তো! বাড়ীতে ওঁর যে নিজস্ব কামরাটা আছে, তার বাইরে একটা ঘন্টি লাগানো আছে। ঘরের ভেতরে যেতে গেলে আগে ঘন্টি বাজাতে হবে। ঘন্টি না বাজিয়ে যদি কেউ ঘরে ঢোকে, তাহলে চৌধুরী সাহেব তার সঙ্গে কথা বলবেন না। সে ওর বউই হোক আর যেই হোক।

হেমলতা : মনে হচ্ছে, চৌধুরীমশাই মনুসংহিতার মতো কোন এটিকেট সংহিতা লিখছেন।

তারানাথ : মনের দিক থেকে ভদ্রলোক কিন্তু একেবারে খাঁটি মানুষ। একেবারে পাকা লোক। এতটুকু খুঁত নেই। অপরের একটা পয়সাতেও উনি হাত দেবেন না।

হেমলতা : সেইজন্যেই বুঝি বীরেন ওঁকে গ্রামোদ্ধার সমিতির অডিটর বানিয়েছেন।

তারানাথ : বীরেনকে বলেছিস চৌধুরী সাহেব হিসেবটিসেবের ব্যাপারে দারুণ কড়া। বলছিলেন, যেহেতু এই সংস্থায় ওঁর ভাইপো বালেশ্বর রয়েছে, সেইজন্যে এর প্রতিটি পাই-পয়সারও ওপর উনি নজর রাখবেন।

হেমলতা : বালেশ্বর লোকটা ভালো নয়— বড়ো ঝগড়াটে লোক।

তারানাথ : ঝগড়া তো গ্রামের প্রত্যেকটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

হেমলতা : আচ্ছা, আগেও কি গ্রামের অবস্থা এইরকমই ছিল নাকি?

তারানাথ : তা ছিল, কিন্তু এরকম হঠকারিতা ছিল না। আমি তা বলছি না যে, আগে গ্রামে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খেতো, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আগে গ্রামে শিক্ষিত ছেলেছোকরা বেশী একটা ছিল না তো।

হেমলতা : শিক্ষিত নয়, অর্ধশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ এক

জায়গায় বলেছেন, "হাফ বেক্‌ড কালচার !" আচ্ছা বাবা, তোমার কি মনে হয়, বীরেনের এই অদম্য উৎসাহ আর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে এই গাঁয়ের রূপ পাল্টে দেওয়া সম্ভব ?

তারানাথ : তোর কি মনে হয় ?

হেমলতা : বীরেন সেদিন বলছিল, গ্রামে পরিবর্তন আনতে গেলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, প্রয়োজন এক সম্পূর্ণ নতুন মানসিক ভিত্তির··· ।

তারানাথ : বীরেন ভালো বক্তৃতা দিতে পারে। ওর বক্তৃতায় জাদু আছে, বুঝলি ?

হেমলতা : হ্যাঁ, লোকজন একেবারে মোহিত হয়ে শোনে।

তারানাথ : আচ্ছা, আরো যে একটা পার্টি হয়েছে তার কি হ'ল ? গ্রামোদ্ধার সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, না ?

হেমলতা : এখনও পর্যন্ত তো হয়নি। কাল রাতে এ নিয়ে অনেক কথা-কাটাকাটি হয়েছে। বীরেন অনেক দেরিতে ফিরেছে। কে জানে কি হল।

তারানাথ : তা, আজ তো গ্রামোদ্ধার সমিতির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।

হেমলতা : হ্যাঁ, তুমি আজ মিটিং-এ যাবে না বাবা ?

তারানাথ : না, আমি তো বীরেনকে আগেই বলে দিয়েছি, আমি কোথাও যেতে পারব না। আমার···

(বীরেনের প্রবেশ। হাতে কাগজ। পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাতে লাগাতে)

বীরেন : কিন্তু বাবা, চৌধুরী সাহেব তো আসছেন।

তারানাথ : ওঁকে ঠিকমত জায়গায় বসিয়ো। ঠিক একেবারে নিয়মমাফিক।

বীরেন : (**হাসতে হাসতে**) হ্যাঁ, হ্যাঁ ওঁকে দেখাশুনোয় কোন ত্রুটি হবে না। বাবা, আপনি যদি ওখানে নেহাত নাই যান, তো অন্ততঃ আমার বক্তৃতার ড্রাফ্‌টটা দেখুন। (**কাগজটা দেয়**)।

তারানাথ : তুমি তো তৈরি না করেই ভাষণ দাও হে! **(কাগজটা পড়তে থাকে)**

বীরেন : আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আজ গ্রামোদ্ধার সমিতির পুরো প্ল্যানটা গ্রামের সামনে রাখতে হবে তো!...পড়ে দেখুন-না!

তারানাথ : **(পড়তে পড়তে)** বড় জোরদার স্কীম বানিয়েছ দেখছি।

বীরেন : আজ্ঞে, গোড়ার দিকটা একটু দেখুন। **(হেমলতার দিকে তাকিয়ে)** আর হেম, তুমি সমিতি ভবনে যে ছবিটা টাঙানো হবে, তা শেষ হয়েছে তো?

হেমলতা : একটা তো প্রায় তৈরিই আছে।

বীরেন : বাঃ, দারুণ জমকালো রঙ দিয়েছ, নাচের দৃশ্যটা দারুণ হয়েছে...বেশ। কিন্তু...এখানে...এই কোণে অন্ধকারে এরা কারা?

হেমলতা : কারা বলো দিকি?

বীরেন : **(থেমে একটু ভেবে)** নির্বাসিত... হতাশ কতকগুলো মানুষ!...

তারানাথ : **(পড়তে পড়তে)** বীরেন, তোমার গ্রামোদ্ধার সমিতিতে লাইব্রেরি, রীডিং রুম ইত্যাদি খুব গালভরা কথা দেখছি অনেক...

বীরেন : **(ছবিটাকে সরিয়ে রেখে)** তা না হলে আর গ্রাম জাগরণের মানে কি হল? নিজেদের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকার ক্ষমতা! গ্রামের ব্যথিত বোবা মানুষগুলোর কাছে এইরকম একটা ভাষণের খুবই প্রয়োজন। গ্রামের তরুণরা যাতে দেশের এই দুঃখদুর্দশার কথা জোর গলায় বলতে পারে—অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারে—সেজন্য তাদেরকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। আমি সমিতির লাইব্রেরিতে মার্কস লেনিন থেকে আরম্ভ করে স্পেন্সার, রাসেল ইত্যাদি সবার

বই রাখবার বন্দোবস্ত করব। এক নতুন আলো, এক নতুন ধরনের ভাবনা চিন্তা...ইনটেলেকচুয়াল ফারমেন্ট।

তারানাথ : তা ঠিক বীরেন। কথা তো অনেক হবে! কিন্তু বাবা, গ্রামের দারিদ্র্য আর এই নোংরা পূতিগন্ধময় পরিবেশ দেখেই যে সমস্ত সাফল্যের আশা একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

বীরেন : (**জোরের সঙ্গে**) একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছেন। দারিদ্র্য আর নোংরা পরিবেশ! এই দারিদ্র্য আর নোংরা পরিবেশ দেখেই তো আমার মাথায় রক্ত উঠে যায়। বেচারা গৃহহীন শিশু, বৃদ্ধের দল, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ জীর্ণবস্ত্র-পরিহিতা স্ত্রীলোকের দল— এদের কথা মনে হলেই মনে করুণার সাগর উথলে ওঠে। কিন্তু শুধু করুণা দিয়েই কোন কাজ হবে না। সেখানে ক্রোধের ঝড় তুলতে হবে। যে ঝড়ের প্রকাশ হবে স্বতঃস্ফূর্ত, যা থামবে না! আর এই ঝড় চালিয়ে যেতে গেলে এমন কিছু-সংখ্যক মানুষের প্রয়োজন যারা এই করুণা ও ক্রোধকে শান্ত না করেও— এ দুটি বস্তুর যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারে। পাকা উকীলের মতো জোরের সঙ্গে তারা জেরা করবে কিন্তু কখনও ফাঁদে পা দেবে না।

হেমলতা : (**ব্যঙ্গ সহকারে**) আহা, একেবারে পদ্ম জল!

বীরেন : (**আগের মতোই জোরের সঙ্গে**) হ্যাঁ, তাই ঘটবে। এরাই দেশের কথিত স্বপ্নবিলাসী সৌখিন লোকজনদের চোখের সামনে দিয়ে সমস্ত দুঃখদুর্দশাকে পায়ে দলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। (**একটু থেমে স্বাভাবিক গলায় বলে ওঠে**) কিন্তু, আমাকে তো এখন যেতে হয়। একটু আগে গিয়ে কয়েকটা ছোটখাটো ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে হবে, যাতে ফাংশানের সময় কোন ফ্যাসাদ না বাধে!... হেম, তুমি একটু পরে আসছ তো। বেশ, ছবিটবি ঠিক করে নাও। আমি চলি। (**প্রস্থান**)

তারানাথ : এই তো হল বীরেনের জাদু!

হেমলতা : জাদুমন্ত্র মানে তো শুধু গরম গরম বুলি।

তারানাথ : মাঝে মাঝে এখানকার সব-কিছু যেন কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগে। কত বছর পরে এলাম। মনে হচ্ছে, যেন চশমাটা শহরে ফেলে এসেছি... আর বীরেন আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেখো, গ্রামকে কেমন ও নিজের করে নিয়েছে।

হেমলতা : কিন্তু, বাবা, গ্রাম ওকে নিজের করে নিয়েছে তো ?... (**চেতরামের প্রবেশ**)

চেতরাম : হুজুর আপনার জলখাবার তৈরি।

তারানাথ : (**আসতে আসতে**) আচ্ছা। যাচ্ছি। (**যেতে যেতে ছবির দিকে নজর পড়ে**) হেম, বাঃ ছবিটা বেশ করেছিস তো !

হেমলতা : আর শুধু একটু টাচ্ দিতে বাকি, বাবা।

তারানাথ : নাচিয়েদের দৃশ্য বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু... কোণে ওরা কারা ?

হেমলতা : কারা বলো তো ?

তারানাথ : (**ভাবতে চেষ্টা করে**) যেন শুকনো নিরাশ সমস্ত মানুষ··· যাদের হাঁড়িতে বহু মেহন্নতেও দুবেলা দুটো ভাত জোটে না।

হেমলতা : বাবা, তুমিও তো কবি হয়ে উঠেছ, দেখছি !

তারানাথ : (**হাসতে হাসতে**) তোরই বাবা তো... আচ্ছা চলি রে। (**প্রস্থান**)

হেমলতা : (**চিন্তামগ্নভাবে**) শুকনো মর মর গাছ !··· কিম্বা বিতাড়িত হতাশ প্রাণী !··না··না··অন্য কিছু ! (**চেতরামের প্রতি**) চেতু, ঐ টুলটা নিয়ে এসো তো, এখানে বসেই একটু একটাকে ঠিক করে দিই।

চেতরাম : (**টুল রাখতে রাখতে**) এই নিন। রঙও কি এখানেই রাখব ?

হেমলতা : কই, এদিকে দাও। আমার ছবি আঁকার নেশাটা তোমাকেও পেয়ে বসেছে দেখছি। (**রঙ তৈরি করতে থাকে**)

চেতরাম : আজ্ঞে দিদি !

হেমলতা : শোনো, একটু পরে এই ছবিটা নিয়ে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

চেতরাম : কোথায় ?

হেমলতা : পাহাড়ের তলায় যেখানে বীরেনবাবুর সমিতির জলসা হচ্ছে, সেইখানে।

চেতরাম : (**বিরক্তির সুরে**) না, দিদি, আমি ওখানে যেতে পারব না।

হেমলতা : কেন ?

চেতরাম : দিদি, ওখানে আমরা গরীব মুসহরেরা আমাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই তৈরি করতে চেয়েছিলাম। এই সবে বাঁশ গাছের চারা লাগাতে শুরু করেছিলুম ওখানে। খেটেখুটে ঝুড়ি বানাই, ঘর তৈরি করি। বাঁধ তৈরি হলে ক্ষেতও বানাতুম...

হেমলতা : (**ছবি আঁকতে আঁকতে**) কিন্তু গ্রামোদ্ধার সমিতি তোমাদের দুঃখদুর্দশা দূর করতেই তো চাইছে।

চেতরাম : কে জানে, দিদি, কি হবে ! সমিতিতে অনেক রাত অবধি তো খুব তর্কাতর্কি চলে দেখি। কিন্তু...

হেমলতা : আর তা ছাড়া বীরেনবাবু তোমাদের কল্যাণের জন্যেই এত দৌড়োদৌড়ি করছেন। রাতদিন তোমাদের কথাই তো উনি ভাবছেন !

চেতরাম : (**উদাস ভাবে যেন নিজের থেকেই বলে ওঠে**) দয়ায় আমাদের দরকার নেই।

হেমলতা : (**চকিতে ওর দিকে ঘুরে তাকিয়ে**) তোমরা দয়া চাও না ? এ কথা তোমাকে কে বলল চেতু ?

চেতরাম : (**একটু সামলে নিয়ে**) লোচনদাদা বলেছে... দিদি।

(**রাস্তায় সম্মিলিত স্বরে মিছিলের আওয়াজ**)

গ্রামোদ্ধার সমিতি জিন্দাবাদ !

বি. পি. সিন্‌হা জিন্দাবাদ।
দেশের শত্রু খতম হোক!
গ্রামোদ্ধার সমিতি জিন্দাবাদ!

(আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যায়)

হেমলতা : চেতু, এসব কি ব্যাপার বলো তো? **(দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে থাকে)**

চেতরাম : বালেশ্বর বাবুর পার্টি ফাংশানে যাচ্ছে। করমচাঁদ বাবুর পার্টি এদের থেকে আলাদা হয়ে ঠাকুর পার্টির লোকজনদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

হেমলতা : কেন, কাল রাতে ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয় নি?

চেতরাম : তা জানি না... এই দেখুন আবার অন্য পার্টির লোকজনেরা যাচ্ছে। ঝগড়াঝাঁটি না হলে বাঁচি।

(রাস্তায় অন্য দলের শ্লোগানের আওয়াজ শোনা যায়)

করমচাঁদ জিন্দাবাদ!
করমচাঁদ জিন্দাবাদ!
গ্রামোদ্ধার সমিতি আমাদের সমিতি।
গ্রাম জাগরণ জিন্দাবাদ!
স্বার্থপর সিন্‌হা মুর্দাবাদ!

(আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যায়)

হেমলতা : **(চিন্তিত ভাবে)** চেতু, এরা তো সব লাঠি-সোঁটা নিয়ে যাচ্ছে দেখছি।

চেতরাম : আগের পার্টির সঙ্গেও তো হাতিয়ার ছিল।

(নেপথ্যে ডাকতে ডাকতে আয়ার প্রবেশ)

আয়া : চেতু, ও চেতু! দেখ তো ওখানে ঝামেলা কিসের?

চেতরাম : বালেশ্বরবাবুর পার্টি আর করমচাঁদ বাবুর পার্টি দুটোই তো বীরেনবাবুর ফাংশানে গেছে।

হেমলতা : সবাই লাঠিসোঁটা নিয়ে গেছে, আয়া!

আয়া : আর চেতু, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? শীগ্‌গির

যা, চৌকিদারকে থানায় খবর দিতে বল। কি জানে বাবু, কখন আবার ঝগড়াঝাঁটি না শুরু হয়ে যায়! শীগ্‌গির যা! লাঠি চলতে শুরু করলে বীরেনবাবু ঘেরাও হয়ে যাবে।...শীগ্‌গিরি দৌড়ে যা!

(**চেতরামের প্রস্থান**)

হেমলতা : আয়া, আমিও যাব। বীরেন যে একা পড়ে গেছে।

আয়া : না, দিদি, তোমাকে যেতে দোব না। (**চেতরামকে ডেকে বলতে বলতে চলে যায়**) চেতু, ফেরবার সময় ফাংশানের ওখান থেকে একটা চক্কর মেরে আসিস। (**হেমলতাকে উদ্দেশ্য করে**) হেমদিদি, বীরেনবাবু এ কোথাকার কি উট্‌কো ঝামেলা নিয়ে এলো বল দিকি?

হেমলতা : না না, ওর কথা সবাই মানবে।

আয়া : দিদি, গাঁয়ের হালচাল এখনো তুমি কিছুই বোঝ না। এখানের লোকজন ভালো নয়। তোমাদের পক্ষে ঐ কলকাতাই ভালো।

হেমলতা : (**বিরক্তির সুরে**) তোমার সব কথাতেই শুধু শহর আর শহর...

আয়া : আমি ঠিকই বলছি, দিদি। এই তো মাত্র পনেরো দিন হল তোমরা এখানে এসেছে। এর মধ্যেই বাবুর এখানে মন বসছে না। চৌধুরী সাহেব না থাকলে ওঁর দিন কাটাই মুশকিল হয়ে উঠত, আর তোমার...

হেমলতা : আমার বেশ ভালোই লাগছে। বেশ কয়েকটা স্কেচ তৈরি করে ফেলেছি এ ক'দিনে।

আয়া : আরে বাপু, এর চেয়েও ভালো গণ্ডা গণ্ডা ছবি তো তুমি কলকাতাতেও আঁকতে পারতে।

হেমলতা : তুমি বড় উল্টোপাল্টা বকো। আসলে আমরা সকলে তো গাঁয়েরই লোক। এই মাটিতেই তো আমরা জন্মেছি। বহুদিন পর আবার আমরা ফিরে এসেছি— সেই মাটির কোলে।

আয়া : দিদি, তোমায় এত কথা বোঝাবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু এটুকু বলতে পারি, উপড়ে ফেলা গাছের শেকড়ে যদি একবার হাওয়া পেয়ে যায় তো তাকে আর জমিতে বসিয়ে কোন লাভ হয় না। ফুল শুধু বাংলোর বাগানেরই শোভা বাড়াতে পারে।

হেমলতা : (**আয়াকে দেখতে দেখতে**) আয়া, তুমি বড় বাজে বকো।

(**নেপথ্যে আওয়াজ :** এদিকে ও দিকটা একটু ঠিক করে ধরো...হ্যাঁ এদিকে নিয়ে এসো....চেতু···তুই ওদিকে হাতটা ঠিক করে ধর !)

আয়া : আরে, কাকে নিয়ে আসছে এরা ? (**বাইরের দিকে তাকিয়ে**) এ যে দেখছি বীরেনবাবুকে নিয়ে আসছে। চোট্ খেয়েছে নাকি ? ওরে বাপ্ রে ! (**দৌড়ে বাইরে যায়**)

হেমলতা : (**ঘাবড়ে গিয়ে**) বীরেন ! বীরেন ! (**বাংলোর দিকে ঘুরে ডাকতে থাকে**) বাবা ! বাবা ! এদিকে এসো, (**নেপথ্যে :** কি হয়েছে ?) বীরেন আহত হয়েছে। অহো ! (**লাঠির স্ট্রেচারে অজ্ঞান অবস্থায় বীরেনকে নিয়ে চেতরাম এবং আর-এক ব্যক্তির প্রবেশ। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটুও বিচলিত হয়নি। তার পরনে চেতরামের মতোই জামাকাপড়।**)

আয়া : (**হতভম্ব হয়ে**) চেতু, আরে এ যে অজ্ঞান হয়ে গেছে। হায় ভগবান ! (**স্ট্রেচার মাটিতে রাখা হয়**)

ব্যক্তি : ভয়ের কোন কারণ নেই।

হেমলতা : (**স্ট্রেচারের ওপর মাথা নীচু করে**) বীরেন ! বীরেন ! (**ব্যস্তপদে তারানাথের প্রবেশ**)

তারানাথ : কি হয়েছে ! কি ! আরে ! এ যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে··· চেতু, কি হয়েছিল কি ?

চেতরাম : বাবু, দুই পার্টিতে লাঠিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছলো।

আর বীরেনবাবু সেই লড়াই-এর মধ্যে পড়ে গেছলেন। লোচনদা না থাকলে আজ যে কি হ'ত! নিজের বিপদের কথা না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও বীরেনবাবুর জান বাঁচিয়েছে।

ব্যক্তিঃ এঁকে এখুনি বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যান। পট্টি বাঁধা আছে।

হেমলতাঃ বীরেন! বীরেন!

তারানাথঃ আয়া, শীগ্গির ভেতরে নিয়ে যাও... চেতু, ঠিক করে শোয়াবি, বুঝলি! হেম, আমার ওপরের আলমারিতে লোশন আছে, দৌড়ে নিয়ে আয়।...

(আয়া, হেমলতা ও চেতরাম ধরাধরি করে বীরেনকে ভেতরে নিয়ে যায়)

তারানাথঃ আচ্ছা, লোচন কে?

ব্যক্তিঃ আমারই নাম লোচন।

তারানাথঃ তুমি বড় সাহসের কাজ করেছ বাবা। এই টাকা দশটা নিয়ে দৌড়ে থানার কাছে যে ডাক্তার আছে, ওকে একটু খবর দাও-না বাবা।

লোচনঃ টাকা রেখে দিন। ডাক্তারের কাছে আমি আগেই খবর পাঠিয়েছি। এখুনি এসে যাবে।

তারানাথঃ (**একটু বিস্মিতভাবে**) তুমি... তুমি এই গাঁয়েরই লোক?

লোচনঃ আজ্ঞে, এই গাঁয়েরও বটে আবার না-ও বটে।... আপনি বরং বীরেনবাবুকে একটু দেখুন গিয়ে।

তারানাথঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ যাই···(**প্রস্থান**)

(লোচন কোমরে বাঁধা কাপড় ছিঁড়ে নিজের বাঁ হাতের আহত জায়গাটার ওপর পট্টি বাঁধতে থাকে। আর ছবিটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে রাখে এবং ছবিটার দিকে তাকায়। এই সময় দ্রুতপদে হেমলতার প্রবেশ।)

হেমলতা : তোমার নামই লোচন ?

লোচন : আজ্ঞে হ্যাঁ।

হেমলতা : তুমিই বীরেনের জান বাঁচিয়েছ। (**খুশীর সুরে**) তোমার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

লোচন : (**স্পষ্টভাবে**) না, না, আমি ওর জান বাঁচাবার কে ?

হেমলতা : তোমার হাতেও তো চোট লেগেছে দেখছি।

লোচন : ওঁর প্রাণ রক্ষা করেছে ঐ গরীব মুসহরেরা, যাদের জমি কাড়িয়ে নিয়ে তার ওপর বীরেনবাবু গ্রামোদ্ধার সমিতির বাড়ী তৈরি করতে যাচ্ছিলেন ! সমিতির সন্তানরা সব যখন লাঠি-সোঁটা নিয়ে লড়াই শুরু করে দিয়েছে তখন এই গরীব মুসহরেরাই বীরেনবাবুর জীবন বাঁচাতে আমার সঙ্গে এগিয়ে এসেছে। (**ব্যাঙ্গের হাসি হেসে**) তবেই উদ্ধার সমিতির মধ্যমণি রক্ষা পেয়েছেন··· !

হেমলতা : (**হতচকিতভাবে**) তুমি··· মানে আপনি লেখাপড়া জানেন ?

লোচন : লেখাপড়া ? (**আবার মুচকি হেসে**) হ্যাঁ, তা একটু-আধটু করেছিও বলা যায় আবার করিনিও বলা যেতে পারে··· আচ্ছা আমি চলি।···

আচ্ছা, এই ছবিটা আপনি এঁকেছেন ?

হেমলতা : কেন, ছবিতে কোন গলদ আছে নাকি ?

লোচন : না, রঙে রঙে আপনি আমাদের নাচের গতি ও ছন্দ বেশ সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর···

হেমলতা : আর কি ?

লোচন : কোণে ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণশীর্ণ মানুষগুলো···

হেমলতা : কি হয়েছে ?

লোচন : (**নির্লিপ্তভাবে**) যেন নিজেদের শেকলে ওরা নিজেরাই বন্দী !

হেমলতা : বন্দী ! বন্দী কেন ?

লোচন : (**মুচকি হেসে**) অন্য একদিন বলব...আচ্ছা নমস্কার। (**প্রস্থান**)

(**হেমলতা আশ্চর্যান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। তারপর ছবিটাকে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে যায়।**)

হেমলতা : (**যেতে যেতে মৃদুস্বরে**) বন্দী ! নিজের শেকলে নিজেই বন্দী !...

তৃতীয় দৃশ্য

(একই জায়গা। চাকরদের বাড়ীর মধ্যে থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে বাইরে মালপত্র নিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আয়ার একে-ওকে হুকুম করার শব্দ কখনও চেতরামকে কখনও বা অন্য কাউকে— কানে আসছে।)

'বিছানাটা দুজনে মিলে নিয়ে যা'

'দেখিস, ফেলে দিসনি যেন'

'বাক্সের মধ্যে চিনির জায়গাটা আছে'

'শীগ্গির... একটু নড়ে আয় রে'

'ঐ ঝুড়িটা ও হাতে ধর।'

(ঘরের মধ্য থেকে দ্রুতপদে আয়ার আগমন। বাইরের দিক থেকে চেতরাম আসছে।)

আয়া : চেতু, মালপত্র সব ঠিক ঠিক তুলেছিস তো ?

চেতরাম : হ্যাঁ, আর শুধু বাবুর অ্যাটাচিটা বাকী। বাবু এলে ওটা বন্ধ করব।

আয়া : বাবু কোথায় গেছেন ?

চেতরাম : চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। শুনলুম ওঁর আঘাত বেশ গুরুতর।

আয়া : যে গাঁয়ে কাকার মাথায় লাঠি তুলতে ভাইপোর হাত কাঁপে না, সেখানে থাকাও মহাপাপ।

চেতরাম : বালেশ্বরবাবু এখনো জামিন পায় নি।

আয়া : মরুক্গে যাক। কলকাতায় একবার পৌঁছলে বাঁচি। একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি, বাব্বা !

চেতরাম : শান্তি !

আয়া : তুই আর কি বুঝবি ! কলকাতায় চল্ দেখবি কি সুখ ! বাইরে ঘুরবি ফিরবি আর মনের সুখে থাকবি ।

চেতরাম : এই গাঁ ছেড়ে ? চাকরি যদি করতেই হয়, তবে নিজের গাঁয়েই করব ।

আয়া : আরে, শহরে চাকরি না করলেও রিক্সা চালিয়েও মাসে দেড়শো-তুশো টাকা রোজগার করতে পারবি । বুঝলি ?

চেতরাম : দেড়শো, তুশো !

আয়া : হ্যাঁরে হ্যাঁ । আবার তার সঙ্গে রোজ সন্ধেয় সিনেমা । হোটেল-রেঁস্তোরায় চা । ঝকঝকে রাস্তাঘাট, সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর ! মেজাজে থাকবি !

চেতরাম : (বিরক্ত হয়ে) খাওয়াটা তো পরের ঘাড় ভেঙে, থাকাটাও অন্যের ওখানে, আবার কথাবার্তাগুলোও ভাড়া করা ! হায় রে !

আয়া : তবে তোর যেমন মর্জি তেমনি কর । মর এই গাঁয়ের মধ্যে থেকে ।

চেতরাম : লোচনদা তো বলে···

আয়া : (ঝাঁঝিয়ে উঠে) চল, চল, আর লোচনদার দালালি করতে হবে না । ভেতরে গিয়ে দেখ, বীরেনবাবু তৈরি হয়ে গেলে ওঁকে একটু ধরে ধরে নিয়ে আয় । হেমদিদি, তৈরি হয়েছ তো !

চেতরাম : আচ্ছা ! (**ভেতরে যায়**)

আয়া : (যেতে যেতে) দেখি আবার মালপত্র সব ঠিকঠাক তুলল কিনা । এসব গাঁইয়া চাকরবাকর...(**প্রস্থান**) **একটু পরে তারানাথ ও লোচন কথা বলতে বলতে এসে ঢোকে ।**)

তারানাথ : দেখ, লোচন, আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয় । ভালোই হল যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ।

বীরেন তোমাকে এখনও দেখে নি না? যাবার আগে সেদিনের উপকারের জন্যে কৃতজ্ঞতা...

লোচন : আমি ভেবেছিলাম, আপনারা থেকে যাবেন।

তারানাথ : থেকে যাব? এসেছিলুম তো সেই আশা নিয়েই যে কলকাতায় এত বছর কাটিয়ে এবার একটু গ্রামেই বরাবরের জন্য থেকে যাই। কিন্তু একমাসের অভিজ্ঞতাতেই বুঝে নিয়েছি, এখানে আমাদের জন্য ঠাঁই নেই। পুরোনো দিনের সে সমাজ আর নেই; সে এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে। চৌধুরীও বোধ হয় আমারই মতো হতাশ হয়ে পড়েছে। ওর ওখান থেকেই ফিরছি। সেদিনের ঝগড়াঝাঁটিতে বালেশ্বর শুধু ওর মাথার উপর লাঠিই চালায়নি, ওর মনটাকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

লোচন : কিন্তু বালেশ্বরই তো গাঁয়ের যুবকদের একমাত্র প্রতিনিধি নয়।

তারানাথ : (**হতাশভাবে**) আজকালকার যুবক কারা আর কারা নয় তা আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি যে রায়তের সুখদুঃখের মীমাংসাকারী জমিদার, পুরাতন ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা, প্রাণখোলা হাসি আর গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যুবসমাজ— যখন এসবের কিছুই গাঁয়ে নেই, তখন আর কি করতে গাঁয়ে থাকব। শহর...।

লোচন : শহরই আপনাকে টানছে রায়সাহেব!

তারানাথ : (**উদাসীনভাবে**) তুমি বোধ হয় ঠিকই বলেছ। শহর সত্যিই বোধ হয় আমাকে টানছে।

লোচন : আর সেই টানে আপনি খড়কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছেন।

তারানাথ : (**মনমরা ভাবে**) ভেসে যাচ্ছি!... ভেসে যাচ্ছি!... না না অমন কথা বোলো না লোচন, অমন কথা বোলো না... আমি যাচ্ছি...কেননা... কেননা

(চেতরামের কাঁধে ভর দিয়ে বীরেনের প্রবেশ। সাথে সাথে হেমলতাও আসে।

বীরেন : বাবা, আর শুধু আপনার তৈরি হতে বাকি।

তারানাথ : (**পরম স্বস্তি ভরে**) কে? বীরেন, হেম! তোমরা তৈরি হয়ে গেছ? তাহলে আমিও আমার অ্যাটাচিটা নিয়ে আসি। চেতু, তুই আমার সঙ্গে আয়!

(**চেতরাম এবং তারানাথ ঘরের দিকে যায়।**)

লোচন : (**হেমলতার দিকে**) নমস্কার!

হেমলতা : কে? আচ্ছা, আপনি? বীরেন, এই হচ্ছে সেই লোচন যে সেদিন তোমার জান বাঁচিয়েছে।

বীরেন : আচ্ছা!...সেদিন তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না, (**ভালো করে নিরীক্ষণ করে**) কিন্তু তোমায় কেমন চেনা-চেনা লাগছে।

লোচন : (**একটু হেসে**) ভেবে দেখুন! মনে পড়লেও পড়তে পারে।

বীরেন : (**ভাবতে ভাবতে**) তুমি...তুমি কি সেই...না না ...তা কি করে হবে? সে তো বেশ সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ছেলে!

হেমলতা : কে সে?

বীরেন : আমার কলেজের বন্ধু এল. এস. পারমার। তোমার মুখটা একেবারে বিলকুল!

লোচন : (**একটু হেসে**) এল. এস. পারমার!...লোচন সিং পারমার!

বীরেন : (**আশ্চর্যান্বিতভাবে**) এঁ্যা! পারমার...পার-মার!!

লোচন : (**দৃঢ় ভাবে**) হ্যাঁ, আমিই সেই পারমার, বীরেন!

হেমলতা : (**বিস্মিতভাবে**) বীরেন, এ ভদ্রলোক তোমার কলেজের বন্ধু!

বীরেন : (**লোচনের হাতটা ধরে**) ভাবতেই আশ্চর্য লাগে পারমার যে এতদিন পরে তোমাকে গেঁয়ো পোশাকে মুসহরদের

মধ্যে দেখতে পাব। কলেজ থেকে তো তুমি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেলে…

লোচন : (**শুকনো হাসি হেসে**) একদিন আমি তোমাদের ছেড়ে চলে গেছলাম আর আজ (**একটু থেমে**)… আজ তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ।

বীরেন : পারমার, আমি আজ চলে যাচ্ছি, কেননা আমার আদর্শের অপমৃত্যু আমি নিজের চোখে দেখ্‌তে পারব না।

লোচন : আদর্শ? যা গ্রামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সে আবার আদর্শ কি?

বীরেন : গ্রামোদ্ধারের আদর্শ, পারমার! আমি ভুলে গেছলাম যে গ্রাম মধ্যযুগীয় সমাজের মোহ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। উন্নত সমাজ গঠনের আদর্শকে স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজন শহরের আর কলকারখানার সচেতন মানুষ!

লোচন : (**তীব্রভাবে**) বীরেন, তুমি পালিয়ে যাচ্ছ।

বীরেন : না, লোচন না। লাঠির মারকে আমার একটুও ভয় নেই।

লোচন : তুমি পালিয়ে যাচ্ছ লাঠির ভয়ে নয়। তুমি পালাচ্ছ গ্রামের দলাদলি, অন্ধকুসংস্কার আর এখানকার ঝগড়াঝাটি রেশারেশির ভয়ে। তুমি এক লাফে এসব পেরিয়ে যেতে চেয়েছিলে। (**গম্ভীরভাবে**) তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছ, বীরেন!

বীরেন : (**সহসা বিচলিত হয়ে**) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছি…? না, না এ মিথ্যা… এ মস্ত ভুল। আমি যাচ্ছি, কেননা… কেননা…

(**দ্রুতপদে আয়ার প্রবেশ**)

আয়া : হেমদিদি! বীরেনবাবু!…আপনারা কি যাবেন না ঠিক করেছেন নাকি? বাবু কোথায়? আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা আপনাদের…(**তারানাথের প্রবেশ। সঙ্গে চেতরাম অ্যাটাচি হাতে**)

তারানাথ : আচ্ছা, আমি তৈরি। আয়া চলো গো! বীরেন, তুমি চেতুর কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়ীতে বোসো।

বীরেন : চললুম, ভাই পারমার! আবার দেখা হবে…

লোচন : আবার? (**অল্প হেসে**) আবার দেখা হবে।…

(**আয়া অ্যাটাচিটা হাতে নেয়। চেতরামের কাঁধে ভর দিয়ে বীরেন বেরিয়ে যায়—পেছনে পেছনে আয়া।**)

তারানাথ : আচ্ছা ভাই লোচন, চললাম, মনে হচ্ছে তোমার কথাই বোধ হয় সত্যি?

লোচন : হায় ভগবান, আপনাকে যদি এখানে কোনরকমে রাখতে পারতাম!

তারানাথ : হেম, তোমার ছবিটা ও দিকের ঐ কোণে পড়ে আছে।

হেমলতা : হ্যাঁ বাবা, এক্ষুনি নিয়ে আসছি। একবারে তো গাড়ীতে সবায়ের জন্যে জায়গা হবে না। আপনারা এগোন। স্টেশনে পৌঁছে আমার জন্যে আবার টাঙাটাকে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

তারানাথ : আচ্ছা তাই হবে। লোচন ভাই, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। আচ্ছা, চললাম।

লোচন : (**হেমলতার প্রতি**) আপনিও যাচ্ছেন, তাই না?

হেমলতা : কি আর করা যাবে? যেতে তো হবেই।

লোচন : সে তো বটেই। বীরেনকে ছেড়ে…

হেমলতা : না, বীরেনকে হয়তো আমি এখানে জোর করে রাখতে পারতাম কিন্তু…

লোচন : কিন্তু?

হেমলতা : বাবা বা বীরেন কেউ না বুঝলেও এ ব্যাপারটা আমি একটু-আধটু বুঝি। বাবা, তাঁর সেই গ্রাম সম্বন্ধে সুন্দর কল্পনার রাজ্যে বাস করেন। আর বীরেন চেয়েছিল গ্রামে তার গ্রাম পুনর্গঠনের কাল্পনিক সৌধ নির্মাণ করতে। আর আমিও

গ্রামের বাইরের রূপে মুগ্ধ হয়ে গ্রাম সম্বন্ধে কল্পনার প্রাসাদ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

লোচন : প্রাসাদ ইট দিয়ে তৈরি হয়, হেমলতা দেবী !

হেমলতা : হ্যাঁ, তা আমি বুঝি। কিন্তু আমরা তিনজন এটা বুঝতে চেষ্টা করিনি যে গ্রামের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। আমরা এখানে পরদেশী। (**মোহিত হয়ে**) আপনিও কি এই সংশয়, এই দোটানাভাব এই রোগের সংক্রমণের শিকার হন নি ? একদিকে গ্রাম আর অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার বন্ধন। এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমাদের দেহ, মন, ব্যক্তিত্ব সব যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার জোগাড়। বলুন, এই দোটানা ভাব, এই সংশয় কি মেটবার ? তা যদি না হয়, তবে আর মাটির স্পর্শ আমরা কি করে পাব ? বলুন ? আপনিই বলুন ?...

লোচন : হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে।··· এই দেখুন, হেমলতা দেবী। (**কোদাল ওঠায়**)

হেমলতা : কোদাল ?

লোচন : হ্যাঁ, এই কোদাল আর এই মেহনতী হাত— এই দুটোতেই ভেলকি খেলে আর এই দিয়েই আমি ঐ অন্ধ কারাগার ভাঙার চেষ্টা করে চলেছি।

হেমলতা : কিন্তু ভাঙতে কতটুকু পেরেছেন ?

লোচন : চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছি।

হেমলতা : মন ভেঙে পড়ে নি তো ?

লোচন : মাঝে মাঝে... কখনও কখনও একটু হতাশ হয়ে পড়ি না তা নয়। সে সময় সব কেমন যেন আবছা আবছা দেখি।

হেমলতা : অন্ধকারে সব যেন হারিয়ে যায়, তাই না ?

লোচন : না, অন্ধকারে নয়। অন্ধকার হলে তো সেখানে আলো জ্বালানো সম্ভব···অন্ধকার নয়, এ যেন কেমন মরীচিকার মতো একের পর এক— দূরে ঝিক ঝিক করে জ্বলছে আর চারদিকে

ধু ধু করছে মরুভূমি। যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ঐ একই দৃশ্য, সেই একই হাতছানি।···সেই মরীচিকার হাতছানি···সেই কেমন যেন দুর্বোধ্য আহ্বান।···

হেমলতা: (**বিস্মিতভাবে**) লোচনবাবু!

লোচন: (**আগের মতোই আবেগজড়িত কণ্ঠে**) আপনি যা ভাবতেন বা যা ছিলেন, সে সব কথা ছেড়ে দিন। এখন আপনি এবং আমি! আসুন, ভেঙে ফেলি, ভেঙে দেই এই মাটির প্রদীপ যা আপনি জ্বালাতে চেয়েছিলেন।···প্রদীপের তেলের আর সে ক্ষমতা নেই যে তার আলো দিয়ে অলীক কল্পনার মোহ কাটাতে পারবেন।··· একটা মস্ত ধাপ্পা, একটা মোহ, অবাস্তব কল্পনার মায়াজাল, অর্ধতৃপ্ত বাসনার এক মীনা বাজার।··· মীনা বাজার··· ভ্যানিটি ফেয়ার! ভ্যানিটি ফেয়ার!!

হেমলতা: থামো থামো, লোচন থামো।

লোচন: কি হ'ল, ভয় পেয়ে গেলেন?

হেমলতা: না, ভয় পাইনি।

লোচন: তাহলে, তাহলে আপনি কি এখানে থেকে যাবেন ঠিক করলেন? বলুন থেকে যাবেন, তাই না? এখানের নোংরা পরিবেশ আর ঝগড়াঝাঁটির স্তরের তলে তলে মাটির স্পর্শ পেতে এখানে থেকে যাবেন? বলুন, বলুন-না?

হেমলতা: না।

লোচন: (**পিছিয়ে এসে**) আমি তা জানতাম, হেমলতা দেবী।

হেমলতা: আমাকে হেম বলেই ডেকো।

লোচন: না, বীরেনবাবুর অধিকার আমি কাড়িয়ে নিতে চাই না।

হেমলতা: বীরেন তো আছেই, কিন্তু তুমিও আমার কাছে খুব দূরের লোক নও।

লোচন : সুন্দর !..."ঠোঁটে হাসি, মাথায় চুলের ভাঁজ, সম্মতিও আছে, আবার অসম্মতি স্পষ্ট।"

হেমলতা : অসম্মতি !... সম্মতির এক কণাও নয়। কিছুক্ষণ আগেও আমি ভাবছিলুম যে জড়তা শুধু আমারই কাটে নি এবং সেইজন্যেই আমার এখানে নিজেকে বিদেশী বিদেশী মনে হচ্ছে। আর তুমি পরম সুখে এই ধরিত্রীর অমৃত পান করছ। কিন্তু এখন দেখছি, ব্যাপারটা তাই নয়। মাটির স্পর্শ পেয়েও যে স্রোত থেকে তুমি জল তুলছ, সে স্রোতের সঙ্গে তোমার আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। তুমি গাঁয়ের মাটিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল প্রাণী নও...তুমিও...তুমিও আমার মতো বন্দী !

লোচন : (আহত হয়ে) হেম !

হেমলতা : বড় আঘাত পেলে তাই না ? আমি জানতাম তুমি এতে আঘাত পাবে। শেকল ধরে টানলে কষ্ট তো হবেই। তবুও শেকলের ঝন্‌ঝনানিরও প্রয়োজন আছে। কপটতার পরদা সরিয়ে ফেলার দরকার আছে।

লোচন : কপটতা ?...কিসের কপটতা ?... এসব তুমি কি বলছ, হেম ?

হেমলতা : কপটতা হচ্ছে তুমি তোমার নাগালের বাইরের জিনিসটাকে ধরতে চাইছ আর সেই জিনিসটাই তোমাকে তোমার মতো করে বাঁচতে দিচ্ছে না। **(কাছে গিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে)** শোনো !...তোমার কথায় ভয় পাবার মতো কিছু ছিল না ! ...বরং তোমার কথায় অসহায় আভাস শুনতে পেয়েছি, শুনতে পেয়েছি, শুনতে পেয়েছি তোমার পরাধীন আত্মার হাহাকার, তোমার সঙ্গীহীন জীবনের হা-হুতোশ !

লোচন : থামো, থামো, হেম, এবার থামো, **(হাতের ওপর মাথা রেখে)** এমন নিষ্ঠুরভাবে অন্তরে ঘা দিয়ো না !

হেমলতা : (লোচনের কাঁধে হাত রেখে নরম সুরে) তোমার এই সংশয়, এই ব্যথা আমি বুঝি লোচন !

লোচন : **(ব্যথিতভাবে)** হেম, তুমি জানো না, আমার চরিত্রের যে দুর্বল দিকটার দিকে তুমি ইঙ্গিত করছ সেটাকে কাটিয়ে উঠতে আমি কি দারুণ চেষ্টা করেছি। মাঠে লাঙ্গল চালিয়েছি, সারাদিন কোদাল কেটেছি, মাটির পরশ পাবার জন্যে আমি ব্যাকুলভাবে সংস্কারমুক্ত হবার চেষ্টা করেছি !

হেমলতা : জানি, সব জানি। আর সেইজন্যেই বাইরের দেওয়ালটা তুমি ভাঙতে পেরেছ। এই অন্ধকারাগার আমাকে যেভাবে ঘিরে আছে, তোমাকে ঠিক সেইভাবে ঘিরে নেই।... কিন্তু তবুও লোচন··· তবুও আমরা দুজনেই বন্দী। আমি নিজের শিল্প-কলার বাঁধনে, পারিবারিক বন্ধনে, বাস্তব আরামের বন্ধনে বন্দী আর তুমি তোমার খুঁতখুঁতানি, তোমার কল্পনা আর সংস্কারের হাতে বন্দী হয়ে আছ ! আর এসব থেকে বোধ হয় তোমার বা আমার কারোরই মুক্তি নেই।

লোচন : কিন্তু... কেন, কেন আমরা বন্দী ?

হেমলতা : আমাকে বন্দী থাকতে হবে, কেননা মান ইজ্জতকে জলাঞ্জলি দিতে আমি পারব না। **(একটু থেমে)** আচ্ছা এবার আমি চলি লোচন ! আর এই ছবিটা তোমার জন্যে রেখে গেলাম।

লোচন : আমার বন্ধন, আমার পিছুটান সম্বন্ধে মনে করিয়ে দেবার জন্যে ?

হেমলতা : **(যেতে যেতে)** যা মনে করো !...কিন্তু এসব চিন্তা যখন মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হবে, তখন কলকাতায় একটু চক্কর মেরে এসো। এসব ভাবনাকে দাবিয়ে রাখা ঠিক নয় ! **(প্রস্থান)**

(লোচন কিছু বলতে যায়। হাত তোলে। কিন্তু আবার থেমে যায়। ছবিটাকে দুই হাতে ধরে চোখের সামনে রেখে ঘুরতে থাকে)

লোচন ঃ (**একটু পরে**) এ জ্বালা আমাকে সহ্য করতে হবে ! আগুনকে জ্বলতে দিতে হবে তবেই আমি শান্তি পাব ।

(চেতরামের প্রবেশ । লোচন ওকে দেখতে পায় না ।)

ছবিতে আঁকা বন্দীর দল ! কেন, তোমাদের এ বন্ধন ? এ বন্ধনের থেকে কি মুক্তি নেই ?

চেতরাম ঃ লোচনদা !

লোচন ঃ (**আত্মমগ্নভাবে**) ওহে ! চিত্রের বন্দীরা ! গ্রামীণ নর্তকের নাচে যাতে ব্যাঘাত না হয়, সে যেন খেয়ে পরে হেসে খেলে থাকতে পারে, সেইজন্যেই কি তোমরা বন্দী হয়ে আছ ?

চেতরাম ঃ (**এগিয়ে এসে একটু জোরে বলে ওঠে**) লোচনদা, তুমি ছবির সঙ্গে কথা বলছ যে !

লোচন ঃ (**ছবিটা গুটিয়ে রেখে**) চেতরাম ! (**একটু থেমে**) চেতরাম, আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে । (**চেতরামের কাঁধে হাত রেখে**) এই শেকলের আঘাতে যদি আমি রক্তে ভেসে যাই বা রাস্তার কাঁটায় আমার পায়ের তলা ঝাঁঝরা হয়ে যায়, তবু আমি থামব না ।...এ হতে পারে না ।...তোদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্য আমাকে তৈরি থাকতে হবে । না...না...না ...এ হতে পারে না ।

চেতরাম ঃ (**সমবেদনার সুরে**) লোচনদা, তোমার জমিতে ফিরে যাবে না ?

লোচন ঃ (**হঠাৎ যেন মোহভঙ্গ হল**) এঁ্যা !

চেতরাম ঃ সামনে অনেক কাজ ! পাহাড়ের নীচেকার জমি তো আবার ফেরত পাওয়া গেছে !

লোচন ঃ (**গম্ভীরভাবে**) বেশ তো । চল্, আমরা লাঙ্গল দেওয়া শুরু করে দিই ।

চেতরাম ঃ না তোমার বোধহয় একটু বিশ্রামের দরকার ।

লোচন : বিশ্রাম ? (**শুকনো হাসি হেসে**) না, চেতরাম ! চলো আমার বিরামহীন কাজের মধ্যেই নিজেকে খুঁজে পাব, তা কখনো হারাব না। ঘামের আয়নায় নিজের ছায়া দেখি— যে ছায়া কোনদিন মিলিয়ে যাবে না ! (**কোদাল উঠিয়ে**) চলো ! চলো !

(**অন্ধকার হয়ে যায়, পর্দা নামে**)

কফি হাউসে কিছুক্ষণ

—লক্ষ্মীনারায়ণ লাল

চরিত্র ঃ

প্রথম ব্যক্তি
দ্বিতীয় ব্যক্তি (যুবক)
বেয়ারা

(স্থান : কফি হাউস)

(কফি হাউসের একটি ঘর। একটা টেবিল আর একটা চেয়ার রাখা। পশ্চাৎভূমিতে তিনজন লোকের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। প্রথম ব্যক্তির বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। পরনে পাজামা পাঞ্জাবী। দৌড়ে এসে চেয়ারখানা দখল করে বসে পড়ে। তার পিছনেই দ্বিতীয় ব্যক্তি, বয়স বছর পঁচিশেক। পরনে প্যাণ্ট সার্ট। একে দেখেই প্রথম ব্যক্তি তাড়াতাড়ি তার কাগজপত্র টেবিলে রাখে।)

প্রথম ব্যক্তি : বেয়ারা !...

বেয়ারা : (**হাজির হয়**) বলুন... বলুন কি দেব ?

প্রথম ব্যক্তি : একটা কফি আর তিন গ্লাস জল দাও... বুঝলে— একটা কফি আর তিন গ্লাস জল...

(**বেয়ারা পুনরাবৃত্তি করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে বেয়ারার কথা শেষ হলে বলবে সেই অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু কথা আর শেষ হয় না। বেয়ারা পুনরাবৃত্তি করতে করতে চলে যায়।**)

প্রথম ব্যক্তি : সকলেই জানে, আমি গত তেরো বছর ধরে এখানে বসে আসছি। কেউ একজন যদি এটা না জানে তো আমি কি করতে পারি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : বাজে কথা বলবেন না মশাই ! গত ছ'দিন ধরে এক নাগাড়ে আমি এখানে বসে আসছি। এখানে আর-একটা চেয়ার থাকত। আমি এখানে বসে আমার বান্ধবীর অপেক্ষা করতাম। ও আসত, তারপর দুজনে সামনাসামনি বসে আমরা কথাবার্তা বলতাম।

(**প্রথম ব্যক্তি টেবিলে নিজের লেখার জিনিসপত্র সাজাতে থাকে**)

প্রথম ব্যক্তি : আমি এখানে বসে নিজের কাজ করি।...

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমি তো এখানে কাজের জন্যই এসেছি।

প্রথম ব্যক্তি : কথাবার্তা বলাটা কোন কাজ নয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এখানে বসে বসে লেখাপড়া করাটাও কোন কাজ নয়।

প্রথম ব্যক্তি : আপনি কি এখন পড়াশুনা করেন ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তাতে আপনার দরকার ?

প্রথম ব্যক্তি : আপনি এদেশের ইতিহাস পড়েছেন ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি সিগারেট ধরায়, আর রাগে গুম হয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকে।)

প্রথম ব্যক্তি : তাজ্জব ব্যাপার ! আজকালকার ছেলেপুলেরা দেশের ইতিহাসের কথা শুনলেই অমনি সিগারেট ধরায় ! আমাদের সময় এমনটা ছিল না। ইতিহাস ছিল আমাদের ধ্যানে, ইতিহাস ছিল আমাদের রক্তে। ইতিহাসের স্মরণীয় অধ্যায় রচনার সক্রিয়-ভাবে অংশ নিয়েছি। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা···

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**হঠাৎ বাধা দিয়ে**) থামুন, থামুন মশাই। রোজ এসব শোনাবার জন্যেই আপনি এখানে আসেন নাকি ?

প্রথম ব্যক্তি : (**দাঁড়িয়ে উঠে**) আর আপনি এখানে আমাদের ওপর রাগ দেখাবার জন্যে আসেন ? (**একটু থেমে**) আমাকে একটা সিগারেট দিতে পারেন ? (**সিগারেট নিয়ে**) হায় ভগবান ! আজকাল আপনারা মেজাজে সিগারেট খান ! আমাদের সময়ে কিন্তু সিগারেট খাওয়ার এত রেওয়াজ ছিল না। আপনার মতো বয়সে তো আমি সত্যাগ্রহী ছিলাম। আমাদের সামনে তখন একটা মহান উদ্দেশ্য ছিল··· এমন একটা ভাব যা আমাদের সব সময় ইন্সপায়ার করত। (**এই বলে টেবিল থেকে**

উঠে পড়ে। সিগারেট খেতে খেতে ধোঁয়া ছেড়ে সেইদিকে তাকিয়ে বলতে থাকে।)

প্রথম ব্যক্তিঃ ধোঁয়ার মধ্যে অসংখ্য কার্বন ডাস্ট আছে। আস্তে আস্তে সব বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে যায়। প্রকৃতির কি আশ্চর্য খেলা! সমস্ত কার্বন ডাস্টকে আস্তে আস্তে এই প্রকৃতি আত্মসাৎ করে ফেলছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ (ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে) আমাকে একরকম 'বোর' করবার আপনার কোন 'রাইট' নেই।

প্রথম ব্যক্তিঃ সে সময় আমরা সিগারেট খেতাম না। কফির তো নামই শুনিনি। প্রথম এর নাম শুনি 1944 সালে— আমাদের গুরু সুরাজী যখন তেরো দিন ধরে এক নাগাড়ে আত্মশুদ্ধির অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইংরেজ কালেক্টার এসে নিজে হাতে তাঁকে কফি খাইয়ে তবে অনশন ভঙ্গ করান। (বেয়ারা আসে)

বেয়ারাঃ এই যে একটা কফি···আর তিন গ্লাস জল··· !

প্রথম ব্যক্তিঃ অদ্ভুত লোক— একে কে বোঝায়··· কে কি বলবে··· শুধু শুধুই যদি এর রাগ হয়··· !

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ থামুন!

(চেঁচানোর শব্দে এক মুহূর্তে যেন সব ঝনঝন করে ওঠে।)

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ এখানে আর-একটা চেয়ার ছিল। সেটা কি হ'ল?

প্রথম ব্যক্তিঃ এই যে 'ছিল' কথাটা··· এ তো ইতিহাসের কথা। আর ইতিহাসে কি-ই বা না আছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ এখানের সেই চেয়ারটা কোথায়?

বেয়ারাঃ আজ্ঞে আছে। ওতে এক ভদ্রলোক বসে আছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ কিন্তু ঐ চেয়ারটা এ ঘরের।

বেয়ারাঃ কিন্তু স্যার! ওতে এক ভদ্রলোক বসে আছেন যে!

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ ভদ্রলোককে বলো···

বেয়ারা : স্যার ! উনি কানে একটু কম শোনেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি।

বেয়ারা : স্যার, উনি চোখে প্রায় দেখতেই পান না।

(প্রথম ব্যক্তি কফি খেতে খেতে)

প্রথম ব্যক্তি : আসল কথা, আপনি ভদ্রলোককে চেনেন না, আর তাই আপনি রেগে যাচ্ছেন। আমি' ওঁকে গত পঁচিশ বছর ধরে চিনি।...

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তাহলে আপনি ওর কাছে গিয়ে বসছেন না কেন ?

প্রথম ব্যক্তি : আমি তো আপনাকে সেই কথাই বলছি... যে আপনি ওঁকে চেনেন না। এ হচ্ছেন আমাদের গুরু সুরাজী। উনি আজকাল সব সময় শুধু কফি খান আর কেন যেন ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতে চাই না ।

প্রথম ব্যক্তি : উনি তো তাইই চান।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমি জানতে চাই না, এটা আমার ইচ্ছা।

প্রথম ব্যক্তি : ওনারও তো তাই ইচ্ছা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : অপরের সম্বন্ধে আমার এতটুকুও মাথাব্যথা নেই।

প্রথম ব্যক্তি : উনি অপরের সম্বন্ধে একদম মাথা ঘামান না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আচ্ছা, আমি দেখছি...।

প্রথম ব্যক্তি : উনিও আমাদের দেখছেন ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমি ওঁকে জোর করে উঠিয়ে দিয়ে চেয়ার নিয়ে আসছি। ঐ চেয়ারটা এখানের। আমি গত ছ'দিন ধরে এক নাগাড়ে ওটাতে বসে আসছি।

বেয়ারা : (**একটু থেমে**) স্যার ! উনি ওটাতে গত ত্রিশ বছর ধরে একটানা বসে আসছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : গত ছ'মাস ধরে আমি এখানে বসে আসছি। আমি এখানে বসতাম... আর আমার বান্ধবী ওখানে বসত।

বেয়ারা : সে কথা ঠিক। কেননা, গত ছ'দিন উনি শহরের বাইরে ছিলেন।

প্রথম ব্যক্তি : **(এতক্ষণে কফি খাওয়া শেষ হয়)** দেখুন ভাই, গত ছদিন আমি মেডিকেল চেক্-আপ্-এর জন্যে হাসপাতালে ছিলাম। আমার ব্লাড প্রেসার আছে। সকাল থেকে দুপুর অবধি 'লো' আর দুপুর থেকে সন্ধে অবধি 'হাই'। আমার ঘুম হয় না। তাই যোগ প্র্যাকটিস করে প্রেসারের টাইমিংটা বদলে নিয়েছি। সকাল থেকে দুপুর অবধি 'হাই' আর দুপুরের পর 'লো'। এত করে তবে আমার ঘুম আসে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : বক্‌বকানি থামান তো মশাই !...এখানে বসে আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

প্রথম ব্যক্তি : বেয়ারা, সাহেব কি করছেন ?

বেয়ারা : সাহেব তাঁর গার্ল ফ্রেণ্ডের প্রতীক্ষা করতে চাইছেন। গার্ল ফ্রেণ্ড...

দ্বিতীয় ব্যক্তি : **(রাগে)** আমি এখানেই বসব। হাটাও সব !... ছেড়ে দাও আমাকে ! **(দুই ব্যক্তির মধ্যে চেয়ার নিয়ে যুদ্ধ। বেয়ারা দৌড়ে এসে টেবিল থেকে কাপ, প্লেট, গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে দ্রুতপদে চলে যায়। টেবিলটা উল্টে যায়। চেয়ারটা এখনও প্রথম ব্যক্তির অধিকারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি চোট খেয়ে নীচে পড়ে যায়। বেয়ারা হাতে করে দু গ্লাস জল নিয়ে আসে)**

বেয়ারা : আজ্ঞে, এ ভদ্রলোক আপনাদের একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে বললেন। যার বেশী চোট লেগেছে, সে একটু পরে খাবে আর যার কম চোট লেগেছে সে সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেবে !

(প্রথম ব্যক্তি জল খায়)

প্রথম ব্যক্তি : হ্যাঁ মশাই, আপনার কাছে সিগারেট আছে ?...

(দ্বিতীয় ব্যক্তি সিগারেটের প্যাকেট ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে দেয়। প্রথম ব্যক্তি প্যাকেট খুলে মুখে সিগারেট লাগায়।)

প্রথম ব্যক্তি : **(উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের ওপর বাঁ পা রেখে)** আমি স্বাধীনতা-যুদ্ধে লড়েছি। দেশকে স্বাধীন করার ব্যাপারে আমি যুক্ত ছিলাম। আমার হাত ছিল এবং আমার সক্রিয় অংশ ছিল।

'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলতে আমার দেহের রক্ত টগবগ্ করে ওঠে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে আমি আত্মবলিদান দিয়েছি। **(বেয়ারা আস্তে আস্তে তালি বাজায়)**

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমি এখানে তোমার বক্তৃতা শোনার জন্য আসিনি। আমি যদি জানতাম যে এখানে তোমার মতো একটা ভবঘুরে লোক বসে থাকে, তাহলে আমি এখানে ভুলেও আসতাম না। আমি তোমার মতো স্বাধীনতা-সংগ্রামে লড়িনি তা ঠিক, কিন্তু এদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আবার যুদ্ধ নাকি? তুমি বলছ, তুমি আত্মবলিদান দিয়েছ... কিন্তু যখন কোন বিদ্রোহেরই প্রশ্ন ওঠে না, তখন আবার বলিদান কিসের ?···

প্রথম ব্যক্তি : আরে,... স্বাধীনতার যুদ্ধ এরকম হবে না তো আবার কি রকম হবে? আরে দূর, দূর তালপাতার সেপাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : স্বাধীনতার যুদ্ধ হল, যা নীচে থেকে লড়া হয়... একেবারে নীচু থেকে ওপর অবধি...। ওপর থেকে নীচু অবধি নয়। যাতে আমূল পরিবর্তন ঘটে... শুধু ওপরে ওপরে পরিবর্তন নয়—'পাওয়ার ট্রান্সফার' নয়। স্বাধীনতার মাটিতে তৈরি হয় এক নতুন শক্তি।

প্রথম ব্যক্তি : বেয়ারা, একে একটা কফি খাওয়াও।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : দেখো ফালতু ইয়ারকি মারলে একেবারে তোমার হাড্ডি গুঁড়িয়ে ফেলব বলে দিচ্ছি।

প্রথম ব্যক্তি : এতক্ষণেও তুমি কিছুই বোঝ নি। তোমার

মধ্যে এত উৎসাহ··· এত তেজ আছে। আমি এই উৎসাহ, এই তেজের প্রশংসা করি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : দেখো, আমাকে 'প্যাট্রোনাইজ' করার চেষ্টা কোরোনা। তোমার মতো লোকজনরা মিলেই আমার জিন্দেগীটা একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি : কি বললে? আর একবার বলো... থামলে কেন, আর একটু খুলেই বলে-না যাতে আমি বুঝতে পারি। আমি তো হাইস্কুল পাসও করিনি। 42 সালে আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম আর সেই সময়ই আমি স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ঝাঁপিয়ে পড়েছ না কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

প্রথম ব্যক্তি : এক মিনিট, এটা একটা বোঝবার জিনিস। দেখে-না কফি হাউসটা কি বিচিত্র জায়গা। তুমি বলবে আমি তোমার জিন্দেগী বরবাদ করে দিয়েছি। সুতরাং আমিও বলতে পারি যে ঐ ভদ্রলোক আমার জিন্দেগীটা বরবাদ করে দিয়েছেন। এটা একটা সুন্দর 'থীম'... বাঃ, এ দিয়ে তো শ'খানেক টাকার একটা গল্প হয়ে যায়।

(কাগজে তাড়াতাড়ি নোট করতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তখন তোমাদের শুধু ধান্ধা ছিল কি করে কার খুঁত ধরা যায়। আর সেই করেই তোমরা একদিক দিয়ে সুভাষ বোসকে দেশ থেকে তাড়িয়েছ আবার অপর দিক দিয়ে অরবিন্দকে সন্ন্যাসী বানিয়েছ!

প্রথম ব্যক্তি : আরে দাঁড়াও। এসবগুলো লিখে নিই। না হলে আবার ভুলে যাব।

(এই ফাঁকে বেয়ারা দৌড়ে ভিতরে যায় এবং দৌড়ে ফিরে আসে।)

বেয়ারা : ভদ্রলোক আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করেছেন, স্যার। উনি বললেন, আপনারা যদি একটু জোরে জোরে কথাবার্তা বলেন তা, হলে উনি আপনাদের 'স্পীচ' শুনতে পান। আপনাদের জন্যে কাজুর সঙ্গে ক্রীম কফির অর্ডার দিয়েছেন উনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : অর্ডারটা ওর নাকের ওপর গিয়ে ফিরিয়ে দাও, বুঝলে ?

বেয়ারা : লোক হিসাবে ভদ্রলোক খুব ভালো। ওঁর রাগ বলতে নেই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কিন্তু আমার রাগ আছে... এ কথাটা ওঁকে গিয়ে বলে দিয়ো।

বেয়ারা : উনি সবই জানেন। সকলের মঙ্গল চিন্তাতেই উনি সর্বক্ষণ বিভোর থাকেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তুমি চুপ করবে কিনা ?

বেয়ারা : যতক্ষণ উনি ওখানে বসে থাকবেন, ততক্ষণ আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। এটা আমার 'ডিউটি'।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তবে, দাঁড়িয়েই থাকো !

বেয়ারা : মাফ করবেন স্যার। কথা বলাটাও তো আমার ডিউটির মধ্যে পড়ে। (**ইতিমধ্যে প্রথম ব্যক্তি তার ব্যাগ থেকে কিছু লেটারহেড প্যাডের কাগজ, রসিদ বই, রবার স্ট্যাম্প, কিছু পত্রিকা ইত্যাদি বার করেন।**)

প্রথম ব্যক্তি : (**হঠাৎ একটা হ্যাণ্ডবিল পড়তে শুরু করে দেয়**) ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ! আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয়, সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা দিন দিন ক্রমশই কমে আসছে। ফ্যামিলির মধ্যে, বাড়ীতে, অফিস আদালতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই শুধু 'ইনডিসিপ্লিন'

আর 'ইনডিসিপ্লিন'। ইনডিসিপ্লিনের বাংলা আপনারা কি করবেন? ...

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ তোমার মুণ্ডু করব!

প্রথম ব্যক্তিঃ তোমার মুণ্ডু... এই এই বেয়ারা! ঐ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা কর তো ইনডিসিপ্লিনের বাংলা অর্থ কি?

(**বেয়ারা কাছে যায় এবং ফিরে আসে**)

বেয়ারাঃ ভদ্রলোক বললেন, ইনডিসিপ্লিন তো ইনডিসিপ্লিনই। ও কথাটা ওর খুব পছন্দ। ঐ কথাটা ওর শুনতে খুব ভালো লেগেছে।

প্রথম ব্যক্তিঃ আর হ্যাঁ, সর্বত্র এক ইনডিসিপ্লিনে ছেয়ে যাচ্ছে। অতএব আমাদের যা প্রয়োজন, তা হল জায়গায় জায়গায় স্থানে স্থানে (**হঠাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে তাকায়**) কি হল আপনি শুনছেন না কেন? ইস্তেহারটা কেমন লাগল? এ রচনা আমার, আরো অনেক বাকী। আমি বাড়ী হতে কেটে পড়ে সকাল সকাল এখানে এসে পড়েছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ আপনার আগে আমি এসেছি।

প্রথম ব্যক্তিঃ আহা, রাগ করো কেন? আমরা দু'জনেই তো আজকালকার লোক। আমরা দুজনে একই পথের যাত্রী এবং পরস্পরের দুঃখের ভাগীদার।

দ্বিতীয় ব্যক্তিঃ তোমার সঙ্গে বকবক করবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

প্রথম ব্যক্তিঃ ও কথা বোলো না। কথাই তো আমার জীবন। আমি হয় কাজে ব্যস্ত থাকি আর না হলে কোন-কিছুর চিন্তা করি। আর সেই চিন্তাটাকে পুরো করবার জন্যেই তো আমি এখানে এসে থাকি। তাই অমনভাবে আমাকে চুপ করতে বোলো না। চুপচাপ থাকাটা আমার খুব খারাপ লাগে...বলো...বলো.. কিছু তো বলো...। তুমি বেশ সুন্দর কথা বলতে পারো।

(**স্নেহভরে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাঁধে হাত দেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি উপেক্ষা করতেই থাকে।**)

প্রথম ব্যক্তি : ভাই, আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। এত কাজ যে তুমি তার কল্পনাই করতে পারে না। এইরকম আমাকে আরো পাঁচটা ইস্তাহার লিখতে হবে। তিনটের প্রুফ দেখতে হবে— দুটোর প্রিণ্ট অর্ডার দিতে হবে। এই যে প্যাডটা দেখছ না এসব বড় বড় সংস্থার জিনিস। আমি কোনটার মন্ত্রী, কোনটার অধ্যক্ষ, কোনটার কোষাধ্যক্ষ, কোনটার সেক্রেটারি। প্রতিদিন আমাকে কতগুলো যে চিঠি লিখতে হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। এই দেখো-না, আমার আজকের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট (**ডায়েরি দেখায়**) এতগুলো লোকের সঙ্গে আমাকে আজকে দেখা করতে হবে। এই লোকগুলো এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার কথা। এতগুলো লোককে এই এই লোকগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।... এক মুহূর্ত সময় নেই আমার... এত-গুলো কাজের দায়িত্ব! এই বেয়ারাকেই জিজ্ঞাসা করো-না প্রতিদিন এখানে আমি সব চেয়ে আগে আসি আর রাত সোয়া-দশটা অবধি আমাকে এইখানেই থাকতে হয়। সবচেয়ে প্রথম আসি আর সবচেয়ে শেষে বাড়ী যাই। (**চেয়ারে বসে প্যাডে ব্যস্তভাবে লিখতে আরম্ভ করে**)

প্রথম ব্যক্তি : (**লিখতে লিখতে হঠাৎ**) কি বললেন যেন... সংগ্রাম... নীচের থেকে শুরু হয়...না কি নীচের দিকে যায়?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**রাগ ভরে**) জুতোর ঠোক্কর থেকে শুরু হয়।

প্রথম ব্যক্তি : (**লিখতে লিখতে**) জুতোর ঠোক্কর থেকে। (**আবার একটু থামে**) নীচের থেকে ওপরে আবার ওপর থেকে নীচে...এ দু'এর মধ্যে কোন তফাৎ আছে না কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তফাৎটা বুঝতে গেলে তোমাকে শীর্ষাসন করতে হবে।

প্রথম ব্যক্তি : সত্যি!... ওঃ সেইজন্যেই বোধ হয় মহাপুরুষরা রোজ সকালে শীর্ষাসন প্র্যাকটিস করেন .. এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন

রহস্য আছে। আমি এখনই শীর্ষাসন করছি। (**শীর্ষাসন করবার চেষ্টা করে। কয়েকবার পড়ে যায়। পা যাতে পড়ে না যায় সেজন্য বেয়ারা পা দুটো ধরে থাকে।**)

প্রথম ব্যক্তি: (**ঘাবড়ে গিয়ে**) আরে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব উল্টো দেখছি! ওপরের জিনিস সব নীচে হয়ে গেছে আর নীচের জিনিস ওপরে। আরে ব্যাস্!...

দ্বিতীয় ব্যক্তি: আর মধ্যিখানে কি দেখছ?

প্রথম ব্যক্তি: (**ভয়ার্তকণ্ঠে**) কেবল শূন্য...কেবল শূন্য। ছেড়ে দাও...ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও। (**ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে।**)

প্রথম ব্যক্তি: বাজে কথা সব! এসব করে কি লাভ! আমাকে এখন কত কাজ করতে হবে। আমি তোমার মতো বেকার নই বুঝলে? এখনও আমার জীবনের একটা লক্ষ্য বলে জিনিস আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে...জীবনে কত আশা আছে। প্লীজ, এক মিনিট— আচ্ছা, একটা সিগারেট দেখি।

(**মুখে পেনসিলটা লাগায়। পেনসিলকেই সিগারেট ভেবে ফুঁকতে থাকে। অবার লেখা শুরু করে।**)

দ্বিতীয় ব্যক্তি: (**বেয়ারাকে**) আজ কফি হাউসে এত ভীড় কেন?

বেয়ারা: আদ্ধেক লোক এখানকার রোজকার খদ্দের আর বাকি আদ্ধেক লোক নতুন। কাল থেকে এই নতুন লোকগুলোও আসতে শুরু করবেন। স্যার! ব্যাপারটা হচ্ছে আজ অফিস, স্কুল, কলেজ সব কিছুরই স্ট্রাইক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: এখানেই আমি আর আমার বান্ধবী কাল বসব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম। তা এখন ও এলে বসবে কোথায়? ও যা-তা ঘরের মেয়ে নয়, এটা তোমার খেয়াল রাখা উচিত।

বেয়ারা : স্যার ! উনি বোধ হয় রাস্তায় ইতিমধ্যেই এসে দাঁড়িয়ে গেছেন ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ও কারো পরোয়া করে না যে দাঁড়িয়ে থাকবে। কাউকে ভয় করবার লোকও নয়, বুঝলে ?

বেয়ারা : হয়তো উনি কফি হাউসের ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছেন ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওকে আটকাবার মতো কোন বাপের ব্যাটা আছে ?

প্রথম ব্যক্তি : (**চেঁচিয়ে**) ডোণ্ট ডিস্টার্ব, দেখছ না আমি কত ব্যস্ত আছি !

বেয়ারা : কিন্তু ভেতরে ঐ ভদ্রলোক একা একা বসে আছেন —ওঁর জন্যে তো আমাকে কথা বলতেই হবে। ওঁর চেষ্টাতেই তো আমার এই চাকরি !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ও এদিক দিয়ে আসতে পারে ।

বেয়ারা : আজ্ঞে না, এদিক দিয়ে, হলঘর হয়ে...

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কেন ?

বেয়ারা : এদিকে ঐ ভদ্রলোক বসে আছেন যে...!

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কোথায় ? ও কে লোকটা ? কি ব্যাপার কি ওর ? ওখানে বসেই বা কেন ?

বেয়ারা : (**থেমে**) স্যার ! না, না, আপনি ওদিকে যেতে পারবেন না !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**রেগে**) বেশী বক্‌বক্ করলে উঠিয়ে ফেলে দেব ।

বেয়ারা : স্যার, মারপিট করবার জন্যে ওদিকে অতবড় একটা হলঘর আছে ।

(দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঁয়ে দরজার ওপর দাঁড়িয়ে হলঘরের দিকে তাকায়। হলঘরে ঝগড়া হচ্ছে। মারপিট

একটা প্লেট এসে দ্বিতীয় ব্যক্তির পেটে লাগে। সে কোঁকিয়ে ওঠে।)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওরে বাপরে! মেরে ফেলল রে! **(বেয়ারাকে)** বদমাস কোথাকার! তুই এই দরজাটা বন্ধ রাখিস নি কেন?

বেয়ারা : স্যার! এ তো আপনাদেরই কফি হাউস।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ঝুটমুট আমার চোট লাগল।

(ও দরজা বন্ধ করতে চায়। বেয়ারা বাধা দেয়।)

বেয়ারা : না স্যার, এই দরজা এইরকম খোলা থাকবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (রাগে) বদমাস, ছোটলোক কোথাকার!

প্রথম ব্যক্তি : যাক, আমার তিন নম্বর ইস্তাহারটা শেষ হল। **(পড়তে শুরু করে)** পোষা কুকুরের জমকাল প্রদর্শনী। আসুন। আপনাদের পোষা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে আসুন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমি বলছি, এ দরজাটা বন্ধ করো।

প্রথম ব্যক্তি : রামলীলা ময়দানে প্রায় হাজার আড়াই কুকুর আসবার কথা আছে।

প্রথম ব্যক্তি : (পড়তে পড়তে) কুকুর হচ্ছে প্রথম প্রাণী যা মানুষের সান্নিধ্যে এসেছে। হাজার বছর ধরে এ-দুটি প্রাণী এক-সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। একে অপরকে সমানভাবে প্রভাবিত করে আসছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে কুকুর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কুকুরই প্রথম জীব যা চাঁদের মাটিতে প্রথম পা দিয়েছে। কুকুর প্রভুভক্ত জীব, ঘেউ ঘেউ করে ডাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজও দোলায়!

প্রথম ব্যক্তি : (কুকুর ডাকার মতো করে) যাও, এক কাপ কফি নিয়ে এসো।

বেয়ারা : মাফ করবেন স্যার। আমি কুকুর নই!

(বেয়ারা চলে যায়)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আচ্ছা তুমি একটা ইস্তাহার লিখে ক' পয়সা পাও?

প্রথম ব্যক্তি : সেটা নির্ভর করে, ইস্তাহারটা কোন্ বিষয়ে লেখা তার ওপর।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ধর, এই কুকুরের ইস্তাহারটার জন্য...।

প্রথম ব্যক্তি : এর জন্যে তো বেশী টাকা পাব। ধর, এক হপ্তা কফি হাউসে আসা-যাওয়ার পুরো খরচা।

(বেয়ারা আসে)

(দ্বিতীয় ব্যক্তি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে ঐ ভদ্রলোককে দেখতে থাকে)

বেয়ারা : হ্যাঁ, স্যার! আপনি এখানে দাঁড়িয়েই চুপচাপ ওঁকে দেখুন। দেখুন...ঘুরুন, যা আপনার প্রাণে চায় করুন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : **(ঘৃণাভরে)** ছি...ছি...দোসা খেতে খেতে চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা আবার মানুষে বলে! ঠিক যেন একটা কুত্তা চাকস্ চাকস্ খাচ্ছে আর ক্যাচ্ম্যাচ করতে করতে মাথামুণ্ডুহীন সব কথাবার্তা বলছে।

বেয়ারা : একটু আস্তে স্যার! ভদ্রলোক এখন প্রেস কনফারেন্স করছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এই রকম চাক্‌ম চাক্‌ম করে খেতে খেতে আবার প্রেস কনফারেন্স?

বেয়ারা : হ্যাঁ স্যার! 'ফুড প্রবলেম' সম্বন্ধে প্রেস কনফারেন্স।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : একে এমন বিশ্রী ভাবে দোসা খেতে খেতে কথা বলতে দেখে আমার দোসা জিনিসটার ওপরই অভক্তি এসে গেছে।

বেয়ারা : ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

প্রথম ব্যক্তি : **(হঠাৎ লেখা থামিয়ে)** কি বললে! আর-একবার বলো। আর-একবার বলো না, ছাই!

বেয়ারা : হ্যাঁ, কি বললাম! কে জানে কি বললাম... এখনই বললাম...কি বললাম!...

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**দরজার কাছ থেকে**) যা ভাগ এখান থেকে ! ভাগ !

(**পশ্চাৎভূমিতে একাধিক লোকের হাসি**)

প্রথম ব্যক্তি : (**বেয়ারাকে সঙ ভেবে**) এইমাত্র তুই কি বললি যেন ! দুটো মাত্র শব্দ। বেশ সুন্দর শব্দ। হাত তুলে বললি...তোর মুখ হাঁ হয়ে গেল...চোখ দুটো নেচে উঠল।

বেয়ারা : স্যার ! ব্যাপারটা হচ্ছে কাল রাতে আমি সিনেমায় গেছলাম। সিনেমায় নায়ক নায়িকার সঙ্গে ঐ দুটো শব্দেই গান গাইছিল।

প্রথম ব্যক্তি : গানটা কি ছিল ?...বল বল...তাহলে শব্দ-দুটো ঠিক মনে পড়বে।

বেয়ারা : তন ডোলৈরে মন্ ডোলৈরে...এই রকম ধরনের কিছু একটা ছিল।

প্রথম ব্যক্তি : (**ভাবতে ভাবতে যেন মোহিত হয়ে যায়**) আগে ..এর আগে কি ছিল ?

বেয়ারা : আমার লজ্জা করছে।

প্রথম ব্যক্তি : (**যেন কোন স্বপ্ন দেখছে**) উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল, একদিন আমরা আমাদের নেতার সঙ্গে মিছিল করে যেতে যেতে এই দুটো শব্দই ধ্বনি দিচ্ছিলাম। সামনে ঐ শব্দ, পেছনে ঐ শব্দ, মধ্যে ঐ শব্দ...সারা আকাশে বাতাসে ঐ শব্দ···শুধু ঐ শব্দ। কি ঐ শব্দ দুটো···এইমাত্র তোর মুখ থেকে বেরিয়েছিল...বল বল...মনে করে দেখ্···ঐ শব্দ দুটো আমার দারুণ দরকার··· আমাকে এখনই লিখতে হবে...আর তাতে ঐ শব্দ দুটো ব্যবহার করতে হবে !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ঐ লোকটার টেবিলে যে বইগুলো আছে, হয়তো ওতেই ঐ শব্দ দুটো পাওয়া যাবে।

বেয়ারা : না, স্যার, ওগুলো জ্যোতিষ আর হস্তরেখার বই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**উত্তেজিতভাবে**) টেবিলটা উলটে দাও,

তাহলে হয়তো ওর নীচে এমন বই পাওয়া যাবে যাতে এ'শব্দ দুটো আছে।

প্রথম ব্যক্তি : তুমিও ঐ শব্দ দুটো ভুলে গেছ ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমার এই একটু আগে পর্যন্ত মনে ছিল··· এই এক সেকেণ্ড আগেও, যখন আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম তখনও পর্যন্ত আমার মনে ছিল। কিন্তু ঐ ব্যাটাকে দেখা মাত্রই সব ভুলে গেলাম...তার ওপর একা একা ঐ রকম ভাবে খাওয়া...আর খেতে খেতে ঐ রকমভাবে বক্‌বক্ করা ! (**একটু থেমে**) এক মিনিট, দাঁড়াও, ওর কাছে গিয়ে ওর টেবিলটা উল্টে দিই...ওকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওর চেয়ারটা কাড়িয়ে নিই।···

বেয়ারা : না, তা হতে পারে না।

প্রথম ব্যক্তি : কি বললে ? "তা হতে পারে না ?"

বেয়ারা হ্যাঁ স্যার ! ঐ ভদ্রলোকের কাছে এই সাহেব ভদ্রলোক কোনক্রমেই যেতে পারেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**চেঁচিয়ে**) আমার নাম সাহেব ভদ্রলোক নয়।...আমি এই নামটাকে ঘৃণা করি।

বেয়ারা : বেশ, বেশ। কিন্তু আমি যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ আমি এই সাহেব ভদ্রলোককে ঐ ভদ্রলোকের কাছে যেতে দেব না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তোর মুণ্ডু ভেঙে দেব একেবারে ! বদমাস কোথাকার !

বেয়ারা : স্যার ! ভেরী স্যরি !

দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি একেবারে ঠাণ্ডা করে দেব

বেয়ারা : স্যার, ঐ ভদ্রলোক তাই তো চান।

প্রথম ব্যক্তি : সেইজন্যেই তো উনি তোকে মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।···মাঝখানে এইখানটা ফাঁকা, লোকে এখানে পাথর ছুঁড়ুক...চারদিকে আওয়াজ করুক, লোকে এখানে মারপিট করে নিজের নিজের রাগ ঝাড়ুক। নিজের রাগটাকে উল্টোভাবে বুঝুক

...এ্যান্টি...এ্যান্টি...এ্যান্টি। (**বেয়ারা ঘুরে ফিরে দ্বিতীয় ব্যক্তির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।) দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ায়।**)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : মনে হচ্ছে, এ ব্যাটা ঐ লোকটার চর।

প্রথম ব্যক্তি : সেই সূত্রেই ও এখানে বেয়ারার চাকরিটা পেয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : একে কোনরকমে পটানো যায় না!

প্রথম ব্যক্তি : কখনও দরকার হয়নি। সত্যিকথা বলতে কি একে পটাবার কথা কখনও ভেবেও দেখিনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কিন্তু আজ এখনই দরকার যে। ঐ শব্দ দুটো তোমাকে লেখায় ব্যবহার করতে হবে আর ঐ শব্দ দুটো সম্বন্ধে আমার উনির সঙ্গে কিছু কথা বলতে হবে। ও এখানে পৌঁছাবার আগেই আমার ঐ শব্দ দুটো মনে করা দরকার।

প্রথম ব্যক্তি : তোমার ঐ গার্ল ফ্রেণ্ডের নামটা যেন কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'দিস ইজ ইরেলিভেণ্ট'।

প্রথম ব্যক্তি : তাহলে রেলিভেণ্ট কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ঐ শব্দদুটো! আমার বান্ধবী হচ্ছে ঐ শব্দ-দুটোর প্রতীক।

প্রথম ব্যক্তি : ওয়ানডারফুল! তাহলে তো একটা বসার বন্দোবস্ত করতেই হয়।

(**ইতিমধ্যে বেয়ারা ভেতরে এসে প্লেলেটের অবশিষ্ট এঁটো খাবার দাবার নিয়ে যায়।**)

প্রথম ব্যক্তি : বেয়ারা, যেখান থেকে হোক একটা চেয়ারের বন্দোবস্ত করো।

বেয়ারা : ইম্পসিবল স্যার! বাইরে আবার লোকের ভীড় বাড়ছে।

প্রথম ব্যক্তি : কোথায় যাচ্ছ?

বেয়ারা : ঐ ভদ্রলোক বলে দিয়েছেন, দেশে তরিতরকারীর ঘাটতি চলছে। তাই কোন জিনিস যেন নষ্ট না হয়। বাইরে ভিখিরিরা দাঁড়িয়ে আছে।

(বাঁ দিক দিয়ে চলে যায়, সেই সময় বাঁ দিকে গণ্ডগোলের শব্দ। বেয়ারা পড়ি কি মরি করে দৌড়ে আসে।)

বেয়ারা : বাপ্‌রে বাপ। যা দারুণ ভীড়!

প্রথম ব্যক্তি : এদিক দিয়ে যাচ্ছ না কেন?

বেয়ারা : এখন এদিক দিয়ে যেতে মানা আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কেন?

বেয়ারা : এখান থেকে এই এঁটোগুলো ভিখিরিদের ছুঁড়ে দিতে হবে। এই পোড়া দেশের ভিখিরিগুলোকে দেখো, খাবে তো খাবে এঁটো স্যাণ্ডউইচই খাবে। **(ছুড়ে ফেলতে ফেলতে)** লে, লে— আরে ঝগড়া করছিস্ কেন? আরে শালারা নিজেদের মধ্যে খাওয়াখাওয়ি করে কি হবে? এই নে ব্যাটারা— যত সব 'হট ডগ'…ইম্পোটেন্টের বাচ্ছা যত সব!…আরে ঝগড়া করিস নি…বাপ্…ভদ্রলোক এখনও ভেতরে বসে আছেন…আজ অনেক খাবার পাবি। **(ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে)** এই নে 'হেমবাগার, এরাই হচ্ছে এখন স্বদেশী… !

প্রথম ব্যক্তি : কি বললি! কি বললি এখন তুই?

বেয়ারা : দাঁতে করে চেঁপে ধরে আছি স্যার। সেই শব্দটার মত এটাও যাতে ভুলে না যাই…স্বদেশী…স্বদেশী…যাকে বলে ইম্পোটেণ্ট…।

প্রথম ব্যক্তি : আমরা তখন বিদেশী জিনিসপত্তরে আগুন লাগিয়েছি (**দ্বিতীয় ব্যক্তিকে**) তুমি লিখতে থাকো…আমি বলে যাচ্ছি…থেমেছ কি সব ভুলে যাব।…স্বদেশী…স্বদেশী…স্বদেশ আমার মন…স্বদেশ আমার দেহ…তারপর মনে পড়ছে না…স্বদেশ নামে তখন একটা মেয়েও ছিল।

বেয়ারা : স্বদেশ প্রসাদ আমার বাবার নাম ছিল।

(**দ্বিতীয় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি লিখতে থাকে। প্যাডের কাগজ একের পর এক ভরে যায়, একটা একটা নীচে ফেলতে থাকে। প্রথম ব্যক্তি কাগজগুলোকে এক এক করে কুড়তে থাকে**)

প্রথম ব্যক্তি : আমাদের এদেশে কত বড় বড় নেতা ছিলেন। কত স্বার্থত্যাগ করেছেন তাঁরা। সারাদেশ এক মহান প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিল…চারদিকে যেন একটা আলোর আভাস…। আরে লিখছ না কেন? সব মাটি করে দিল রে…এটা একটা সম্পাদকীয় ছিল…আজ সন্ধেবেলায়ই আমি এটা কুড়ি টাকায় বেচে দিতুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**উঠে পড়ে**) তুমি এটাকে মাত্র কুড়ি টাকায় বেচবে? আর এই দেশ?

প্রথম ব্যক্তি : সাবধান! নিজের দেশের সম্বন্ধে একটাও বাজে কথা শুনতে আমি পচ্ছন্দ করি না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এই দেশের দাম কত তার একটা হিসাব করে ফেলেছি। এমন-কি আদ্ধেক অ্যাডভান্স পর্যন্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

প্রথম ব্যক্তি : কই তোমার গার্লফ্রেণ্ড তো এখনও এলো না। তোমার মাথা গরম হয়ে যায়নি তো?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আভ্যন্তরীণ বাজারে এর দাম বাড়ছে। শেয়ার মার্কেটে এর দাম নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেছে।

(**পশ্চাৎভূমিতে বহুকণ্ঠে** 'আরে রে রে…গেলাম গেলাম' **আওয়াজ**)

প্রথম ব্যক্তি : চুপ করো। চুপ করো।

(**সব শান্ত হয়**)

বেয়ারা : স্যার! আপনার উনি ভেতরে এসে গেছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ও এসে গেছে।

বেয়ারা : গার্ল ফ্রেণ্ড!

দ্বিতীয় ব্যক্তি : মিনী…

(**দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে**)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**চেঁচিয়ে**) মিনী !

বেয়ারা : স্যার ! একটু আস্তে ডাকুন, ভদ্রলোক ওঁনার সঙ্গে কথা বলছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**রাগের মাথায়**) কি বক্ বক্ করছে কি ? মিনি মিনি শোন (**একটু থেমে**) ওঃ ! ওর জন্যে এখন একটা চেয়ারের বন্দোবস্ত তো করতেই হবে। (**উত্তেজিতভাবে**) আমি ওকে ধাক্কা মেরে হাটিয়ে বান্ধবীর জন্যে চেয়ারটা নিয়ে নেব।

(**বেয়ারা দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে**)

বেয়ারা : (**পা ধরে**) না না স্যার। এটা ঠিক নয়। চারদিকে হৈ হৈ পড়ে যাবে একেবারে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : না, এ আর বরদাস্ত করা যায় না।

প্রথম ব্যক্তি : (**দৌড়ে গিয়ে রাস্তা আটকায়**) হ্যাঁ, এ যা বলছে ঠিক বলছে। ঐ ভদ্রলোককে ওখান থেকে হাটিয়ো না। তাহলে মহা হট্টগোলের সৃষ্টি হবে। চারিদিকে একটা 'ক্যায়োস' সৃষ্টি হবে। সমস্ত 'সিস্টেম'টা ভেঙে পড়বে। আমাদের এখানে থাকাই দায় হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তুই কে রে ?

প্রথম ব্যক্তি : আমি আমি··· আমি একটা মানুষ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তুই মানুষ নয়, অন্য কিছু।

প্রথম ব্যক্তি : আমি তোমার মতোই একটা মানুষ, এদেশের নাগরিক !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : না, তুই ইংরেজ। সেই ইংরেজ, যাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ তুই এককালে লড়েছিস। সেই অদ্ভুত লড়াই-এ যার সঙ্গে তুই লড়ছিলি, সে তোকে ইংরেজ বানিয়ে দিয়েছে। ও এমনই আশ্চর্যজনক শত্রু যে ওর সঙ্গে লড়াই করার সময় তোর লড়াই-এর সমস্ত কৌশলই শত্রুর হাতের মুঠোয় ছিল।

প্রথম ব্যক্তি : তুই দেখেছিস নাকি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এখনই দেখছি তো।

প্রথম ব্যক্তি : অসম্ভব !

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমি হচ্ছি তোর বর্তমান... আর তুই হলি আমার ভূত। **(বিরাম)** এখানের যতকিছু ঝগড়াঝাটি সবই তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটা কাজের কথা, একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা— সে সব কিছু নেই। সামান্য বাজে জিনিস নিয়ে যত হৈ চৈ। সেইজন্যে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

বেয়ারা : স্যার ! সেইজন্যেই আপনি আজ ঐ চেয়ারটা নিয়ে একেবারে হৈ চৈ লাগিয়েছেন। কাল থেকে আমি এখানে ঠিক দুটো চেয়ার রেখে দেব।

প্রথম ব্যক্তি : আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে একটু মনে করে নিতে দাও... এগুলো যেন কোন্ পাতায় আছে **(দৌড়ে গিয়ে লিখতে আরম্ভ করে দেয়)** আমরা আজ যা বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিচ্ছি একদিন তাই কাজের কথা হয়ে দাঁড়ায়।... হ্যাঁ আর কি বলছিলে ? **(হঠাৎ)** ওঃ সব কিছু কি তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছি...আজ বোধ হয়, 'লিভারটা' ঠিক নেই।

বেয়ারা : স্যার ! এই বয়সে গম খাওয়া ঠিক নয়।

প্রথম ব্যক্তি : ঐ শব্দটা কি, ভেবে দেখ তুই কি বলেছিলি যেন ?

বেয়ারা : স্যার, ওটা সিনেমার ফিল্মে পাবেন...জয় হিন্দ টকীজে ঐ ফিল্মটা চলছে।

প্রথম ব্যক্তি : শব্দটার আমার এখনই দরকার। লেখায় ব্যবহার করতে হবে। আর একে ঐ শব্দটা সম্বন্ধে গার্ল ফ্রেণ্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আমাকে তোমরা যেতে দিচ্ছ না কেন ? আমি ঐ ভদ্রলোকের চেয়ারটা উল্টে দেব, তাহলেই দেখবে শব্দটা আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে।

প্রথম ব্যক্তি (**ভাবতে ভাবতে**) চেয়ারটা উল্টোলেই কথাটা বেরিয়ে আসবে। তাহলে সবের মূল হচ্ছে ঐ চেয়ারটা। (**লিখতে শুরু করে**) এই সমস্ত ঝঞ্ঝাট ঐ জন্যেই। (**দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়ে যায়**) না, না, তুমি ঐ ভদ্রলোকের কাছে যেতে পারবে না। ঐ লোকটা মানুষ ভালো, আমি ওকে এতদিন ধরে চিনি। আর তুমি যদি ওকে চেয়ার থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করো, তাহলে এখানেও এমন মারপিট, লুঠ, হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে যাবে যে এখানে তিষ্ঠোনই দায় হয়ে পড়বে।

প্রথম ব্যক্তি : স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐ দিনের কথা মনে করে দেখ···ঠিক এইরকম ও বলেছিল, কি আমরা সুয়েজ খাল পেরোতে পারব না।···

(দুজনেই একেবারে চুপ হয়ে যায়, যেন হঠাৎ কেউ ওদের বোকা বানিয়ে দিয়েছে)

বেয়ারা : (**ঘাবড়ে গিয়ে**) কি...কি.. কি বললেন (**দৌড়ে এসে**) ইয়েস, স্যার, (**বেয়ারা ডানদিকে চলে যায়, দুজনে চাপা গর্জন করতে শুরু করে। প্রথম ব্যক্তিকে সত্যাগ্রহীর ঢঙ-এ আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে উত্তেজিতভাবে গর্জন করতে দেখা যায়। একটু পরে বেয়ারা ফিরে আসে।**)

বেয়ারা : স্যার,···ও...মিষ্টার ! ও বাবুরা আপনারা এরকমভাবে হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যাওয়াতে ভদ্রলোক দারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের কথাবার্তা, আপনাদের রাগগোসা, আপনাদের ব্যবহার —সব কিছুই ওঁর খুব ভালো লাগে। ওঁর প্রেস কনফারেন্স শেষ হয়ে গেছে। ধর্মঘটী কর্মচারীদের একটা ডেলিগেশন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ওরাও একটু পরে চলে যাবে। আপনারা কথা-বার্তা চালিয়ে যান...স্যার, ও···স্যার !···

(দুই ব্যক্তিই বেয়ারাকে এত নীচু গলায় জিজ্ঞাসা

করে যে ওদের মুখ থেকে কথা বেরোয় কিনা বোঝা যায় না।)

বেয়ারা : আরে, আপনাদের মুখে কথা নেই কেন? না, না, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আজ্ঞে না,···কোন আওয়াজই কানে আসছে না। আচ্ছা, আচ্ছা...একটু জোরে হাসুন, তাহলে হয়তো কিছু শুনতে পাওয়া যাবে।

(**দুজনে হাসতে থাকে। কিন্তু আগের মতোই নিঃশব্দে।**)

বেয়ারা : আরে, খিল খিল করে হাসুন, হোঃ হোঃ করে হাসুন না। (**দুজনে হাসতে থাকে**)।

বেয়ারা : (**বিরক্ত হয়ে**) না, কিছুই হবে না, কোন আওয়াজই নেই...একটা শব্দ পর্যন্ত নেই···কি বললেন?.. আমি কালা? আজ্ঞে না, আপনারা দুজনেই বোবা। আপনাদের মুখ থেকে যদি কোন আওয়াজই না বেরোয় তো আমি ছাই কি শুনব?··· দেখুন, ডান দিক থেকে আওয়াজ আসছে...আমি শুনতে চাই বা নাই চাই, আমি ওটা শুনতে পাচ্ছি। (**কান পেতে শুনতে থাকে**) ভদ্রলোক এইমাত্র আপনার গার্ল ফ্রেণ্ডকে কি একটা বেশ বড় চাকরির কথা বলছিলেন। (**আবার শুনতে থাকে**) ওঃ উনি নিজের 'ফিউচার ক্যারিয়ার' সম্বন্ধে কথা বলছেন। (**কান পেতে শুনে**) ওঁর সঙ্গে 'ইণ্টারপ্রিটার' হয়ে আপনার বান্ধবী বিদেশে যাবেন।

(**দ্বিতায় ব্যক্তি রাগ চাপতে চাপতে ঐ কথা শুনে হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে।**)

দ্বিতীয় ব্যক্তি : না, না, না!

(**প্রথম ব্যক্তি নিঃশব্দে কথা বলতে থাকে।**)

বেয়ারা : এইবার বিশ্বাস হ'ল তো যে আমি কালা নই আর সেইসঙ্গে আমারও বিশ্বাস হয়ে গেল যে আপনারা বোবা হতে পারেন না। (**হঠাৎ কান পেতে শুনে**) ওঃ! ভদ্রলোক

বলছেন কি যে প্রতিদিন আমাদের ডায়েরী লেখা উচিত...(**আবার শুনতে থাকে**) আর ডায়েরীটা এমন হওয়া উচিত, যাতে প্রতি পৃষ্ঠায় কোন-না-কোন মহাপুরুষের বাণী থাকে। (**আবার শোনে**) মহাপুরুষ হচ্ছেন তিনিই যিনি নিজের বিশ্বাস বা নিজের মতকে রক্ষা করতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জানের পরোয়া করেন না। (**আবার শোনে**) চিন্তাশীল ব্যক্তিই কেবল মহান হতে পারেন।

(**প্রথম ব্যক্তি ঐ সম্বন্ধে বলতে শুরু করে**)

প্রথম ব্যক্তি : না, না, না, ও কিচ্ছু জানে না। ও সব ভুলে গেছে। ও নিজের খেয়ালেই মত্ত। অন্যায়, অত্যাচারের কলসী একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। লোকে এসব বরদাস্ত করবে না। সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে। এখন রাত্রি গতপ্রায়— ভোর হয় হয়। আমাদের মধ্যে থেকেই একজন কেউ হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে আর...আর আর...আর...আর...আর!

(**বেয়ারা চুপি চুপি হাসতে থাকে। ফিস্ ফিস্ করে কথাও বলে। জোরে বলতে না পারার জন্য অত্যন্ত মনমরা দেখায়। ইঙ্গিতে বলতে থাকে যে ওর চাকরি চলে যাবে।**

প্রথম ব্যক্তি : আরে, তোর হোলোটা কি শুনি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ব্যাস, ব্যাস, একে এইরকম বোবাই থাকতে দাও। এর সঙ্গে কোন কথা বোলো না। এ ব্যাটার চাকরি যাওয়াই ভালো...তুই ওর লোক, তাই না! যা এখন ওর কাছেই মর গিয়ে...আমার কাছে হাত জোড় করে লাভ নেই...তোর প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি নেই।

(**বেয়ারা প্রথম ব্যক্তির পা ধরে**)

প্রথম ব্যক্তি : তোর প্রতি আমারও এতটুকু সহানুভূতি নেই। (**হঠাৎ একটু থেমে**) বোধ হয় আমাদের দুজনের মধ্যেও কোন পারস্পরিক সহানুভূতি নেই···। ওদের দুজনের মধ্যেও নেই (**বেয়ারাকে**) এ হয়তো কোন মহাপুরুষ হবে...। চুপি

চুপি কিছু একটা বলছে...আমাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সহানুভূতি এ নষ্ট করে দিয়ে আমাদের আলাদা আলাদা করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**উত্তেজিতভাবে**) সব 'ফ্রড' সব ফ্রড। আমি এ সব খতম করবই। (**বেয়ারা এসব কথা শুনে হেসে ফেলে**)

বেয়ারা : (**হাসতে হাসতে**) আপনারা দুজন...(**প্রথম ব্যক্তিকে**) আপনার একজন মহাপুরুষের দরকার। (**দ্বিতীয় ব্যক্তিকে**) আর আপনার একজন গার্লফ্রেণ্ড দরকার।... আর আমার দরকার ঐ ভদ্রলোককে·· ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

(**ভেতরে পালায়**)

প্রথম ব্যক্তি : জিন্দাবাদ...এর আগের শব্দটা কি যেন ?

(**জোরে দৌড়ে যায়। ভাবতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি ওকে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে থাকে। এই সময় বেয়ারা আসে। ওর হাতে কিছু জিনিসপত্র।**)

বেয়ারা : দেখুন ··· শুনুন মশাইরা ··· ভদ্রলোক আপনাদের জন্যে এই উপহার পাঠিয়েছেন। আপনি বড়, মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাসী, তাই আপনার জন্যে একজন মহাপুরুষের আত্মকথা। (**প্রথম ব্যক্তিকে উপহার দেয়**) আর আপনি বড় উদ্যোগী পুরুষ। আপনার বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাব ভদ্রলোককে খুব আনন্দ দিয়েছে। (**বাক্স খোলে**) আপনার জন্যে উনি এই 'মিনি স্যুট' পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : 'মিনি স্যুট' এ আবার কি ধরনের ভদ্রতা !

বেয়ারা : আপনার গার্লফ্রেণ্ডকে ভদ্রলোক একটা 'মিনি শাড়ী' উপহার দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : (**ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে**) নিয়ে গিয়ে ওর মাথার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দাও।

বেয়ারা : ভদ্রলোক বললেন, যদি আপনি এক' মিনিটের মধ্যে এটা পরে তৈরি হয়ে নিতে পারেন, তাহলে আপনাকে ভেতরে

যেতে দেওয়া হবে। (**দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘৃণাভরে ঐ 'মিনি স্নুট'টা পরবার চেষ্টা করতে থাকে)**

বেয়ারা : (**প্রথম ব্যক্তিকে**) আপনি এই বইয়ের মধ্যে ঐ শব্দটা খুঁজে দেখুন। যদি এক মিনিটের মধ্যে খুঁজে পান তো ভেতরে যেতে পাবেন। (**বইয়ের পাতা ওল্টায়**)

বেয়ারা : তাড়াতাড়ি করুন, সময় এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এ আমার গায়ে লাগছে না যে !

প্রথম ব্যক্তি : এই বইয়ের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

বেয়ারা : তাড়াতাড়ি করুন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : এটা পড়া অসম্ভব !

প্রথম ব্যক্তি : বইটার কভারে কিছুই নেই যে !

বেয়ারা : তাড়াতাড়ি করুন, এক মিনিট শেষ হতে চললো।

প্রথম ব্যক্তি : কিছুই এর বুঝতে পারছি না, তো পড়বো কি ছাই !

বেয়ারা : খুঁজুন, খুঁজুন। আর আপনি পরবার চেষ্টা করুন !

প্রথম ব্যক্তি : আবোল তাবোল সব কি লেখা আছে যে এতে ! ওপর নীচে ... নীচে-ওপর ... যে ব্যক্তি যে জিনিসের বিরোধিতা করে সে তাই হতে চায়।

বেয়ারা : তাড়াতাড়ি...তাড়াতাড়ি...সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। (**বেয়ারা একই কথা বলতে থাকে। প্রথম ব্যক্তি বলতে বলতে কথা শেষ না করে হঠাৎ চুপ করে যায়।**)

(**পরদা নামে**)

সৃষ্টির শেষ মানুষ

—ধর্মবীর ভারতী

চরিত্র ঃ

ঘোষক
এক ব্যক্তি :
শাসক
বৈজ্ঞানিক
ভীড়
সৈন্য

(ঘটনাকাল ঃ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ)

(কোন এক বিশেষ রাজাজ্ঞার সময় বিউগল ও শঙ্খ-ধ্বনি। পশ্চাৎভূমিতে এক ব্যক্তি বেশ গম্ভীর গলায় কেবল 'শোন শোন'...আওয়াজ করে চলেছে।)

ঘোষক ঃ ও জগৎবাসী !
ও মনুরাজার সন্তানরা
শোন ওগো শোন !
আমি বলছি
ভবিষ্যতের এক নগরের চৌমাথার মোড় থেকে
আমি বলছি !
এ হল ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভে লুকান
এক সুসভ্য নগর।
এই নগরের দোরগোড়া অবধি পায়ে পায়ে
আসতে আসতে
ইতিহাসের কত অধ্যায় শেষ করে,
সংস্কৃতির কত পরিবর্তন ঘটিয়ে আমি আসছি
সে সবের নকশা মরুভূমির বালির ওপর
তাজা রক্তে লেখা রয়েছে ;
তার ভিত্তির তলায় কত
নগ্ন, ক্ষুধার্ত, মৃত শিশু চাপা পড়ে আছে
তবে এই নগর পত্তন হয়েছে।
আমি ভবিষ্যতের ঐ নগরের চৌমাথার মোড় থেকে
বলছি !

(চৌমাথার মোড়ে বহুলোকের হৈ হট্টগোল। ভয়-ত্রস্ত স্বর, চাপা ফুসফুসানির শব্দ কখনও হঠাৎ জোর

হয়ে উঠছে। কখনও কখনও হঠাৎ জোরে চীৎকার ; ছোট শিশুর কান্না, ভিখারীদের কাতর আর্তনাদ ও গালিগালাজ ; যা শেষ পর্যন্ত এই ফুসফুসানির শব্দে মিলিয়ে যাচ্ছে।)

হৈহৈ, মারপিট চিৎকারের শব্দ
এসব যা কিছু আপনার কানে আসছে,
তা আসছে ঐ নগর থেকে,
ঐ নগরের রাস্তাঘাট, গলিঘিঞ্জিতে
দারুণ ভীড় জমছে,
নগরে আর তিল ধারণের জায়গাও নেই ;
হৈ হট্টগোল ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে !
কেউ জানে না চৌমাথার মোড়ে
সব লোক জড়ো হচ্ছে কেন ?
চার দিক থেকে ভীড় বাড়ছে
হাজার হাজার বুড়ো বাচ্ছা স্ত্রীপুরুষ
জোর পায়ে এগিয়ে আসছে।
কিন্তু এরা একটু অদ্ভুত ধরনের লোক,
এদের হাত পা ছোট ছোট,
মাথাটা কাঁধের মধ্যে ঢুকে আছে
পেটটা শরীর থেকে আগে বেরিয়ে,
মাংসপিণ্ডের মতো চোখের পাতাগুলো ঝুলছে
এদের গতিতে প্রাণ নেই।
নোংরা মেঢ়কের (উভচর জন্তু) মতো
কাদা ছিটোতে ছিটোতে এরা আসছে !
দলে দলে এরা এগিয়ে আসছে
যেন প্লেগ-আক্রান্ত ইঁদুরের
মতো গলিঘিঞ্জি দিয়ে এগিয়ে আসছে।

(কাচের মেঝের উপর একাধিক ইঁদুরের পদধ্বনি)

কে জানে, কেন আজ ভীড় বাড়ছে !
এদের কথাবার্তা থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না,
এদের ভাষা বদলে গেছে !
লোকে বলে নাকি এরা সব একশো বছর আগে
গাঢ় কাল রক্ত পান করেছে
পচাগলা মড়া খেয়েছে
আর তখন থেকেই এদের আওয়াজ বদলে গেছে ।

(দম বন্ধ হয়ে আসছে, গুমরে গুমরে ভীড়ের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠছে। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন মহাদেব বলছেন 'কিছু রহস্যময় অজ্ঞাত পাপ, কিছু অমঙ্গল ঘটবে।' যেন মনে হচ্ছে এই বাক্যটা কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে প্রতিধ্বনির মতো চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ছড়িয়ে পড়ছে।)

তবু তার মধ্যে কিছু কিছু শব্দ কানে আসছে,
যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে
আজ নগরে কিছু একটা
অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটবেই ।
আগের দিন রাতে সেতারের শব্দে থেমে থেমে
এরকম কিছু একটা আওয়াজ আসছিল,
যেন কোন জ্যান্ত লোককে লক্‌লকে আগুনের
শিখায় পোড়োনো হচ্ছে !
আর রাতের ঝোড়ো হাওয়ায় ।
পোড়া মাংসের গন্ধ !
ভয় বিহ্বল, আতঙ্কিত মনে লোকজন
সারা রাত কাটিয়েছে !

সকাল হতে সবাই দেখলো পশ্চিমের পাহাড়ে
অগ্নি বৃষ্টি হচ্ছে !
ঝোপজঙ্গল যত ছিল সব গেছে ঝলসে
বড় বড় পাথরের টুকরো গেছে ফেটে
জায়গায় জায়গায় মাটিতে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে,
ঘাবড়ে গিয়ে লোকজন সব ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে !
চৌমাথার মোড়ে ভীড় জমছে !
সকলে বলাবলি করছে, আজ হল মহাপ্রলয়ের দিন
সারা পৃথিবী আজ আত্মহত্যা করতে চলেছে !
দারুণভাবে আতঙ্কিত হয়ে লোকজন সব পালাচ্ছে।
ভীড় আর নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না !

(সহসা ভীড়ের হৈ হট্টগোলের মধ্যে থেকে ফৌজী ব্যাণ্ড বেজে উঠলো আর সেই আওয়াজ ছাপিয়ে ফৌজী ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ।)

নাও, এই এসে গেছে সুসজ্জিত সৈন্যদল
জায়গায় জায়গায় বন্দুক হাতে
সিপাই দাঁড়িয়ে !
লোক ভয়ে শান্ত হয়ে যায় !
কিন্তু ও কী ?
ওদিকে দূরে ঐখানে একটা গণ্ডগোল বেধেছে !

('চুপ করো', 'ওকে বলতে দাও', 'হ্যাঁ হ্যাঁ', 'কি করছো ?' — 'মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধি আমি বলে যাব' ইত্যাদি আওয়াজ আসছে। এসব আওয়াজ গণ্ডগোলের শব্দে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।)

ওদিকে দূরে ঐখানে একটা গণ্ডগোল শুরু হয়েছে,
ক'জন সিপাই মিলে একজন লোককে ধরে রয়েছে,

ওকে বেঁধে ফেলেছে,
ধমক দিয়ে ওকে কিছু বলছে ;
ছ'জন সিপাই ওর হাত ধরে আছে
এক হাত দিয়ে ওর মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে একজন,
কিন্তু ও কথা না বলে ছাড়বে না
ঐ ঐ ওর কথা শোনা যাচ্ছে !

এই ব্যক্তির কণ্ঠস্বর : ভাইসব শোন !
আমি ইঁদুর তুমিও ইঁদুর
আর সিপাইও ইঁদুর !
শুধু ওর হাতে বন্দুক আছে, কিন্তু
এই বন্দুকধারীও ইঁদুরই, তফাত কেবল
ও সখের একটা রঙবেরঙের
উর্দী পরে আছে । এই অগ্নিবৃষ্টি
থেকে কারোরই নিস্তার নেই !

(সৈনিকদের মার্চ করে যাওয়ার আওয়াজ, বিউগল ধ্বনি, বৃষ্টিবাদলের গর্জন ।)

আমাকে মারছে মারুক, কিন্তু
মহাপ্রলয়ের ঝড়ে
এরাও শুকনো পাতার মতোই ঝরে পড়বে ।
আজ সৃষ্টির শেষ দিন
আজ সমস্ত আকাশ এক জায়গায় কুঁচকে গিয়ে
ভেঙে পড়বে ।
কাল সারা রাত ধরে শ্মশানের সুর বেজেছে
রাতে চাঁদের গায়ে আমি দেখেছি লাল রক্তের
ছাপ !
আজ জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরবে

যমদেবের অজগর বিরাট এক নিশ্বাসে
টেনে নেবে ইঁদুরকে ! আমরা ইঁদুররা মরে যাব !

(ভীড়ের মধ্যে থেকে গম্ভীরস্বরে বার বার শব্দ ওঠে—"আমরা ইঁদুর, সবাই মরে যাব। আমরা ইঁদুর, সবাই মরে যাব।" হতাশা, তারপর দুঃখভরা কাতরস্বরে কিছু লোক গাইছে আর কিছু লোক তাদের সঙ্গে স্বর মেলাচ্ছে। হতাশা, অবসাদ আর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার জন্য। অনুশোচনার সুর! তারপরেই অবসাদের মধ্যে একটা দৃঢ়তা। ভাবটা এইরকম ঃ ইঁদুর হওয়া আর মরাই ওদের ভাগ্য ও জীবন দর্শন। কিন্তু লোকটি আবার যেন একটু দমে যায়। সহসা ভীড়ের মধ্যে থেকে লোকটির কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। নিরুপায় ও নিষ্ফল ক্রোধের স্বরে—"আমরা ইঁদুর, সবাই মরে যাবো।" গুলির শব্দ। তারপর সব শান্ত—নিশ্চুপ—শ্মশানের নিস্তব্ধতা।)

ঘোষক ঃ খতম হয়ে গেল !
সৈনিকের গুলিতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে,
কালো রাস্তা রক্তে লাল হয়ে গেছে,
এখনো ওর লাশটা পড়ে আছে !
লোকজন একেবারে চুপচাপ হয়ে দাঁড়িয়ে,
ভয়ে কয়েকটা বাচ্ছা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠছে।
লোকজন একেবারে চুপচাপ !
সারা পশ্চিম পাহাড় জুড়ে,
অগ্নিবৃষ্টি হয়ে চলেছে
আগুনের লেলিহান শিখা এদিক ওদিক ছুটছে।
দূরে উপত্যকায় সাঁ সাঁ করে
কালো বিষাক্ত হাওয়া বয়ে চলেছে,
লোকজন একেবারে নিশ্চুপ !

(সৈনিকদের মার্চ করার শব্দ। ব্যাণ্ডে ফৌজী গৎ বেজে চলেছে। ভীড়ের মধ্যে থেকে গান উঠছে—"ওটা ইঁদুর ছিল—মরে গেছে। আর আমরাও ইঁদুর আমরাও মরে যাবো।")

সৈনিকরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে,
রাস্তা থেকে ভীড় সরে যাচ্ছে
শোনা যাচ্ছে, এবার শাসক স্বয়ং আসবেন !

(ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন আরো জোর হয়। "আমরা ইঁদুর, আমরা মরে যাব ; আমরা ইঁদুর কেন ? কেন আমরা ইঁদুর ?" বিউগল ও ড্রামের আওয়াজ।)

ঐ দেখ, নগরীর শাসক স্বয়ং দৌড়ে আসছেন।
চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে
কি যেন বলছেন।
সৈনিকরা বেয়নেট উঁচিয়ে ওঁর চারদিক ঘিরে
রয়েছে,
ভীড় ক্রমশই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে
ঐ শাসকের গলা শোনা যাচ্ছে !

শাসক ঃ লজ্জা ! একি লজ্জা !
ও আমার নগরবাসীরা !
এত ভয়ের কি হয়েছে ?
যেন সারারাত ধরে শ্মশানের সুর বেজে চলেছে
কিম্বা পশ্চিম পর্বতে
অবিরাম অগ্নিবৃষ্টি হয়ে চলেছে !
পাজী, হতচ্ছাড়ার দল ! তোরা কি ভুলে গেছিস,
আমি নিজের রাজ্যকালেই
সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছি নগরীর দেওয়াল
সারা মাঠ ঘাট এখনও শ্যামল হয়ে আছে
নদী বরাবর মাইলের পর মাইল জুড়ে বাঁধ

দেওয়া আছে
তাছাড়া, আমার এই প্রজাতন্ত্রে
বিনা ভোটে একটা ফুল পর্যন্ত যখন ফোটে না,
তখন প্রলয়ের সাধ্য কি
যে বিনা ভোটে এখানে আজ এসে হাজির হয় !
তা সত্ত্বেও এই গোলাগুলি বৃষ্টি
এখনই বন্ধ করবার হুকুম আমি দিচ্ছি।
সেনাপতি !...

(ভীড়ের মধ্যে সোরগোল ওঠে। ফায়ারিং-এর শব্দ। প্রথমে একটা তারপর বেশ কয়েক রাউণ্ড।)

ঘোষক : সৈনিক আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে
কিন্তু মহাকালের পিপাসু জিহ্বার মতো
বাদল ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

(মেঘের গর্জন)

ঐ দূরে পাহাড় থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন,
লম্বা দাড়ি আলখাল্লা গায়ে জ্বলজ্বলে চোখ
বৈজ্ঞানিক। লোকে বলে ও নাকি যাদুগর, যুগদ্রষ্টা।
সাত কাল ধরে ওর ঐ বুড়ো চোখ
শুধু দেখছে আর দেখছে।
লোকজন ওকে রাস্তা করে দিচ্ছে,
এমন-কি রাজাও ওকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

(দু সেকেণ্ড সব চুপচাপ)

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ঐ বুড়ো
আস্তে আস্তে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা
মৃতদেহের কাছে পৌঁছে যায়।

(দু সেকেণ্ডের জন্য একেবারে নিশ্চুপ)

মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে
কি যেন দেখছে ও !

(ক্রুর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ঐ বুড়ো ।)

মৃতদেহটাকে দেখে ও হাসছে ।
কি কর্কশ হাড়-কাঁপানো হাসি !
উঃ কি ভয়ংকর হাসি !
শাসকের সারা গায়ে যেন কে
কালি ছড়িয়ে দিয়েছে ।
শাসক রীতিমতো ঘাবড়ে গেছেন,
ঐ শাসকের গলা, শোন—

শাসক : বন্ধ কর, থামাও, থামাও ও হাসি
বন্ধ কর...
বন্ধ কর...
বন্ধ...

বৈজ্ঞানিক : **(হাসতে হাসতে)**
প্রলয়ের প্রথম এই অক্ষর
তুমি ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছো !
আমি আমার এই চোখে
সাতটা যুগ গড়তে আবার ভাঙতে দেখেছি
আর শুনেছি,
যেদিন পশ্চিম পাহাড়ে ঝম্‌ঝম্ করে
অগ্নিবৃষ্টি নামবে
আর রাস্তায় পড়ে থাকা একটা মৃতদেহ
তার চেহারা বদলাতে থাকবে
সেইদিন এই নগরীর অন্তিম ক্ষণ উপস্থিত হবে ।
তোমরা যারা এই শেষক্ষণ অবধি বেঁচে আছ
আজ সব কিছু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই খতম
হয়ে যাবে

—এক সৃষ্টির, এক সভ্যতার নির্লজ্জ পূতিগন্ধময়
ইতিহাস !
ওগো সোনার তৈরী মহলবাসী শোন,
আজ ইঁদুরের এই সংস্কৃতি
শেষ হয়ে যাবে ।

শাসক : বন্ধ কর এই রাজদ্রোহ !

বৈজ্ঞানিক : এ বিদ্রোহ নয় !
তুমি নিজেই মৃত্যুকে ডেকে এনেছো
দেখ, এবার পরিত্যক্ত উলঙ্গ এই মৃতদেহটা
তার চেহারা বদলাতে থাকবে,
তাবপর সে চুমু খাবে ঐ পাহাড়গুলোকে ।
এই বাদল, এই নদনদী, এইসব বৃহৎ শিলাখণ্ড
সব এই মৃতদেহের অধীন হবে ।
এই মৃতদেহই হল,
মহাপ্রলয়ের প্রথম শ্বেত চিহ্ন ।

শাসক : সেনাপতি...

বৈজ্ঞানিক : আমাকে শেষ করতে দাও

শাসক : সেনাপতি । বন্দুক...

বৈজ্ঞানিক : এই বন্দুক দিয়ে আর কতকাল
তুমি নিজের নিয়তিকে ঠেকিয়ে রাখবে ?
এ বন্দুক আমারই আবিষ্কার
যা দিয়ে তুমি আজ আমার আওয়াজ স্তব্ধ করতে
উদ্যত ।

শাসক : সেনাপতি ।
এই পাগলটাকে একটু শায়েস্তা করা দরকার ।
(**ফায়ারিং**)

বৈজ্ঞানিক : আঃ আঃ...
(**ভীড়ের মধ্যে সোরগোল ওঠে** ।

বৈজ্ঞানিক ঘায়েল হয়েছেন। ফিস-ফিসানির শব্দ।)

আমরা ইঁদুর, আমরা মরে যাব।
এই যাদুকর ইঁদুরদেরই লোক,
এই রাজাও ইঁদুরদের লোক
এই মৃতদেহটাও ইঁদুরদেরই।
আমরা সবাই ইঁদুর, সবাই মরে যাব।

বৈজ্ঞানিক : তোমরা আমার ঘাড় মটকে দিতে পার,
কিন্তু এই আগুয়ান ভবিষ্যতের যাত্রা
তোমরা রুখবে কি করে ?
এই বাদল চলবেই
আর মৃতদেহটা তার চেহারা বদলাবেই।
(আবার ফায়ারিং)

কমে যাওয়া ভীড়ের এক অংশ : মৃতদেহ তার চেহারা বদলাবে।

ভীড়ের অপর অংশ : মৃতদেহ তার চেহারা বদলাবে !
(ধীরে ধীরে দুদিকের দুটো আওয়াজ ক্রমশঃ মিশে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে গুঞ্জন তোলে। মেঘ ডাকতে থাকে—বজ্র-পাতের শব্দ)

ঘোষক : বৈজ্ঞানিকে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে
উন্মত্ত জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে,
আগুনের ঐ খুনে বাদল গর্জন কানে আসছে,
সত্যি সত্যি, মৃতদেহটা তার চেহারা বদলাচ্ছে
আরে ওকি। ও যে দাঁড়িয়ে উঠেছে
ওর চোখের পাতা নড়ছে,

ওর শুকনো কালো ঠোঁটদুটোও কাঁপছে।
আরে এ যে কথা বলছে।

মৃতদেহ : থাম। থাম সব। পালিও না।
পালাবে কতক্ষণ ?
তোমরাই তোমাদের মৃত্যু ডেকে এনেছো
তাই তাকে স্বীকার না করে আর উপায় নেই
তোমরা সেই নগরের বাসিন্দা
যার নীচে লুকনো আছে
লক্ষ লক্ষ শিশুর মাথার খুলি।
তোমরা সেই নগরের অধিবাসী
যেখানে বুভুক্ষু শৃগাল মৃতা নারীদেহকে
ভোগ করে তার কামনা মেটায়।
তোমরা সেই নগরের লোক
যেখানে সব কিছুর বিচার হয় হত্যা আর হাত-
কড়ির মানদণ্ডে,
তোমরা সেই নগরের বাসিন্দা।
সেই নগরেরই বাসিন্দা
যেও না, পালিও না।
কতক্ষণ পালিয়ে বাঁচবে ?
মৃত্যু তোমাদের বাড়ীর প্রতিটি ইট থেকে
ফুটে বেরোবে
মৃত্যু পৃথিবীকে ভরিয়ে তুলে
উপচে পড়বে
আকাশ থেকে খসে পড়বে মৃত্যু।
যে মৃত্যুকে তোমরা ডেকে এনেছো
তাকে স্বীকার কর।
ভেগো না ! পালিও না !
কতক্ষণ পালাবে ?

শাসক : (ভয়ার্তকণ্ঠে) সেনাপতি...
(সৈন্যদের 'সাবধান' হওয়ার আওয়াজ! ফায়ারিং)

মৃতদেহ : এই বন্দুক, এই সৈন্যবল
এসব দিয়ে তোমরা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।
আমি মৃত্যুলোক থেকে ফিরে এসেছি।
আমি মৃত্যুঞ্জয়!
আমাকে মাধ্যম করে কেউ একজন কথা বলছেন।
আমি ধরিত্রীর, জনগণের ও ভগবানের কণ্ঠস্বর।
এই পৃথিবীর বুকের ওপর তোমরা যুদ্ধের পর যুদ্ধ ডেকে এনেছ
এই পৃথিবীর কঙ্কালের ওপর তৈরী করেছ এই বাড়ীঘর!
এতদিন অবধি আমি চুপ ছিলাম
বলেছ তোমরা,
এবার আমার পালা, আমি বলবো।
এতদিন পর্যন্ত তোমরা এগিয়ে চলেছ
আমি পেছনে বাঁধা পড়ে ছিলাম দৃঢ় শেকলের বাঁধনে,
এবার আমার চলা শুরু হয়েছে
পৃথিবী টলমল করে উঠবে।
এবার আমার পালা এসেছে
আমি বদলা নেব।
লণ্ডভণ্ড করে দেব এই নগরী।
এর অলিতে গলিতে
আগুনের নদী বইয়ে দেব আমি।
(জনতার ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নের শব্দ)

পালিও না !
কতক্ষণ পালাবে ?
মাটির প্রত্যেকটি টুকরোর নীচে
একটা-না-একটা মৃতদেহ এই সুযোগের অপেক্ষায় শয়ান আছে।
তোমাদের পা আটকে যাবে,
পৃথিবী তোমাদের চুষে ফেলবে।
যুগ যুগ ধরে যার ওপর
সজোরে পদাঘাত করতে করতে তোমরা চলে আসছো
ভূমণ্ডলকে ফুঁড়ে সে-ই আজ বাইরে প্রকট হয়েছে।
এই জ্বালামুখী পাহাড়
যুগ যুগান্তের ঘৃণা বুকে ধারণ করে
নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে !
কিন্তু এবার এটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।
রক্তখেকো দৈত্যের লক্‌লকে জীবের মতো
অগস্তি অগ্নিশিখা
এ নগরীকে গ্রাস করে ফেবে।

ভীড়ের একঅংশ : মৃতদেহ আপনাআপনিই বদলে যাবে !

ভীড়ের অপর অংশ আমরা সব ইঁদুর, সবাই মরে যাব !

(ভীড়ের মধ্যে এই আওয়াজ ছুটো মিলিয়ে যায়)

ঘোষক লোকজন সব পালাচ্ছে !
নগরে হাহাকার পড়ে গেছে।
মৃতদেহটা কাটা জায়গাটায় হাত দিয়ে চেপে ধরে

ভূতের মতো ডগমগ্ করতে করতে
এগিয়ে চলেছে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে।
এ যেখানেই যাচ্ছে সেখান থেকেই
লোকজন দৌড়ে পালাচ্ছে !
রাস্তা একেবারে শান্ত, চুপচাপ
অগ্নিবৃষ্টির গর্জন থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে।
মৃতদেহটা ধীরে ধীরে পশ্চিমের পাহাড়ে উঠছে।
লোকজন এখনও পালাচ্ছে।
কিন্তু পালাবার আর রাস্তা নেই।
পাগলা কুকুরের মতো
দিশেহারা হয়ে অলিগলি দিয়ে লোকজন দৌড়াচ্ছে।
মৃতদেহটা পর্বতের চূড়োয় পৌঁছে গেছে
জ্বলজ্বলে চোখে একবার নগরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে
তারপর ঐ বলছে, শোন—

মৃতদেহ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
মৃত্যুশিয়রে যমদূতের মতো
হে পর্বত, তুমি চুপ করে
সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ !
মহাপ্রলয় ঘনিয়ে এসেছে।
সারা সংসার যেন অলিতে গলিতে কেঁউ কেঁউ করে
পাগলা কুকুরের মতো ডেকে উঠছে।
চাঁদ যেন রক্তে মুখ ধুচ্ছে।
হে পর্বত, তুমিও ধীরে ধীরে
বদলে যাবে।
অগণিত অগ্নিশিখা নরকের নীচে থেকে দাউ দাউ
করে উঠে আসছে
যুগ যুগ ধরে বিষাক্ত ধোঁয়া এসে বুকের মধ্যে
ঢুকছে !

নগরীর ওপর যেন পাথরের একটা স্তর পড়ে আছে
যেন এক মহাধ্বংস ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে
ঐ পাথরের স্তরকে গলিয়ে ফেলছে।
ও, ক্ষুধার্ত জ্বালামুখী, তুমি
দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠো।
তোমার অন্ধ গহ্বরে বন্দী
ভয়ংকর অগ্নিদানবকে মুক্ত করে দাও !
পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধুলিকণাকে
এই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা উল্কার আগুন
যেন ঝলসে ফেলে।
ও, ক্ষুধার্ত জ্বালামুখী, তুমি দাউ দাউ করে জ্বলতে
থাক !
আমার এই মৃত ঠোঁট দিয়ে তোমার ঐ কালো
পাথরকে আমি
চুম্বন করছি। ও ক্ষুধার্ত জ্বালামুখী,
তুমি জ্বলো, আরো ভয়ংকর হয়ে জ্বলো !

(সহস্র কণ্ঠে 'জ্বলো' 'জ্বলো' আওয়াজ। অল্পক্ষণের জন্য সব চুপচাপ। হঠাৎ দারুণ এক বিস্ফোরণের শব্দ। ঝড় যেন পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়ে ঘর-বাড়ী সব ফেলে দিচ্ছে। তারমধ্যে লোকজনের দৌড়ে পালানোর মর্মভেদী চিৎকার ও মর্মান্তিক করুণ কান্না। মনে হচ্ছে, যেন নরকের সর্বশেষ কুণ্ড থেকে এই আওয়াজ উঠে আসছে। ধীরে ধীরে হাজার বেড়ালের কান্নার শব্দ এক সঙ্গে। শব্দ দূরে মিলিয়ে যায় আর সবশেষে এক অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাস।)

ঘোষক : ধ্বংস হয়ে গেল।
সব কিছু একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল!
লক্ষ লক্ষ বছর ধরে
তিলে তিলে যা তৈরী হয়েছে
তার সব নষ্ট হয়ে গেল!
ঐ মেঘের গর্জন, মহাপ্রলয়ের বর্ষণ
চলেছে অবিরাম!
সোঁ সোঁ করে ছুটে চলেছে আগুনের নদী
নগর প্রান্তর সব যেন গিলে ফেলবে।
বাচ্ছা, বুড়ো, যুবক যুবতী সবাই
আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে
পোড়া মাংসের ঝাঁঝাল দুর্গন্ধে চারদিকে ভরে যাচ্ছে
জ্বলন্ত নগরীর পোড়া ধোঁয়ায়
নগরীর দম বন্ধ হয়ে আসছে।
পচাগলা মড়া সমস্ত কাদায় আটকে আছে
মৃতদেহ হো হো করে বিকট হাসি হাসছে।
পর্বতের নীচে দাঁড়িয়ে হো হো করে সে হেসে চলেছে।
দুহাত দিয়ে মৃতদেহটা আগুনে খোঁচা দিচ্ছে,
আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে
মহাপ্রলয়ের বজ্রনাদের মতো।
সেই আগুনকে সে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে
তাতে আগুন আরো দ্বিগুণ বেগে জ্বলে উঠছে।
আগুনে হাওয়া লেগেছে
আগুনের তাপে কড়্‌কড়্‌ করে পাথর ফাটছে।
ভয়ংকর রকমের বিদ্রোহীভাবে ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে
মৃতদেহটা— ওর মৃত্যু নেই

ও আত্মতৃপ্তির হাসিতে ভরপুর।
ওর চোখের পাতার ওপর ছাই এর স্তর পড়ে গেছে।
কিন্তু ওর মগজে ফুল ফোটার আনন্দ!
উপত্যকা থেকে উপত্যকায়
রাজপ্রাসাদ থেকে চৌমাথা পর্যন্ত
অলিতে গলিতে সব জায়গায়
নোংরা পচা মৃতদেহগুলো
ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিকে।

(গোলমালের শব্দ। কান্না থামে। কিছুক্ষণের জন্য সব চুপচাপ। কেবল মৃতদেহটার ভারী পায়ে চলাফেরার শব্দ।)

আর কেউ বেঁচে নেই।
গালার তৈরী বাড়ীর মতো সমস্ত নগরী পুড়ে ছাই হযে গেছে।
এখন এই বিস্তৃত নগবীতে
আর কোন জ্যান্ত হাতাব নিশ্বাসও শোনা যাচ্ছে না।
এই মৃতদেহটা সমস্ত সভ্যতাকে আঙুলে পিষে
মেরে ফেলেছে। একটা পাগলা হাওয়া
অলিগলির মধ্যে দিয়ে সাঁইসাঁই করে
ছুটে বেড়াচ্ছে। উৎখাত সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের ওপর দিয়ে।
আগুন আর রক্তের মহানদী
সোঁ সোঁ করে মৃতদেহে বোঝাই হয়ে
বেগে ছুটে চলছে।

(নদীর ভয়ানক সোঁ সোঁ শব্দ আর সেইসঙ্গে শেয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক।)

পৃথিবীতে আর জীবনের সূত্রপাত ঘটাবে না।

এই ঘৃণিত ইতিহাসের আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।
চিরকালের মতো ধরিত্রীর কোল
আগুনে পুড়ে গেছে। এই বন্ধ্যা পৃথিবীটা
আর কিছুদিনের মধ্যেই
মৃত গ্রহের মতো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।
(শেয়ালের ডাকে চারদিক ভরে যায়।)
কিন্তু এ কি ?
ক্ষেতের পাশে মেঠো রাস্তার ওপর ও দাঁড়িয়ে পড়লো কেন ?
ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখছে।
আগুনের নদী এখনও এখানে এসে পৌঁছায় নি।
ও কি দেখছে ?
একটা লম্বা গমের চারা, দুর্বল, ফিন্‌ফিনে
হাল্কা রোদ্দুরে আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।
তার পাশেই একটা জংলী ফুল ফুটেছে।
মৃতদেহের ছাই-এ ভরা চোখের পাতা ভিজে গেল যে !
এই ছোট্ট গমের চারাটাকে
যেন আশীর্বাদের দৃষ্টিতে সে দেখছে।
দেখো, ওর রুক্ষতা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে।
হাত উঠিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলা
আগুনের মহানদীকে ও কিছু বলছে।

মৃতদেহ : দাঁড়াও !
ও জ্বালামুখী, এবার তোমার মুখ বন্ধ কর !
ধরিত্রীর বুকের মধ্যে যেখানে, ঘৃণা চাপা পড়ে ছিল

সেখানে সৃষ্টির একটা বীজও সেইসঙ্গে লুকোনো ছিল।
যা প্রলয়ংকর ঝড়ের বিভীষিকাতেও ভীত হয়নি,
যা পাথরের স্তর ভেদ করে ওপরে উঠে এসেছে।
এ হল আগামী দিনের সৃষ্টির প্রথম আশীর্বাদ।
হে বহ্নিময় সূর্য, একে প্রণাম করো।
হে রক্তস্নাত চন্দ্র।
হে অগ্নিময় মহানদী, একে প্রণাম করো!
গমের ঐ ছোট্ট বীজের মধ্যে
লজ্জারাঙা এক নতুন সভ্যতা লুকিয়ে ছিল।
এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে নব গন্ধর্ব— নগরী সমূহ,
এতে এক নতুন দর্শন, নতুন প্রেরণা স্পন্দিত হচ্ছে।
নতুন কল্পনা, নতুন গান, নতুন পৃথিবী
এক ছোট্ট সবুজ গমের চারায়
শীতল ছায়া ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠবে।
এক সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে
এবার আমি গম চারার
স্নিগ্ধ ছায়ায় ফুলের মতো সুন্দর
এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলবো।

(নদীর সোঁ সোঁ শব্দ দ্বিগুণ হয়। আবার শেয়াল ডেকে ওঠে।)

ঘোষক : কিন্তু এ কি?
দুরন্ত নদীটা যে সামনে ছুটেই চলেছে
ক্ষুধার্ত সাপের মতো লক্ষ লক্ষ লক্‌লকে জীব নিয়ে!
বিরাট হাঁ করে আগুন সামনে বেড়েই চলেছে

মৃতদেহটা একেবারে খাড়া হয়ে
চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে কি যেন বলছে।

মৃতদেহ ঃ তোমরা শুনবে না, আমার কথা ?
থাম, ও জ্বালামুখী, এবার থামো।
ও অগ্নিময় আঁধারি ঝড়।
আর এক পাও এগিয়ো না।
আব ধ্বংস নয়, এবার নতুন সৃষ্টি শুরু হবে।
কি হল, তোমরা কি শুনবে না ?
আমি মৃত্যুঞ্জয়।
আমাকে গ্রাস কবার ক্ষমতা তোমাদেব নেই
ও ঘৃণার কালোদস্যু।
তোমাকে আমি হাসিমুখে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি।
দাঁড়াও দাঁড়াও এবার ও ঘৃণার মত্ত শক্তি।
ও আগুনের সর্বব্যাপী অন্ধকার।
গমেব এই শিশু চাবা
এই জংলী ফুল
নতুন পৃথিবীর প্রথম আশীর্বাদ এরা।
এদেব গায়ে যদি এতটুকু আগুনেব তাপও লাগে
তাহলে চন্দ্রতারাকে পৃথিবীব ওপব
ছুঁড়ে ফেলে গুড়িয়ে দেব আমি।

(নদীর সোঁ সোঁ শব্দ আরো নিকটবর্তী হয়।)

ঘোষক কিন্তু আগুনেব তেজ কমছে না,
ক্ষুধার্ত ডাইনীব মতো
মহানদী, চুল এলোমেলো করে
সোঁ সোঁ করে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে,
ঐ জায়গায় ওবা প্রায় পৌঁছোয় পৌঁছোয়।

মৃতদেহটা গমের শিশু চারাকে
হাত দিয়ে ঘিরে রেখেছে।
বুক দিয়ে আগুনের তাপ থেকে
চারাটাকে রক্ষা করছে।
গলা অবধি আগুনে ডুবে গেছে সে,
তবুও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
লোহার মতো শক্ত দৃঢ় দেহ
আর মাথায় সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে।

(ধীরে ধীরে নদীর আওয়াজ দূরীভূত হয়। অত্যন্ত মধুর এক সংগীতের তান বেজে উঠতে থাকে আর দূরে পুজোর শঙ্খধ্বনি ঘণ্টা শোনা যায়।)

গলন্ত আগুনের বন্যা
ক্রমে দূরে সরে যেতে থাকে।
আকাশে রামধনু দেখা দেয়।
তার ওপর ধীরে ধীরে জ্যোতির আভা ফুটে ওঠে।
এবার অগ্নিবন্যা সরে যায় ধীরে ধীরে।
মৃতদেহটা অনিমেষ নয়নে
এক অজানা ভবিষ্যতের
নতুন সৃষ্টির পানে তাকিয়ে থাকে।
এক নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন
এই গম চারার শীতল ছায়ায়
ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নেবে।

(নদীর শব্দ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। চারদিক একেবারে নিশ্চুপ।)

অগ্নিবন্যা শেষ হয়ে গেছে।
ধরিত্রী আবার ফুলে ফুলে ভরে উঠছে।

এক স্বর্গীয় সংগীত
উপত্যকায় ঘুঙুরের নাচ শুরু হয়েছে,
যার তালে তালে এক নতুন পৃথিবী নেচে উঠছে।
যার তালে তালে
আবার ঠোঁটে ঠোঁটে চুম্বনের স্পর্শ অনুভূত হবে,
চোখে আনন্দাশ্রু টলমল করে উঠবে।
যার তালে তালে
আবার নতুন সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।
যার ছন্দে ছন্দে
জ্বালামুখীতে এক প্রশান্ত ভাব এসেছে
সে ধীরে ধীরে পিছনে সরে যাচ্ছে।
নতুন পৃথিবীর প্রথম সূর্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের রাঙা আভা দিয়ে
ধ্বংসের ওপর গড়ে ওঠা নতুন পৃথিবীকে আলোময়
করে তুলেছে।
ধ্বংসস্তূপ এবং প্রস্ফুটিত গোলাপ সবই
সুন্দর হয়ে উঠছে।
সৃষ্টির এই শেষ মানুষ
নতুন সৃষ্টির কর্তা মনু হয়ে সামনে এগিয়ে
চলেছেন।
পৃথিবীর এই নতুন স্তরের ওপর দাঁড়িয়ে
আমি ভবিষ্যতের পানে চেয়ে
আগামী দিনের কোন এক মুহূর্তের
কথা বলছি।
ও মনু রাজার সন্তান সন্ততিরা!
তোমরা শোন! শোন!

আমি নতুন সৃষ্টির
উদ্‌ঘোষক বলছি।

(তূর্যনাদ, শঙ্খধ্বনি, মঙ্গলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নবজাত শিশুর প্রথম হাসির মতো সহজ সাবলীল সুন্দর সংগীত।)

(পর্দা পড়ে)

হিন্দুস্থানে গিয়ে বোলো

—চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার

চরিত্র :

বৃদ্ধ : পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার জন্য পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন— এমন একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

নির্মলা : বৃদ্ধের যুবতী কন্যা

মুকন্দী : বৃদ্ধের যুবক পুত্র

ড্রাইভার : হাবিলদার ইত্যাদি

(2)

সিকান্দার : যবন বিজেতা

এণ্ট্রিয়োক্স : সিকান্দারের সহকারী।

যবন সৈনিক

(3)

স্কন্দগুপ্ত : হুণ-বিজেতা বিখ্যাত গুপ্ত সম্রাট।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের নাগরিক বৃন্দ।

(4)

রঞ্জিত সিং : পাঞ্জাব কেশরী বিখ্যাত বীর

সরদার সিং : রঞ্জিত সিংহের সহকারী

চিরাগআলি : হবিবুল্লা ইত্যাদি।

(লরি মোটর ইত্যাদির এক লম্বা সারি চলেছে। একটানাভাবে নতুন ও পুরোনো মোটর ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে বাচ্ছা ছেলের কান্নার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে। একটু পরেই এক লরি ড্রাইভারের জোর গলা শোনা যায়— প্যারে সিং! ও প্যারে সিং! কোন জবাব আসে না। একটু পরে আবার শোনা যায় "প্যারে সিং! ও প্যারে সিং! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?" জবাব আসে, "আরে না, না, এখানে কারো ঘুম হয় নাকি? এমন ভয়াল রাত।" ইতিমধ্যে চলতি লরি থেকে আর একটা আওয়াজ শোনা যায়— "হাবিলদার সাহেব, হিন্দুস্থান আর কতদুর?"

হাবিলদার : রাবীর ও-পারেই হিন্দুস্থান আর রাবী এখনো এক ঘণ্টার রাস্তা।

বৃদ্ধের গলা : রাবী অবধি পৌঁছাতে এখনও এক ঘণ্টা! রাবীর ওপারে হিন্দুস্থান! আমার সাধের হিন্দুস্থান!

হাবিলদার : হ্যাঁ দাদু, তাঁর দয়া হলে আমরা একঘণ্টা পরেই হিন্দুস্থানে পৌঁছে যাবো।

বৃদ্ধের গলা : তাঁর দয়া হলে? ঠিকই বলেছো, তিনি যদি চান, তাহলে আজকের এই রাতের নিশুতির মধ্যে মাত্র একঘণ্টা পরেই আমরা এই ক্লান্ত দেহে মুক্তকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে পারবো "জয়হিন্দ"

(লরিতে বসে থাকা স্ত্রী পুরুষ ও বাচ্ছাদের কণ্ঠে নীচু স্বরে আওয়াজ ওঠে "জয়হিন্দ"।

লরি ড্রাইবার : প্যারে সিং !. বিপদের জায়গা আর কিছু বাকী নেই তো ?

প্যারে সিং : যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছি, কোথায় বিপদ আছে আর কোথায় বিপদ নেই, তা বলা শক্ত। এই গাঁটা হচ্ছে রাবী থেকে মাত্র তিন মাইল।

জনৈকের কণ্ঠস্বর : সময় যেন আর কাটতে চায় না। বাকি এই পঞ্চান্ন মিনিট যেন পঞ্চান্ন বছর মনে হচ্ছে।

হাবিলদার : সময় কাটতে চাইছে না তো গান গাও। কার সাধ্যি তোমার গান বন্ধ করে।

প্যারে সিং : শাবাশ, হাবিলদার সাহেব, শাবাশ। তাহলে বন্ধুগণ ! আপনাদের মধ্যে গাইতে পারে এমন কেউ আছেন ?

জনৈকের কণ্ঠস্বর : তা কেন, সবাই মিলে গাইলেই তো হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবের সীমান্তে দাঁড়িয়ে শস্যশ্যামল পাঞ্জাবের প্রশস্তিতে এই বোধ হয়, আমাদের শেষ গান।

ঠিক আছে ! ঠিক আছে !

(**মিলিত কণ্ঠে গান** (**কোরাস**) **স্ত্রী ও পুরুষের মিলিত কণ্ঠে**) গানের সারমর্ম হল এই রকম : যে দেশ সূর্য-চন্দ্রের অকৃপণ কিরণ-সম্পাতে ধন্য, সে হল, আমাদের সাধের পাঞ্জাব— সবুজ শস্যক্ষেত্র, সমতল প্রান্তর, আম্রকুঞ্জ ও উঁচু উঁচু সবুজ ও সীসমের সারি দিয়ে ঘেরা। দিবারাত্র পঞ্চ নদ আমাদের এই মাতৃভূমির চরণ বন্দনা করে। গান শেষ হতে না হতেই গুলি চলার জোর শব্দ কানে আসে। আর গানের লয় হঠাৎ থেমে যায় যেন বাজতে বাজতে হঠাৎ সেতারের তার কেটে গেল। 'আল্লা হো আকবর' ! আর 'ইয়া আলী' ! খুব নিকটেই এইসব আওয়াজের সঙ্গে ড্রামের শব্দ এবং গুলি চলার আওয়াজ কানে আসে। লরি যাওয়ার শব্দ হঠাৎ থেমে যায় এবং অন্যদিকে ড্রামের শব্দের সঙ্গে আওয়াজ ওঠে "হর হর মহাদেব !" এবং

"সৎশ্রী আকাল!" ড্রামের শব্দ, বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে মিলিত হয় স্ত্রীলোক ও শিশুদের করুণ কণ্ঠস্বর।

(2)

অত্যন্ত আতঙ্কিত এক কণ্ঠস্বর: বাবা! বাবা! **একটু পরেই আবার** বাবা! বাবা! **অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে এক বৃদ্ধের গলা:** হুঁ!

মেয়ের কণ্ঠস্বর: ভাই, আবার জ্ঞান ফিরেছে! বাবা! বাবা!

বৃদ্ধ: মা নির্মল! বাবা মুকন্দী!

নির্মলা: হ্যাঁ বাবা, আমরা তোমার কাছেই আছি।

বৃদ্ধ: আমরা কোথায়?

মুকন্দী: রাস্তা থেকে অনেক দূরে একটা ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে আছি!

বৃদ্ধ: তোর দাদা দেশরাজ কোথায় রে?

মুকন্দী: তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে দাদা খুন হয়েছে বাবা!

বৃদ্ধ: ওঃ ভগবান! প্রভু, কোন্ অপরাধে এই বুড়ো বয়সে আমাকে এমন দণ্ড দিলে?

মুকন্দী: ভেঙে পড়বেন না বাবা! সাহসের সঙ্গে এখন যুঝতে হবে আমাদের।

বৃদ্ধ: তোমাদের মা বড় পুণ্যবতী ছিলেন রে, তাকে এই দুর্দিন আর নিজের চোখে দেখতে হ'ল না।

মুকন্দী: এখন কেমন বুঝছেন? সুস্থ বোধ করছেন তো বাবা?

বৃদ্ধ: হিন্দুস্থান আর কতদূর রে?

মুকন্দী: হিন্দুস্থানের সীমা থেকে আমরা খুব একটা দূরে নেই, বাবা!

বৃদ্ধ: (**যেন বেহুঁশ হয়ে পড়ে**) হিন্দুস্থান! আমার সাধের হিন্দুস্থান! স্বাধীন হিন্দুস্থান!

নির্মলা: বাবা, বাবা!

বৃদ্ধ: মা নির্মল! বাবা মুকন্দী!

নির্মলা : কি বাবা ?

বৃদ্ধ : বাছা, তোরা এই আঁধারি রাতে হিন্দুস্থানে চলে যা।

মুকন্দী : অসম্ভব ! পূজনীয় দাদার দেহ সৎকার না করে এবং আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত না করে আমরা এখান থেকে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারি না।

বৃদ্ধ : আমার এখনও জ্ঞান আছে রে ! নিজের বড় ছেলের দাহকর্ম আমি নিজে হাতে করবো। বাবা, মুকন্দী ! তুই তোর বোনকে নিয়ে এখনই হিন্দুস্থানের দিকে রওনা দে।

মুকন্দী : তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি জানি, তোমার আঘাত বেশ গুরুতর। (কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে যায়) ওঃ বাবা। আপনি আমাকে এতদূর কৃতঘ্ন ভাবেন ?

বৃদ্ধ : একটু আগেই তুই আমাকে সাহসের সঙ্গে যোঝবার কথা বলছিলি না ? সত্যি কথা বলতে কি, এছাড়া আর আমাদের করারই বা কি আছে ? (যেন নিজেই নিজেকে বলছে) আমার ঘরবাড়ী সব লুট হয়ে গেছে। নিজের সাধের দেশের মাটি থেকে, যে মাটিতে আমি জন্মেছি, যে মাটিতে আমি খেলাধুলো করেছি, যে মাটির প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে আমার আজন্মের আত্মীয়তা— সেই মাটি থেকে সেই দেশ থেকে আমরা চিরদিনের জন্য বিতাড়িত। আর আজ সেই সাধের মাতৃভূমির সীমান্তে এসে এই ঘন আঁধারি রাতে আমার স্নেহের দুলাল আততায়ীর হাতে খুন হ'ল ; তোরও জীবন সংকটাপন্ন, আর আমার সামনে মেয়ের ইজ্জত সংকটাপন্ন আর এই সত্তর বছর বয়সে আমার ছাতিতে আমাকে ছুরির আঘাত সহ্য করতে হল। উঃ, ভগবান !...ওঃ, আজ যদি আমরা হিম্মতের সঙ্গে বিপদের মোকাবিলা না করি, তাহলে হিম্মত শব্দের গৌরবই যে নষ্ট হয়ে যাবে।

মুকন্দী : হ্যাঁ বাবা ! আমাদের অবশ্যই হিম্মতের সঙ্গে যুঝতে হবে।

বৃদ্ধ : বাবা মুকন্দী, মা নির্মল, তাই তো তোদের বলছি যে

এই সময় রাতের আঁধারে আমাকে আর দেশরাজের মৃতদেহ ছেড়ে এখান থেকে চুপচাপ হিন্দুস্থানে চলে যা।

নির্মলা : এটা তো হিম্মতের কাজ নয়, বাবা! এ তো ভীরুতা! জঘন্য রকমের বিশ্বাসঘাতকতা! দারুণ ভীরুতা!

বৃদ্ধ : না, মা না! এখানেই তো তুই ভুল করছিস। এমন অসহ্য আঘাত সহ্য করে কটা লোক বেঁচে থাকে? আমি কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, ভগবান যেন অতিবড় শত্রুকেও এমন দুর্দিনে না ফেলেন— যে নিজের ভাই-এর মৃতদেহ আর আহত বাপকে এইভাবে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। তাছাড়া এই চরম সংকট যখন এসেই পড়েছে, তখন আমাকে ধৈর্যের সঙ্গে তার মুখোমুখি তো হতেই হবে। এসব দেখে শুনে তোরা বেঁচে থাকবি আর তোদের বেঁচে থাকাটাই হবে তোদের সাহসের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।

নির্মলা : জীবনের জন্য এত কিসের মোহ, বাবা! আমরাও আমাদের ভাই-এর মতোই নিজেদের প্রাণ দিতে পারি।

বৃদ্ধ : তা আমি জানি মা, তা আমি জানি। দেশরাজও তো তোদেরই একটা অংশ।

নির্মলা : তাহলে আর জীবনের জন্য এত মোহ কেন?

বৃদ্ধ : (মৃদু হেসে) নির্মল, এ জীবনটা যে তোর নয়— এ জীবন দেশমাতৃকার। তোদের বেঁচে থাকতে হবে এইজন্যে যে তোদেরকে দেশের দরকার।

মুকন্দী : আমাদের দেশ? বাবা! আমাদের দেশ থেকে তো আমরা চিরদিনের মতো বিতাড়িত। আপনিই তো একটু আগে বললেন যে নিজের জন্মভূমি থেকে চিরদিনের জন্য আমরা নির্বাসিত।

বৃদ্ধ : তোর ব্যথা আমি বুঝি রে, মুকন্দী, তোর ব্যথা আমি বুঝি। জীবনের সত্তরটা বছর আমি মায়ের কোলের যে অংশে কাটিয়েছি আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমাকে মায়ের কোলের সে অংশ থেকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়েছে। জীবনের

সত্তরটা বছর ধরে আমি যে মাটিকে জ্যোৎস্নায় আলোময় হতে দেখেছি, যে মাটিতে প্রভাত দেখেছি, মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্ত কিরণ-সম্পাত দেখেছি একটানা সত্তরটা বছর ধরে— সে মাটিতে এসব কিছুই আমি আর দেখতে পাবো না। **(বৃদ্ধের গলা ভারী হয়ে আসে। কিন্তু অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে সে বলে চলে।)** কিন্তু ঐ মাটি যেখানে আমরা, আমাদের পিতৃপিতা-মহরা জন্মেছেন, সেখানেই তো আমাদের দেশ শেষ হয়ে যায় না। দেশ তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। আর দেশের এই বিশালতার চেয়ে বড় আরো একটা জিনিস আছে, বুঝলি ?

নির্মলা ঃ সেটা আবার কি জিনিস ?

বৃদ্ধ ঃ আমাদের কাছে একটা বিরাট বড় সম্পদ জমা আছে এবং তা আমাদের উত্তর পুরুষকে আমাদেরকে দিয়ে যেতেই হবে।

মুকুন্দো ঃ কি সেই সম্পদ বাবা ?

বৃদ্ধ ঃ বংশানুক্রমে সেই সম্পদ আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে। আমরা এই হিন্দুস্থানের সীমান্তের পাহারাদার— আমাদের পূর্ব-পুরুষ বরাবর হিন্দুস্থানের সীমান্ত রক্ষা করে এসেছেন। আজ হিন্দুস্থানের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের হিন্দুস্থানের ইজ্জত রক্ষা করে চলতে হবে। আর এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করার জন্যেই তোদের বেঁচে থাকতে হবে।

নির্মলা ঃ কিন্তু দেশের সেই প্রান্তটুকু তো আর আজ আমাদের কাছ থেকে জোর করে কাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, বাবা। সেই প্রান্তটুকুকে আমরা আজ কি করে রক্ষা করবো ?

বৃদ্ধ ঃ (একটু জোরের সঙ্গে) তুই একেবারে আমার আঁতে হাত দিয়ে কথা বলেছিস, মা ! এ কথা পুরোপুরি ঠিক যে দেশের সীমান্ত একেবারে চুপচাপ আমরা ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু এই বলিদানও যে দেশের স্বার্থে। দেশমাতৃকার এই অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভিটেমাটি ছাড়া হতে হয়েছে ঠিক, কিন্তু তবু দেশ আজও মরেনি যদিও সেই দেশের একটা অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে।

মুকন্দী : **(স্বগতভাবে)** দেশ, মাতৃভূমি, হিন্দুস্থান ! সেই কবে থেকে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে আসছি। আজ যখন দেশ স্বাধীন হল, তখন ঘরবাড়ী, ভাইবন্ধু সব কিছু ছেড়ে আসতে হল, হায়রে !

বৃদ্ধ : **(পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে)** হ্যাঁ, আজ দেশকে রক্ষা করার জন্যে, দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমরা সবচেয়ে বড় বলিদান দিয়েছি। আজ আমরা দেশমাতৃকার পায়ে সবকিছু সঁপে দিয়েছি— আর যা কিছু এখনও আমাদের আছে তাও আমাদের সেই মহাতেজী পিতৃপুরুষের মতো সব সময়ই দেশ মাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করার জন্যেই শুধু অবশিষ্ট আছে।

নির্মলা : সব সময়ই কেন ? এমন দুর্দিন তো এর আগে কখনও আসে নি।

বৃদ্ধ : আমি স্বীকার করছি, আজ যে জঘন্য তাণ্ডবলীলা চলেছে, তা এর আগে কখনও হয়নি। তবুও আমাদের পূর্বপুরুষদের, যাঁরা বরাবর সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হয়েই ছিলেন তাদের ওপরও ঝড়ঝঞ্ঝা, বিপদ কম যায়নি। আজ ইতিহাসের এই নৈশ সন্ধিক্ষণে পূর্বপুরুষদের সেই যশোগাথা তোদেরকে শুনিয়ে আমি অমরত্ব লাভ করবো। **(কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে)** রাত এখনও অনেক বাকী। আমার আদেশ, তোরা আমাকে এখানেই ছেড়ে দিয়ে ভারতের দিকে রওনা হয়ে যা। কিন্তু যাবার আগে শেষবারের মতো আমার মুখে পূর্বপুরুষদের সেই অমর কীর্তিকথা শুনে যা। আর তারপর হিন্দুস্থানে গিয়ে পৌঁছে লোককে বলিস যে আমার বুড়ো বাপ তার একাত্তর বছর বয়সে জীবনের সবচেয়ে বড় বলিদান তার সাধের হিন্দুস্থানের জন্যে দিয়ে গেছে। এবার শোন—

(দৃশ্য শেষ হওয়ার সঙ্গীত)

(3)

বৃদ্ধ : **(উৎসাহের সঙ্গে)** উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র— মহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পা ; গান্ধার আর কপিশা, পুরুষপুর আর তক্ষশীলা।

(উপনিষদের যুগের ঋষিদের মন্ত্রগান—)

অসতো মা সদ্গময়,
তমসোর্মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতংগময় !

শান্তি ও সমৃদ্ধির এক দীর্ঘ যুগ শেষ হল। তক্ষশীলায় ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রসার লাভ করতে লাগলো। তক্ষশীলার পাহাড়ে পাহাড়ে গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !
ধম্মং শরণং গচ্ছামি !
ওঁ মণিপদ্মে হুম্ !

বৃদ্ধ : আজ থেকে 2273 বছর আগে ভারতের এই সীমান্ত-রেখায় সিকান্দার শা আক্রমণ চালালেন। তক্ষশীলা আর পুরুরাজকে পরাস্ত করে সিকান্দার বিতস্তার তীরে এসে পৌঁছলেন, কিন্তু সেখানে পৌঁছে তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারত সীমান্তের এই জয়টুকু করতে তাঁকে কোন বড় জয়ের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে হয়েছে।

(কিছুক্ষণের জন্য দৃশ্য-সমাপ্তির সংগীত)

(4)

আজ থেকে 2273 বছর আগে বিতস্তা তীরে এক প্রভাত। চারদিকে কোলাহল। সিকন্দারের হাজার হাজার রাজদ্রোহী সৈনিক এক জায়গায় জড়ো হয়ে "সিকান্দার মুর্দাবাদ!" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। আওয়াজ তুলেছে, "আমাদের দেশে ফিরতে হবে। ফিরে চলো, দেশে ফেরো।" এই সময় এক

বিদ্রোহী নেতা বলতে শুরু করেছেন— "বীরগণ, আপনারা শান্ত হোন, আমার কথা শুনুন। আমি আপনাদের নেতা এণ্ড্রোয়োকস বলছি।" (**সব চুপ হয়ে যায়।**)

এণ্ড্রোয়োকস ! বীরগণ ! বন্ধুগণ ! আপনারা ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনুন। (**এণ্ড্রোয়োকস অমর হোক! সিকান্দার বিনাশ হোক ! ব্যাণ্ডের বাজনা।**)

এণ্ড্রোয়োকস : আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সিকান্দারের বিনাশ হোক, ব্যাণ্ডে এই আওয়াজ তোলা থামান। সিকান্দার আর যাই কিছু হোক, সে আমাদের দেশের গৌরব।

জনৈক সৈনিক : সিকান্দার স্বার্থান্বেষী !

দ্বিতীয় সৈনিক : সিকান্দার পশুর মতো অধম, নীচ !

তৃতীয় সৈনিক : সিকান্দার নিজের বিজয়াকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আমাদের সকলকে বলি দিতে চান।

প্রথম সৈনিক : সিকান্দার হুমকি দিয়েছেন যে সমস্ত বিদ্রোহী সৈনিককে উনি বর্শার ফলকে উড়িয়ে দেবেন।

এণ্ড্রোয়োকস : ভাইসব, দয়া করে আমার কথা শুনুন। সিকান্দার যাতে আপনাদের একটু চুলও না সিধে করতে পারেন সে ভার আমার। সিকান্দারের কাছ থেকে আমি এ কথা আদায় করে নিয়েছি যে উনি আপনাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনবেন এবং আপনাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পালন করবেন। ভাইসব, আপনাদের কাছে আমার একটা কথা নেওয়ার আছে। আমি বলায় এবং আমারই আমন্ত্রণে উনি এখন এই সভায় আসছেন। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে উনি যখন এখানে আসবেন তখন আপনারা আপনাদের অতিথির, ইউনানের বীর সেনাপতি সিকান্দারের গৌরব রক্ষা করবেন। এতে ইউনানের গৌরব বাড়বে বৈ কমবে না। আমরা ইউনানের বীর সৈনিক আর সিকান্দার এখনও পর্যন্ত আমাদের নেতা। ভবিষ্যতে ওঁকে আপনারা নেতা রাখবেন কি রাখবেন না, তা আপনাদেরই হাতে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে সেইরকম ব্যবহারই

আমরা করব যা একজন বীর অপর একজন বীরের প্রতি করে থাকেন।

জনৈক সৈনিক : সেনাপতি সিকান্দারকে আমাদের কথা শুনতে হবে।

এণ্ড্রায়োকস : আমি এইমাত্র আপনাদের বলেছি, সে দায়িত্ব আমার। ঐ সেনাপতি সিকন্দার আসছেন। আপনারা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ওঁকে স্বাগত জানান। (**কিছুক্ষণের জন্য সব চুপচাপ।**)

সিকন্দার : আমি লক্ষ্য করেছি, আমার সৈনিকরা সকলেই আমার ওপর বিক্ষুব্ধ। আমি এর কারণ জানতে চাই। (**কিছু-ক্ষণের জন্য সব চুপচাপ।**)

সিকন্দার : একটু আগেই আমি 'সিকন্দার াত যাক'— ব্যাঙের বাজনা শুনলাম। এণ্ড্রায়োকস, তুমি নীরব কেন? বলো, এর কারণ কি, বলো?

এণ্ড্রায়োকস : মহারাজ, এর কারণ শুনলে আপনি খুশী হবেন না। আমি যদি এদেরকে চুপ করতে না বলতাম, তাহলে—

সিকন্দার : (**কথা থামিয়ে দিয়ে**) তোমার কথায় আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি, এণ্ড্রায়োকস! আমাকে বলো, আমার বীর সৈনিকগণ আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করে?

এণ্ড্রায়োকস : আমরা আমাদের দেশে ফিরতে চাই।

সিকন্দার : বীরগণ, আজ থেকে ছ'বছর আগেকার এই দিনটার কথা কি আপনাদের মনে আছে, যখন আপনারা ইউনানের পবিত্র মাটিতে মাথা উঁচু করে প্রতিজ্ঞা করছিলেন যে সিকন্দারের নির্দেশে আপনারা সমস্ত পৃথিবীতে ইউনানের শাসন জারি করবেন।

এণ্ড্রায়োকস : খুব ভালো করেই মনে আছে, মহারাজ!

সিকন্দার : বীরগণ, আপনাদের সামনে এই গৌরবময় দেশ। আমি বিশ্বের এই সবচেয়ে গৌরবময় দেশ ভারতবর্ষে ইউনানের রাজ্য স্থাপন করতে চাই। এর অনন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে, এর বেগবতী নদীর ওপর, এই সুবিশাল দেশের বরফাবৃত অত্যুচ্চ পর্বত শিখরে

আমি ইউনানের পতাকা উড়িয়ে দিতে চাই। বলুন, এই কাজে আপনারা আমার সাথী হবেন কিনা ?

এণ্ড্রোয়োকস : না, কখনই নয়।

সিকন্দার : তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না, এণ্ড্রোয়োকস !

এণ্ড্রোয়োকস : আপনি আকাশকুসুম কল্পনা করছেন, মহারাজ !

সিকন্দার : তোমার উদ্দেশ্য কি ? খুলে বলো !

এণ্ড্রোয়োকস : আমার উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট, মহারাজ। আপনি এদেশ কখনই জয় করতে পারবেন না। এই দেশের অনন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে বেগবতী নদী এবং গগনচুম্বী পর্বতমালার বর্ণনা আপনি দিয়েছেন সত্য— কিন্তু এই সুন্দর দেশে বসবাসকারী আর্যজাতির বর্ণনা দিতে আপনি ভুলে গেছেন মহারাজ ! গত আঠারো মাসেই আমরা এই জাতিকে একেবারে মর্মে মর্মে চিনে নিয়েছি। একা ইউনান তো তুচ্ছ, সারা পৃথিবী মিলিত হলেও এই ভারতবর্ষ জয় করা সম্ভব নয়। মহারাজ !

সিকন্দার : সারা পৃথিবী যা করতে পারে না, ইউনান তা করতে পারে— সিকন্দার তা করতে পারে। এ পর্যন্ত আমরা ভারতবর্ষের দু'জন বড় বড় রাজাকে সরাসরি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছি।

এনণ্ড্রোয়োকস : পুরুরাজের পরাজয়কে আপনি বিজয় বলতে চান, মহারাজ ? অমন একজন সামান্য নরপতিও যে এতদিন ধরে সমগ্র ইউনান বাহিনীর গতি রুদ্ধ করে রাখতে পারেন— তা থেকেই এই দেশবাসীকে, পঞ্চনদের দেশের এই বীরগণকে আমরা ভালো-ভাবে চিনে নিয়েছি। এ দেশের সীমান্তের সামান্য রাজাদেরও কি প্রচণ্ড শক্তি !

সিকন্দার : (**মধ্যে থামিয়ে দিয়ে**) ভীরু, কাপুরুষ কোথাকার !

এনণ্ড্রোয়োকস : মুখ সামলে কথা বলো, সিকন্দার !

(**হঠাৎ হৈ হৈ পড়ে যায়।**)

বৃদ্ধ : আর তারপর সত্যি সত্যিই সিকন্দারের সৈন্যসামন্তকে

সব নিজেদের জান নিয়ে পালাতে হয়েছিল। এখানকার এই পরাজয়ের ধাক্কা আর সিকন্দার সামলে উঠতে পারলেন না তার অল্প দিন পরেই সিকন্দার ইহলোক ত্যাগ করেন।

(দৃশ্যশেষের সংগীত।)

(5)

বৃদ্ধ : খ্রীষ্টীয় 507 সালে এশিয়া ও ইওরোপ এই দুই মহাদেশ লক্ষ লক্ষ হুনের আক্রমণে ভয়ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ভল্‌গা নদী থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সর্বত্র এই হুনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং গান্ধারের কুশান রাজাকে হত্যা করে লক্ষ লক্ষ হুন সেনা বন্যার মতো ভারতবর্ষের ওপর আক্রমণ চালায়। বাহ্লীক থেকে শতদ্রু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল হুনদের অধিকার আসে। তারপর 512 খ্রীষ্টাব্দে মদ্র এবং এই পঞ্চনদের দেশের সৈনিকগণের সাহায্যে সম্রাট স্কন্দগুপ্ত সেই হুনবাহিনীকে বিতাড়িত করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে 512 খ্রীষ্টাব্দের মাঘমাসের গোড়ার দিকের এক সুন্দর সন্ধ্যা। মগধের জনপ্রিয় যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত, অসংখ্য হুনসেনাকে পরাজিত করে আজ ফিরে এসেছেন পাটলীপুত্রে। সারা নগরী নব-বধূর সাজে সজ্জিতা। পতাকা, দ্বারতোরণ ও ফুলের মালায় চারদিক শোভিত. নানান ধরনের সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসে সারা নগরী ভরপুর। **(স্থানে স্থানে মঙ্গলগাথা গাওয়া হচ্ছে, মঙ্গলবাদ্য বাজছে। কিছুক্ষণ ব্যাপী মাঙ্গলিক সংগীত।)** হঠাৎ 'পথ ছাড়ো', 'পথ ছাড়ো' আওয়াজ কানে আসে আর তারপরেই গগনভেদী ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে—

ভট্টারক পাদীয় যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের জয়।

হুন নাশকারী মহাবল স্কন্দগুপ্তের জয়।

নগরবাসিগণের কণ্ঠে গান শুরু হয়। গানের বক্তব্য— হে পাটলীপুত্রবাসিগণ। যিনি আসছেন, এঁকে কি তোমরা চেন? কাকে স্বাগত জানাতে তোমরা তোমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়ে এগিয়ে এসেছ? কার দর্শনের নিমিত্ত তোমরা এত উদগ্রীব হয়ে

উঠেছ? আমরা তাঁকে জানি। আজ আমাদের হৃদয়ের রাজা স্কন্দগুপ্ত ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাসের এক মহান বিজয়ের পর আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসছেন। হিংস্র দুর্দমনীয় হুনদের উনি পরাস্ত করেছেন— উনি সেই হুনদের পরাজিত করেছেন সারা পৃথিবী যাদের গতি রোধ করত সমর্থ হয়নি। আজ যদি স্কন্দগুপ্ত না থাকতেন, তাহলে সারা আর্যাবর্তের ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি এই বর্বর হুনদের হাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। এসো, পাটলীপুত্রবাসিগণ, তোমরা এগিয়ে এসো— এই মহান বীরের অভ্যর্থনার জন্য তোমরা তোমাদের হৃদয়ের সর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে এসো। আজ পাটলীপুত্রের গৌরবময় ইতিহাসের এক অতি উজ্জ্বল দিন।

গান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই "যুবরাজ ভট্টারক পাদীয় স্কন্দগুপ্তের জয়।"

শব্দে গগনভেদী নিনাদ ওঠে। তারপর হঠাৎ সব চুপ হয়ে যায়। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার পর যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত বলতে শুরু করেন— "পাটলীপুত্রের নাগরিকবৃন্দ, আমাকে এই ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আমি আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আপনারা একটু আগেই যে গান গাইলেন, তা শুনে আজকের জীবনের এতবড় গৌরবের দিনেও আমার চোখে জল এসে গেছে। আপনারা গাইছিলেন—"আজ স্কন্দগুপ্ত না থাকলে আর্যাবর্তের ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি বর্বর হুনদের হাতে পড়ে একেবারে রসাতলে যেত। কিন্তু ভাইসব, এ কথাটি আদৌ সত্য নয়। ভারতবর্ষের এই মহান বিজয়ের প্রকৃত শিল্পী যাঁরা, তাঁরা আজ পাটলীপুত্রে ফিরে আসেন নি। তাঁরা কপিশায় বাহ্লীকের তীরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। এঁদের সকলেই পাটলীপুত্রের গুপ্ত সাম্রাজ্যের সৈনিক হলেও এঁদের অনেকেরই জন্ম পাটলীপুত্রে নয়। এঁরা আমাদের সীমান্তের প্রহরী। এঁরা আমাদের দেশের গৌরব। কপিশা, মদ্র এবং পঞ্চনদের দেশের নাগরিক। আমি মহাবল বীর অগ্নিগুপ্তের নেতৃত্বাধীন সৈনিকদের পাঁচ হাজার জনের মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখেছি—

যারা কপিশার একটা বড় ঘাঁটিতে পুরো পাঁচদিন ধরে দু'লক্ষ হুন-সেনার গতিরোধ করেছিলেন—ঐ পাঁচ হাজার বীরের একজনও যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ হুন বাহিনীর সাধ্য ছিল না সেই ঘাঁটিতে প্রবেশ করে! ভাইসব, সীমান্তের ঐ বীর ভ্রাতৃগণের স্মরণে আপনারা আমার সঙ্গে নতমস্তকে কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা পালন করুন।"

(হাজার তলোয়ারের শিরস্ত্রাণ ছোঁয়ার আওয়াজ আসে।)

(দৃশ্যশেষের মাঙ্গলিক সংগীত)

(6)

বৃদ্ধ: কয়েক যুগ পার হয়ে যায়। ভারতবর্ষের আকাশে দুর্যোগের বাদল ঘনিয়ে আসে, দুর্যোগের মেঘ ঘনীভূত হয় পশ্চিম সীমান্তের আকাশে। হুনদের পর আসে কুশান— তারপর পাঠান এবং মোগল! শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়। তারপর উনবিংশ শতাব্দী শুরু হয়, পাঞ্জাব কেশরী তার দীর্ঘ সুপ্তির ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠলেন। **(দুমিনিট ধরে দৃশ্যারম্ভের সংগীত)** মহারাজ রঞ্জিত সিং!

বৃদ্ধ: অন্ধকার রাত। সিন্ধুর পশ্চিম তীরে এ্যাটকে জমা হয়েছে হাজার পাঠান সৈন্য। পাঠান সৈন্যরা পশতুতে একটা গান গাইতে গাইতে বাজনার তালে তালে নাচছে। একটু পরেই ভারী গলায় একটা আওয়াজ শোনা যায়।

: চিরাগ আলী!

: ওঃ হুজুর হফীজুল্লা সাহেব!

: চিরাগ আলী! এ যে ফুর্তির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে— কি ব্যাপার?

: হুজুর, আপনি এখনও এই খোশখবরটা শোনেন নি?

: খোশ খবর?

: জনাব, আমরা রঞ্জিত সিংকে হারিয়ে দিয়েছি।

: কি করে? রঞ্জিত সিং তো নদীর পূর্বতীরে তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁবু ফেলেছে।

: তাতে কি হয়েছে, হুজুর! আজ না হোক কাল তো ওকে ওখান থেকে পালাতেই হবে।

: এমন মনে হওয়ার কারণ?

: হুজুর! রঞ্জিত সিং-এর সৈন্যরা এ্যাটকে নৌকার যে পুলটা তৈরী করেছিল— আমাদের ফৌজ শুধু সেটাকে আজ ভেঙেই দেয়নি, সব নৌকা কটাকে ডুবিয়েও দিয়েছে।

: তা তো বুঝলুম, চিরাগ আলী, কিন্তু রঞ্জিত সিং কি আর কোন রকমেই নদী পেরোতে পারবে না?

: তা একেবারেই অসম্ভব হুজুর! সারা পৃথিবী তো কোন্ ছাই, স্বয়ং আল্লা পর্যন্ত এ্যাটকের এই দুই পাহাড়ের মধ্যেকার ভয়ংকর নদীকে পেরোতে সাহস করবেন না। এখানে জল এতই গভীর যে একটার পর একটা এরকম করে সাতটা হাতি দাঁড়ালেও ডুবে যাবে। স্রোতের এমনই টান এখানে যে নদীর কাছে পর্যন্ত আসতে ভয় করে, যেন স্রোতের টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হুজুর! এই অকূল দরিয়াই যুগ যুগ ধরে হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় পাহারাদার হয়ে রয়েছে।

: কিন্তু রঞ্জিত সিংকে তুমি চেন না, চিরাগ আলী! রঞ্জিত সিং হচ্ছেন পৃথিবীর মাটিতে এক ছদ্মবেশী জিন (ভূত), যে কাজ আল্লাও করতে পারেন না তা রঞ্জিত সিং অনায়াসেই করে ফেলে।

চিরাগ আলী: (একটু হেসে) কিন্তু এ্যাটকের এই নদী পেরোন এই জিনেরও অসাধ্য। বেঁচে হোক আর মরেই হোক, কোন রকমে রঞ্জিত সিং যদি এ এই নদী পেরোতে পারে, তাহলে শুধু আমি নয় আমার বাপ পর্যন্ত ওর কাছে গোলাম হয়ে থাকব। **(হাসি)**

(দৃশ্যান্তরের সংগীত)

বৃদ্ধ : ওদিকে এ্যাটকে সিন্ধুর অপর পারে মহারাজ রঞ্জিত সিং সৈন্যসামন্ত নিয়ে তৈরী।

(দু মিনিট দৃশ্যান্তরের সংগীত)

রঞ্জিত সিং : তা হলে সংগত কি ঠিক করলো, সরদার সিং ?

সরদার সিং : হুজুর, ঠিক করার ভার তো আপনার! সংগতের নিবেদন এই যে যদি সম্ভব হয় তো পনেরো-বিশ দিনের মধ্যে নতুন নৌকো বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে আর তা না হলে শ' দুয়েক মাইল নীচের দিকে গিয়ে সিন্ধুর জল যেখানে অপেক্ষাকৃত শান্ত সেখানে নদী পার হওয়া।

রঞ্জিত সিং : এই পরামর্শ দুটোর কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়, সরদার সিং!

(সরদার সিং কোন কথা বলে না।)

রঞ্জিত সিং : কথাটা কি জানো, সরদার সিং ? সিন্ধুর ওপারে এখন শত্রুর সংখ্যা কম আছে। এ্যাটকে সিন্ধুর এই খরস্রোত পেরোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব এ কথা ভেবে শত্রু এখন পরম নিশ্চিন্তে আছে। এই সময় যদি আমরা নদী পেরোতে পারি তাহলে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু নৌকো তৈরী করতে আমরা পনেরো-বিশ দিন কাটিয়ে দিলে ঐ সময়ের মধ্যে ওপারে শত্রু তার শক্তি বহুগুণে বাড়িয়ে ফেলবে। এখন বাকি রইলো, অন্য কোন জায়গা থেকে সিন্ধু পেরোন যায় কিনা— এ পরিকল্পনাটা একেবারেই অর্থহীন। দরিয়াখান বা তার আশপাশের কোন জায়গা থেকে সিন্ধু পেরোতে গেলে প্রায় শ' খানেক নৌকার বন্দোবস্ত করতে হবে। ওখানে সিন্ধু নদীর বিস্তার প্রায় মাইল সাতেক। দ্বিতীয়ত ওখান থেকে পেশোয়ার পৌঁছনো আমার সৈন্যসামন্তের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

সরদার সিং : তাহলে হুজুর কি করতে বলেন ?

রঞ্জিত সিং : আমার মতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাদের এই জায়গাতে সিন্ধু পেরোনই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত।

সরদার সিং : (**আশ্চর্য হয়ে**) ঘোড়ার পিঠে চড়ে।

রঞ্জিত সিং : হ্যাঁ, ঘোড়ার পিঠে চড়ে এবং এখন এই রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যেই!

সরদার সিং : (**ঘাবড়ে গিয়ে**) আমার কথা নাহয় ছেড়েই দিলুম, হুজুর! আমরা তো তুচ্ছ জীব, কিন্তু ধর্মের অনুশাসন তো আপনাকে মানতে হবে।

রঞ্জিত সিং : ধর্মের প্রয়োজন বীর রঞ্জিত সিং-এর অবশ্যই আছে সরদার সিং। কাপুরুষ রঞ্জিত সিং-এর কাছে তার কোন প্রয়োজন নেই।

সরদার সিং : যথা আজ্ঞা হুজুর।

রঞ্জিত সিং : এই হিম্মতের কাজে আজ্ঞা দেবার প্রশ্ন ওঠে না, সরদার সিং। উচিত কথার ভিত্তি আজ্ঞার শক্তি নয়, তার ভিত্তি নিজের অন্তরের প্রেরণার শক্তি।

সরদার সিং : হুজুর : যেখানে আপনার কপাল থেকে এক বিন্দু ঘাম পড়বে, সেখানে প্রত্যেকটি শিখ সৈন্য তার রক্তের নদী বইয়ে দেবে। কিন্তু আপনাকে হাত জোড় করে মিনতি করছি হুজুর, আপনি দয়া করে এই নদী পেরোতে গিয়ে আপনার এই বহুমূল্য জীবনের ঝুঁকি নেবেন না। প্রথমে আমরা এই ভয়ংকর স্রোতটা পেরোবার চেষ্টা করি। যদি আমরা ওপারে পৌঁছাতে পারি তারপর আপনার যেমন খুশী করবেন।

রঞ্জিত সিং : অসম্ভব! সরদার সিং, তুমি আমার ছোট-বেলাকার সাথী, রঞ্জিত সিং তোমাকে এমন কিছু কখনও করতে বলেছে যা সে নিজে করতে পারে না?

সরদার সিং : ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, হুজুর! আপনি জানেন, এ যাবৎ সিন্ধুর এই খরস্রোত পেরোন সর্বদা অসম্ভব বলেই গণ্য হয়ে এসেছে। এই জায়গাটার নাম এ্যাটক এইজন্যে যে এখানে

সিন্ধুর স্রোতে এমন একটা আটকে দেওয়ার ক্ষমতা আছে যে কোন অবস্থাতেই কোন মানুষ এখানের নদী পেরোতে পারে না।

রঞ্জিত সিং : (মৃদু হেসে) সরদার সিং, এ্যাটকের এই গল্প আমিও শুনেছি, কিন্তু আসল কথা কি জানো? যার মনে আটক পড়ে আছে, সেই কেবল আটকে থাকে।

সরদার সিং : আমাদের কাছে আপনার হুকুমও যা আর গুরুজীর হুকুমও তাই।

রঞ্জিত সিং : আচ্ছা ভাই, তা হলে এখন থেকে ঠিক একঘণ্টা পরে আমরা সবাই ঘোড়া নিয়ে সিন্ধু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর সবার আগে সিন্ধুর স্রোতে ঘোড়া নামাব আমি।

(মহারাজ রঞ্জিত সিং-এর জয়! 'সৎশ্রী অকাল' বেজে ওঠে ব্যাণ্ডে)

(ছু মিনিট দৃশ্যান্তরের সংগীত)

বৃদ্ধ : পরের দিন সূর্য উদয়ের আগে সত্যি সত্যিই মহারাজ রঞ্জিত সিং তাঁর বাছাই সৈন্যদের নিয়ে নদী পেরিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেললেন। তিনিই প্রথম ঘোড়া নিয়ে সিন্ধু নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং সবার আগে সিন্ধুর পশ্চিম তীরে গিয়ে পৌঁছে-ছিলেন। বিজয়ের বরমাল্য তাঁর গলাতেই সত্যি সত্যি পড়ল।

(দৃশ্যান্তরের সংগীত)

(সংগীতময় পরিবেশে এক শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর)

ঘুটঘুটে অন্ধকার। মধ্য রাত্রি। রাতের অন্ধকারে টিমটিমে তারার আলোয় এক যুবক আর এক যুবতী রাবী নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে। মুমূর্ষু পিতার পবিত্র আদেশ বেদমন্ত্রের মতো এদের কানে বাজছে এবং তাই তাদের পথের নিশানা দিচ্ছে। এই পবিত্র আদেশের বলেই এরা ছুজনে এদের দেবতুল্য পিতার জীবদেহ এবং বীর অগ্রজের মৃতদেহ এক হিন্দোলিত শস্যক্ষেতের মধ্যে ছেড়ে

এসেছে— যে ক্ষেত কিছুদিন আগে পর্যন্ত শস্যশ্যামল পাঞ্জাবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এবং যা আজ পাকিস্তানের অংশবিশেষ।

এরা সর্বহারা— পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন, দোকানপাট, ভিটেমাটি সব কিছুই হারিয়েছে এরা। তবুও কেমন এক রঙিন স্বপ্নের নেশা ওদেরকে আজ হিন্দুস্থানের কোলের দিকে টেনে আনছে। পিতার শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর এখন তাদের কানে বাজছে।

বৃদ্ধের পবিত্র গম্ভীর কণ্ঠস্বর— হিন্দুস্থানে গিয়ে বলিস আমাদের 71 বছরের বুড়ো বাপ হাসতে হাসতে দেশের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছে। হিন্দুস্থানে গিয়ে বলিস, হিন্দুস্থানে গিয়ে বলিস, আমরা সীমান্তের যুগযুগান্তের প্রহরী। হিন্দুস্থানে গিয়ে লোককে বলিস।...

(পর্দা পড়ে)

লেখক পরিচয়

উদয়শংকর ভট্ট

শ্রী ভট্টের জন্ম বুলন্দ শহরে (উত্তর প্রদেশ) কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে লাহোরে (পাঞ্জাব)। বস্তুতান্ত্রিক নাটক দিয়েই তাঁর নাট্যকার জীবন শুরু হয়। নাটক লেখা চলতে তো থাকলোই তার সঙ্গে সঙ্গে একাঙ্কী নাটিকা লেখাও শুরু করলেন। কালক্রমে তিনি একাঙ্কী নাট্যকার সমাজে পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত হলেন। শুধু নাটকই নয়, কবিতা ও উপন্যাসও তাঁর রচনাসম্ভারে স্থান পেল। তাঁর নাটিকার বৈশিষ্ট্য হল, এতে একদিকে পাত্রপাত্রীর মনোজগতের ছবি যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট, অপরদিকে পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে শব্দ-সংযোজনের ব্যাপারেও শ্রী ভট্টের মৌলিকতার আভাস পরিস্ফুট। তাঁর নাটিকাগুলির প্রত্যেকটিতেই মননশীলতার ছাপ আছে। সাধারণতঃ নাটিকার বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক হলেও, এতে বর্তমান যুগের সমস্যার ইঙ্গিতেরও অভাব নেই।

1866 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীভট্ট দিল্লীতে পরলোকগমন করেন। 'দশ হাজার'-শীর্ষক একাঙ্কী নাটিকায় তিনি কৃপণ ব্যবসায়ীর মনে পুত্রস্নেহ ও ধনলিপ্সার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত মনোরমভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর নাট্যকীর্তির মধ্যে 'সমর বিজয়', 'দাহর', 'অম্বা', 'কমলা', 'বিশ্বামিত্র' ইত্যাদি অন্যতম এবং একাঙ্কীগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'আদিম যুগ', 'সমস্যা কা অন্ত', 'পর্দে কে পিছে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভুবনেশ্বর

ভুবনেশ্বর হিন্দী নাটককে সত্যিকারের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একাঙ্কী নাটিকায় আধুনিকতা আনয়নের ব্যাপারে তাঁর উল্লেখনীয় ভূমিকা আছে। পাশ্চাত্য নাট্যকলায় তিনি সুপণ্ডিত। তাঁর নাটিকায় পাশ্চাত্য নাট্যকলার প্রভাব বিশেষ করে প্রকৃত সামাজিক তত্ত্বের প্রভাব যথেষ্টরূপে বিদ্যমান।

'কাঁরওয়া' (1935) এঁর ছ'টি একাঙ্কীর সঞ্চয়ন। শৈল্পিক দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখলে এঁর লেখায় বার্নার্ড শ'এর নাট্যশৈলীর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'স্ট্রাইক' এক বাস্তববাদী (ন্যাচার্যালিস্টিক) একাঙ্কী নাটিকা। বাস্তববাদী নাটিকাগুলির মধ্যে 'স্ট্রাইকে' রূপ ও গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য আছে। এতে পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত ধনী ও মধ্যবিত্ত জীবন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

ডঃ রামকুমার বর্মা

হিন্দী একাঙ্কী নাটিকার ইতিহাসে ডঃ বর্মাই প্রথম শক্তিমান নাট্যকার এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রথম একাঙ্কী 'বাদল কী মৃত্যু' (1930)। একাধিক প্রথম শ্রেণীর নাটিকার এই খ্যাতিমান লেখকের রচনায় সংবেদনশীল পটভূমিকায় সামাজিক তথা ঐতিহাসিক উভয় ধরনের চরিত্রই আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁর অন্যতম একাঙ্কীগুলির মধ্যে পড়ে 'ক্রমশ', 'পৃথ্বিরাজকে আঁখে', 'রেশমী টাই', 'চারু মিত্রা', 'বিভূতি', 'সপ্ত কিরণ', 'রূপ রঙ্গ', 'কৌমুদী মহোৎসব', 'রিমঝিম', এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'ময়ুর পংখ'।

সামাজিক একাঙ্কীগুলির মধ্যে 'রেশমী টাই' ও 'রিমঝিম'-এ ভারতীয় সমাজের সমস্ত শ্রেণীর সর্বপ্রকার লোকের মনোবৈজ্ঞানিক চিত্র আবার ঐতিহাসিক একাঙ্কী 'চারু মিত্রা' ও 'কৌমুদী মহোৎসব'-এ ভারতীয় সংস্কৃতি ও প্রাচীন দর্শনের গভীর ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ডঃ বর্মার রচনা হিন্দী একাঙ্কীর ইতিহাসে এক মূল্যবান সম্পদ এবং তাঁর নাটিকার বিষয়বস্তু ও শিল্পশৈলী নিতান্তই তাঁর নিজস্ব।

রঙ্গমঞ্চে তাঁর নাটিকা সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হয়েছে এবং নাটিকার চরিত্রগুলি তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রতিভাত বিকশিত হয়েছে।

সেঠ গোবিন্দ দাস

যে-সমস্ত নাট্যকার সম্পূর্ণ নাটক ও একাঙ্কী উভয় ধরনের রচনাতেই সাফল্যের নিরিখ বজায় রাখতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে সেঠ গোবিন্দ দাসের নাম অন্যতম। 1936 সাল থেকে অদ্যাবধি এঁর প্রায় একশো নাটিকা প্রকাশিত হয়েছে। 'সাত রঙ', 'পঞ্চভূত', 'অষ্টদল', 'একাদশী', 'স্পর্ধা', ইত্যাদি এঁর একাঙ্কীগুলির মধ্যে অন্যতম। শ্রী সেঠ ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উভয় ধরনেরই একাঙ্কী রচনা করেছেন। এঁর ওপর গান্ধীজীর চিন্তাধারার প্রভাব যথেষ্ট।

এঁর রচিত সম্পূর্ণ নাটকের সংখ্যাও কম নয়। ঐতিহাসিক তথা পৌরাণিক নাটকগুলিতে তৎকালীন সমাজের সমস্যা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, নীতিবোধ ও মানবতার স্বর স্পষ্ট। 'নারী জীবন', 'বিবাহ সমস্যা', 'প্রেম', 'দাম্পত্য জীবন', ইত্যাদি সামাজিক নাটকে বিষয়বস্তুর যথার্থ নাট্যরূপ দান ঘটেছে।

হিন্দীতে এক-চরিত্র-বিশিষ্ট নাটকের সূত্রপাত ইনিই করেছেন। 'প্রলয় ও সৃষ্টি', 'শাপ ও বর', 'সচ্চা জীবন' ইত্যাদি এক-চরিত্র-বিশিষ্ট নাটিকাগুলির মধ্যে অন্যতম।

উপেন্দ্রনাথ 'অশক'

শ্রী অশকের জন্ম পাঞ্জাবের জলন্ধরে। নাট্যকার বি.এ.এল.এল.বি. হওয়ার পর প্রথমে উর্দুতে লেখা শুরু করেন। হিন্দীতে লেখা শুরু হয় পরে কিন্তু তিনি অল্পকালের মধ্যেই হিন্দী সাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। বহুমুখী প্রতিভা-সম্পন্ন এই লেখকের উপন্যাস, গল্প, নাটক, একাঙ্কী নাটিকা ও কবিতা সব কিছুতেই নিজস্ব অবদান আছে।

'তৌলিয়ে' একাঙ্কীতে আধুনিক আচার-ব্যবহারের কৃত্রিমতার চিত্র পরিস্ফুট। এতে মধু দাঁত বার করে হাসতে পারে না, মুখ খুলে কথা বলতে পারে না। এ-সব দিয়ে সে তার স্বামী বসন্তের জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলেছে। এই একাঙ্কীর বক্তব্য হল এই যে পশ্চিমী সভ্যতার অন্ধের মতো অনুকরণ আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে আঘাত করে এই অন্ধ অনুকরণ আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এঁর নাট্য-কীর্তির মধ্যে অন্যতম হল 'তুফান সে পহলে', 'আদি মার্গ', 'কৈদ ঔর উড়ান', 'ছঠা বেটা', 'চরবাহে', 'দেবতায়োঁ কী ছায়ামে', 'স্বর্গ কী ঝলক, 'জয় পরাজয়' ইত্যাদি।

বিষ্ণু প্রভাকর

হিন্দী একাঙ্কীর জগতে বিষ্ণু প্রভাকর মনোবৈজ্ঞানিক নাট্যকার হিসাবে সুবিদিত। মানবমনের ভিতরের বিভিন্ন স্তরকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করায় এবং সেগুলিকে যথার্থভাবে উদ্‌ঘাটিত করার ব্যাপারে উনি সিদ্ধহস্ত। এই নাট্যকারের দুটি প্রসিদ্ধ একাঙ্কী 'মা কা বেটা' 'বার একাঙ্ক', 'দশ বাজে রাত, 'প্রকাশ ওর পরছাই', এ রেখা এ দায়রে ঔর অন্য একাঙ্কী 'টুটতে পরিবেশ' (ঘর ভাঙে) একটি বাস্তববাদী একাঙ্কী নাটিকা। এতে নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ-জীবনের চিত্র সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চরিত্রের স্বরূপ এবং সংলাপ সবদিক থেকেই অত্যন্ত বাস্তববাদী হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র মাথুর

হিন্দী একাঙ্কীতে যারা আধুনিকতা আনতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, জগদীশচন্দ্র মাথুর তাদের মধ্যে অন্যতম। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উভয় ধরনের একাঙ্কী রচনাতেই ইনি সর্বাধিক খ্যাতির অধিকারী। নাটকীয় ভাবভঙ্গিমায় যথার্থধর্মীতাই শ্রী মাথুরের একাঙ্কীগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

এর একাঙ্কীগুলির মধ্যে অন্যতম হল, 'বন্দী' এবং 'ও মেয়ে সপনে'। 'বন্দী'তে নাট্যকার অত্যন্ত সাবলীলভাবে মানুষের উদার ভাবনা ও আদর্শের আভাস দিয়েছেন।

ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ লাল

ইনি শুরু থেকেই নাটকের চেয়ে রঙ্গমঞ্চের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। ওঁর সময়ে নাটক পরম্পরাগতভাবে সুসম্পূর্ণতা লাভ করা সত্ত্বেও রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের প্রশ্নই ওঁর চিন্তাধারাকে বরাবর আকর্ষণ করে এনেছে। একদিকে যেমন ইনি সামাজিক জীবনের ব্যাপক সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করেছেন, অপরদিকে তেমনি প্রতিটি একাঙ্কীতে রঙ্গমঞ্চের গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হয়েছেন।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে গবেষণা এবং তাকে বিবিধ রূপে প্রতিষ্ঠার পেছনে এঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

নাট্যকারের অন্যতম একাঙ্কী—'তাজ মহল কে আঁসু', 'পর্বত কে পিছে', 'নাটক বহুরঙ্গী'। 'কফি হাউস মে ইন্তজার' নাটকীয় ও রঙ্গমঞ্চের বিচারে এক বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা।

'দর্পণ', 'কলঙ্কী', 'সূর্যমুখ', 'মিষ্টার অভিমন্যু' এবং 'কারফ্যু' এঁর রচিত অন্যতম হিন্দী নাটক এবং এগুলি রঙ্গমঞ্চে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

ধর্মবীর ভারতী

নতুন যুগের নাট্যকারদের মধ্যে ধর্মবীর ভারতী এক উল্লেখযোগ্য নাম। এ যাবৎ ওঁর লেখা একাঙ্কীর সংখ্যা আট-দশটির বেশী হবে না। কিন্তু প্রত্যেকটি একাঙ্কীতে মৌলিকত্ব ও ভাবভঙ্গীর অভিনবত্ব চোখে পড়ে। 'নদী প্যাসী থী' হল শ্রী ভারতীর লেখা প্রথম একাঙ্কী।

'সৃষ্টির শেষ মানুষ'—একটি ছন্দ-নাটক। নাট্যকলা ও নাটকীয় ভাবভঙ্গিমার প্রকাশ এতে সমস্তদিক থেকেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

ধ্বনি, কণ্ঠস্বর এবং এগুলির ভিতর দিয়ে মানুষের নিয়তির পথে এগিয়ে চলা এতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

শ্রী ভারতীর প্রসিদ্ধ নাটক 'অন্ধা যুগ' হিন্দী রঙ্গমঞ্চে এক উল্লেখনীয় অবদান।

চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার

জন্ম ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯০৬ সাল। শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়েছে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধ্যয়ন ও মৌলিক রচনা সৃষ্টিতে এঁর গোড়া থেকেই অনুরাগ। পরে সম্পাদনা কাজে এঁর অনুরাগ আরো বেড়ে যায়। ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত লাহোর বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা যা বিশ্ব তথা ভারতীয় সাহিত্যের একশোখানির মতো বই প্রকাশ করেছে তাব সম্পাদনা ও পরিচালনার গুরু দায়িত্ব ইনি বহন করেছেন। সম্পাদক হিসাবে এঁর খ্যাতি আরো বেড়ে যায়। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক জন্মভূমি', দিল্লীর 'আজকাল', 'বিশ্বদর্শন' এবং বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ সাহিত্য পত্রিকা 'সারিকা' তিনি সম্পাদনা করেছেন।

কাহিনীকার ও নাট্যকার উভয়রূপেই উনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কাহিনী সঞ্চয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই 'তিনদিন', 'ওয়াপসী', 'পহলা আস্তিক' ও 'গহরে অন্ধের মে'। ওঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক 'অশোক' 'রেবা' 'দেব ঔর মানব', 'ন্যায় কী রাত' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 'হিন্দুস্থানে যেয়ে বলো' একাঙ্কগুলির মধ্যে অন্যতম।